কৃষিশিক্ষা

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা
প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দ. জুলফিকার হোসেন
এ কে এম মিজানুর রহমান

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মোঃ সদরুল আমিন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কৃষি প্রযুক্তি	১-৩৫
দ্বিতীয়	কৃষি উপকরণ	৩৬-৬৯
তৃতীয়	কৃষি ও জলবায়ু	৭০-৯৩
চতুর্থ	কৃষিজ উৎপাদন	৯৪-১৭৪
পঞ্চম	বনায়ন	১৭৫-২০১
ষষ্ঠ	কৃষি সমবায়	২০২-২০৯
সপ্তম	পারিবারিক খামার	২১০-২২৮

প্রথম অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

কৃষিকাজ এবং কৃষি প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক। মূলত যে প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজ করা হয় তাই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। প্রতিটি কৃষিকাজের সাথে সুনির্দিষ্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কৃষি আর শুধু পারিবারিক খাদ্য সংস্থানের বিষয় নয়। এটা এখন ব্যবসায়িক পেশায় উন্নীত হয়েছে। আগে কৃষি বলতে জমি হাল-চাষ করে বীজ বুনে ঘরে ফসল তুলে বছরের খোরাক সংগ্রহ করাকেই বোঝাত। কিন্তু এখন কৃষির প্রতিটি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচাদি ও ফসলের বাজারমূল্যের মাপকাঠিতে আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিকে মূল্যায়ন করা হয়। তাই এখন কৃষি সমস্যা যেমন জটিলতর হচ্ছে তেমনি কৃষি বিজ্ঞানীরাও উচ্চতর জ্ঞানসমৃদ্ধ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা কৃষিকাজের নাম, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির নাম, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়াদি শিখেছি। নবম-দশম শ্রেণিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে জমির প্রস্তুতি, উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসলভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য, ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়রোধ, বীজ সংরক্ষণ, রোগবালাই দমন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব।

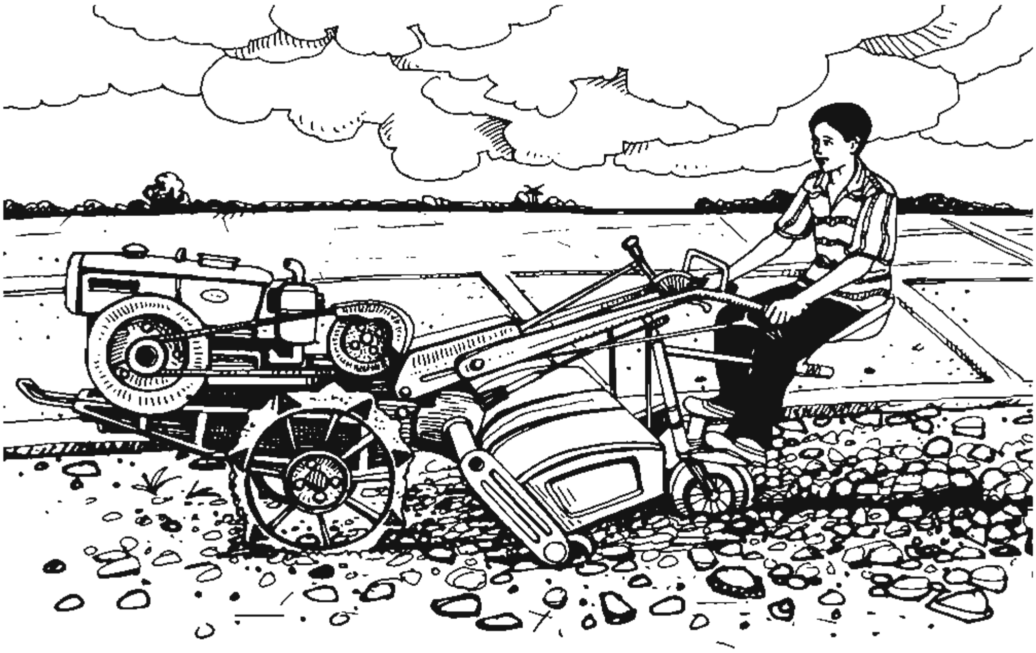

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারব।
- ধাপ উল্লেখপূর্বক জমির প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- জমি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।

- ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- ভূমিক্ষয়ের কার্যকরী উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্যবীজ সংরক্ষণ করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল নির্বাচন

মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটি ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম। ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাটিই হচ্ছে পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস। সব মাটিতে সব ফসল জন্মায় না। যেমনঃ ধানগাছ কাদা মাটি বা কাদা দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। অপর দিকে বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। তবে বাংলাদেশের মাটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পলি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরনের ফসলই কমবেশি জন্মায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই নরম, হালকা, ধূলিময় ও কর্ষণযোগ্য। মাটি বলতে তাকেই বোঝায় যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় আর গবাদিপশু বিচরণ করে। একজন কৃষককে যখন মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঝটপট বলে থাকেন যে ভূ-ত্বকের গভীরে যতটুকু লাঙলের ফলা পৌঁছে, যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী তাই মাটি। অর্থাৎ কৃষকের ভাষায় ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি গভীর স্তরকে মাটি বলা হয়। অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ স্তরেই নিহিত।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মাটিতে অল্প বিস্তর সব ফসলই জন্মে। কিন্তু সব অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও ধান, কোথাও গম, কোথাও আলু আবার কোথাও পাট ভালো হয়। নিচে বিভিন্ন ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ধান চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	গম চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) কংকর ও বেলেমাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষের উপযোগী। এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য খুব ভালো। নদ-নদীর অববাহিকা ও হাওর-বাঁওড় এলাকা যেখানে পলি জমে সেখানেও ধান ভালো হয়। ২) প্রকারভেদে উঁচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনের জমিতেই ধানের চাষ করা যায়। যেমন, নিচু জমিতে বোরো ও জলি আমন চাষ করা হয়। ৩) মাটির অম্লাত্মক থেকে নিরপেক্ষ অবস্থা ধান চাষের অনুকূল। ৪) মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কমপোস্ট ব্যবহার করে এর মাত্রা বাড়ানো যায়। ৫) মাটির নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিঙ্ক, সালফার ইত্যাদির মাত্রা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।	১) উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। মাঝারি নিচু জমিতেও গম চাষ করা হয়। ২) দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য ভালো। এঁটেল - দোআঁশ মাটিতেও গমের চাষ হয়। ৩) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গমের চাষ ভালো হয়। এছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরেও গমের আবাদ হয়। ৪) বাংলাদেশের সব কৃষি অঞ্চলে গমের চাষ হয় না। বিশেষ করে হাওর - বাঁওড় ও বিল অঞ্চলে গমের আবাদ করা হয় না। ৫) যে মাটিতে P^H (অম্লাত্মক-ক্ষারত্মক)। মাত্রা ৬.০ থেকে ৭.০ সেসব মাটিতে গম ভালো হয়।

পাট চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	ডাল চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে পাট ভালো জন্মে। ২) নদীবাহিত গভীর পলিমাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। ৩) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট ভালো জন্মে।	১) উঁচু ও মাঝারি জমিতে দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ এবং পলি দোআঁশ মাটিতে ডাল জাতীয় ফসল জন্মে। ডাল ফসল অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারেনা। তাই নিষ্কাশনযোগ্য মাটিই ডাল চাষের জন্য উপযোগী। ২) ডাল নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় চুনযুক্ত মাটিতে ভালো হয়। ৩) শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহওয়া এবং অল্প বৃষ্টিপাত ডাল ফসল চাষের জন্য উপযোগী। যদি এরূপ আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত থাকে তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ প্রকৃতির মাটিতে অবশ্যই ডাল ফসল ভালো ফলন দিবে। ৪) বিনা চাষে ডাল ফসল আবাদের জন্য নিচু ও মাঝারি জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি থেকে বর্ষার পানি নেমে গেলে ভেজা মাটিতে ডাল ফসলের বীজ বোনা হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটি উপযোগী ফসলগুলোর তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সবজিজাতীয় ফসলের মাটির বৈশিষ্ট্য

সবধরনের শাকসবজিই উঁচু, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। নিচে আলু ও টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

গোল আলু চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি আলু উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।	১) যে কোনো প্রকার মাটিতে টমেটোর চাষ করা যায়। তবে বেলে ও কংকরময় মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় না।
২) আলুর জন্য বায়ু চলাচল করতে পারে এরূপ নরম ও ঝুরঝুরে মাটি দরকার। এতে আলু বড় হওয়ার সুযোগ পায়।	২) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের উপযোগী।
৩) গোল আলুর মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকা দরকার।	৩) বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করলে টমেটোর চাষ মোটামুটি করা যায়।
৪) মাটির P^H মাত্রা ৬-৭ এর মধ্যে থাকা ভালো।	৪) মাটির P^H মাত্রা নিরপেক্ষ মাত্রার কাছাকাছি হলে ভালো হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কোন ধরনের মাটিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

মৃত্তিকাভিত্তিক পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

আগের পাঠগুলোতে আমরা ফসলের শ্রেণি অনুযায়ী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শিখেছি। এই পাঠে আমরা মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে শিখব। মাটির বৈশিষ্ট্য বলতে মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত খনিজের মাত্রা, P^H মাত্রা এবং মাটির বন্ধুরতাকে বোঝায়। আমরা নিশ্চয় জেনেছি যে মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কোনো একটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের মাটির প্রতিনিধিত্ব করে। এক একটি কৃষি অঞ্চল এক একটি প্রযুক্তিও বটে। কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মাটির বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা। মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন কৃষি কর্মের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি যত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষিকাজের ফলাফলও তত বেশি লাভজনক হবে। মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলকে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই অঞ্চলগুলোর মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন দেখানো হলো।

১। দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল
২। কাদা মাটি অঞ্চল
৩। বরেন্দ্র অঞ্চল ও মধুপুর অঞ্চল
৪। পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল
৫। উপকূলীয় অঞ্চল

মৃত্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল এ অঞ্চলের ভূমির মাটি দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ প্রকৃতির। উঁচু ভূমি থেকে মাঝারি নিচু ভূমি এ অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। দোআঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি। এর P^H মাত্রা ৫.২ হতে ৬.২ পর্যন্ত। পলি দোআঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা খুবই সামান্য। P^H মাত্রা ৪.৯ হতে ৬.১ পর্যন্ত। **কাদা মাটি অঞ্চল**	দোআঁশ মাটিতে প্রায় সব রকমের ফসল ফলে। দোআঁশ ফসল উৎপাদনের আদর্শ মাটি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। আবার সেচের উপর নির্ভর করেও কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : গম, মুলা, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঢেঁড়স, মরিচ, চিনা বাদাম ইত্যাদি খরিপ-১ : রোপা আউশ, বোনা আমন, পাট (সাদা), কাউন, বেগুন, তিল, মুগ, বোনা আউশ, ভুট্টা, ধৈঞ্চা ইত্যাদি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত ও উফশী) **সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আখ+আলু, আখ+মুগ, পিঁয়াজ, রসুন, গম, আলু, মুগ, সরিষা ইত্যাদি খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট (তোষা), তিল, ভুট্টা খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত ও উফশী)
মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু এলাকার মাটি কর্দম বিশিষ্ট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলি কাদা বিশিষ্ট মাটিও লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মাঝারি মাত্রায় জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চমাত্রার জৈব পদার্থও আছে। পটাশজাত খনিজের মাত্রা মাঝারি।	মাঝারি নিচু ও নিচু অঞ্চলসমূহে কাদা মাটি বেশি দেখা যায়। কাদা মাটিতে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। নিচে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো। বৃষ্টিনির্ভর বা সেচনির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের ফসল প্রধানত ধান। রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা থাকলে কিছু পরিমাণ অন্যান্য ফসলও জন্মে।

বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
উঁচু এবং মাঝারি উঁচু ভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুপুর অঞ্চল সমতল ও উঁচু ভূমি বিশিষ্ট্য। এর মাটি দোআঁশ। মাটিতে নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর P^H মাত্রা ৫.৫-৬.৫। চিত্র : দোআঁশ মাটি	এই অঞ্চলের মাটি দোআঁশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো সেচ পেলে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করা যায়। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নামের তালিকা দেওয়া হলো। **বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, বার্লি ও শীতকালীন শাকসবজি। খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, কাউন, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী) **সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, গম, সরিষা, চিনাবাদাম, মসুর, টমেটো, বাঁধাকপি, ছোলা, শীতকালীন শাকসবজি খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট, মুগ, ঢেঁড়স খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)
পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল এ অঞ্চলের ৯০ শতাংশের বেশি ভূমি উঁচু। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, কক্সবাজার ও আখাউড়া ছাড়াও আরও অনেক জেলার পাহাড়ি অঞ্চল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই মাটি দোআঁশ। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা সামান্য। এখানকার মাটির P^H মাত্রা ৫ - ৫.৭।	পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চলের মাটি দোআঁশ হওয়াতে পাহাড়ি অঞ্চলেও নানাবিধ ফসল উৎপাদন হয়। নিচে এই মাটিতে উপযোগী বৃষ্টি নির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের তালিকা দেওয়া হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, গম ইত্যাদি খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, বোনা আমন খরিপ-২ : রোপা আমন **সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, আখ+মসুর, বোরো, গম, সরিষা ইত্যাদি খরিপ-১ : ধৈঞ্চা, বোনা আউশ, রোপা আউশ খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)

মৃত্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
উপকূলীয় অঞ্চল সেন্টমার্টিন দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, বরিশাল ও ভোলাসহ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে মাঝারি উঁচু ভূমির আধিক্য বেশি। এর মাটি দোআঁশ এবং বেলে ও পলি দোআঁশ প্রকৃতির। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা অল্প। এই অঞ্চলের মাটির P^H মাত্রা ৭.০ - ৮.৫ । 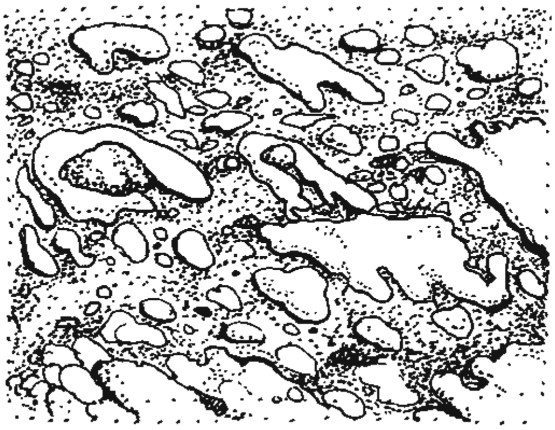 চিত্র : পলিমাটি	যেহেতু এখানকার মাটি দোআঁশ, বেলে ও পলি দোআঁশ তাই বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য এই অঞ্চলে উৎপাদন হয়। নিচে এই অঞ্চলে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচনির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : গম, সরিষা, মুগ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, বেগুন, শিম, টমেটো, চিনাবাদাম, ভুট্টা ইত্যাদি খরিপ-১ : বোনা আউশ, রোপা আউশ, পাট, কাঁকরোল ইত্যাদি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী) **সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : বোরো, টমেটো, আলু, সরিষা, তরমুজ, মুগ, মরিচ ইত্যাদি । খরিপ-১ : রোপা আউশ খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম/উপজেলা কোন পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেবে। অতঃপর গ্রামের মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটির প্রকার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

কৃষির যত কাজ আছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জমি প্রস্তুতি। সব ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতি এক রকম নয়। যেমন বোরো বা রোপা আমন ধানের ক্ষেত্রে আগে চারা উৎপাদন করতে হবে, তারপর মূল জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু বোনা আউশ বা বোনা আমনের ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন না করে সরাসরি প্রস্তুতকৃত মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রায় একইরূপ গমের ক্ষেত্রেও ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। জমি প্রস্তুতির সাথে বহুমুখী কাজ জড়িত। যথা জমি চাষ, মই দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে ফসলভিত্তিক প্রত্যেকটি কাজ আলোচনা করা হলো।

ধান চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি

ধান বাংলাদেশে সারা বছর চাষ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হয়। ধানের বীজতলা তৈরি ও জমি প্রস্তুতি ৪র্থ অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছেদ থেকে আমরা জানতে পারব।

গম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ

গম রবি শস্য। বর্ষার মৌসুম শেষ হওয়ার পর মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম চাষের উপযুক্ত সময়। মাটির ‘জো’ দেখে জমিতে লাঙল চালনা করা হয়। গমের মাটি ঝুরঝুরা করে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্য ৩ থেকে ৪ বার আড়াআড়ি জমি চাষ দিয়ে বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করতে হয়। জমিতে যাতে কোনো বড় ঢেলা না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। গমের জন্য দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। এ মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয়। পাওয়ার টিলারের সাথে রটোভেটর সংযোগ করে জমি চাষ দিলে মাটি ভালো চাষ হয় এবং একই সাথে মইও দেওয়া হয়। ঝুরঝুরা মাটি গমের অঙ্কুরোদগমের জন্য খুবই উপযোগী। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা গম চাষে সার প্রয়োগ সম্পর্কে জেনেছি।

ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি চাষ করা হয় না। তবে মসুর ডালের জন্য জমিতে দুইএকটি চাষ দেওয়া হয়। বর্ষা শেষ হলে আশ্বিন-কার্তিকে যখন নদীর চর ও নিচু এলাকা হতে পানি সরে যায় তখন নরম পলি মাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। চাষ দেওয়া সম্ভব হলে দুইএকটি চাষও দেওয়া হয়। চাষের পর পতিত জমিতে আবার অনেক সময় রোপা ও বোনা আমনের জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ডালের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

নিচু এলাকায় বর্ষার পানি নেমে গেলে বা উঁচু এলাকায় আশ্বিন মাস হতে আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়। সাধারণত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আলুর চাষ করা হয়। এই মাটি চাষ করা মোটামুটি সহজ। আলুর জমি ৫-৬ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি প্রস্তুত করা হয়। আজকাল পাওয়ার টিলার দ্বারা চাষ করা হয় বলে ৩-৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিলেই ঝুরঝুরা হয় এবং সমান করা হয়।

নালা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেওয়ার পর জমি সমান করে বীজ বপনের জন্য জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নালা করতে হবে। প্রত্যেকটি নালা প্রায় ১০-১২ সেমি গভীর করতে হবে। একটি নালা থেকে আর একটি নালার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি । অতঃপর নালার মধ্যে ১৫ সেমি দূরে দূরে বীজ বুনে দিতে হয়। আলুচাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব

ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। ভূমি কর্ষণের সংকীর্ণ অর্থ হলো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জমির মাটি যন্ত্রের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা। কিন্তু ভূমি কর্ষণের সাথে নানা প্রযুক্তি জড়িত। যেমন, বীজকে অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক গভীরতায় স্থাপন করা, মাটিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করা, উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিয়ে আসা, মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করে জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আর এই গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য ভূমি কর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে "শস্যের বীজ মাটিতে সুষ্ঠুভাবে বপন ও পরবর্তী পর্যায়ে চারাগাছ বৃদ্ধির জন্য মাটিকে যে প্রক্রিয়ায় খুঁড়ে বা আঁচড়ে আগাছামুক্ত, নরম, আলগা ও ঝুরঝুরা করা হয় তাকে ভূমি কর্ষণ বলে"। ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ। আদিকাল থেকেই মানুষ ভূমি কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তারা কাঠের বা পাথরের তৈরি সুচালো যন্ত্রের সাহায্যে মাটি আলগা ও নরম করে ফসলের বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতেন। ফসলভেদে ভূমি কর্ষণের তারতম্য হতে পারে কিন্তু এর গুরুত্ব কখনো খাটো করে দেখার বিষয় নয়।

জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খনার বচনে উল্লেখ আছে যে,

ষোল চাষে মুলা
তার অর্ধেকে তুলা
তার অর্ধেকে ধান
বিনা চাষে পান

অর্থাৎ মুলা চাষের জন্য ষোলটি চাষ দিতে হবে যতক্ষণ না মাটি ঝুরঝুরা বা আলগা হয়। তুলা চাষের জন্য আট চাষ দিতে হবে আর ধানের জন্য চারটি চাষই যথেষ্ট। মজার ব্যাপার হলো পান উৎপাদনে কোনো চাষই লাগেনা। আর এই ধারণা থেকেই আজকাল বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে 'বিনা চাষ' প্রথা প্রচলন করা হয়েছে। এখন অনেক কৃষকই বিনা চাষে ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবে। কৃষকেরা গম চাষের জমি তৈরি করছেন তা দেখবে এবং জমি প্রস্তুতির কর্মকাণ্ডগুলো খাতায় লিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন রকমের জমি প্রস্তুতির নিয়ম খুঁজে বের করে লিখবে।

ভূমি কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য

ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য থেকেই জমি প্রস্তুতকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। নিচে ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

১। **মাটি বীজের অঙ্কুরোদগম অবস্থায় আনয়ন :** যে প্রক্রিয়ায় মাটিকে ঝুরঝুরা করে বীজের অঙ্কুরোদগমের অবস্থায় আনা ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করা হয় তাকে কর্ষণ বলে। জমিতে বারবার চাষ দেওয়ার ফলে মাটি নরম হয়, দানাগুলো মিহি হয় আর তাতে বীজ গজানো ও ফসল জন্মানোর এক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কীভাবে কতটুকু প্রস্তুত করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদ, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারের উপর। দোআঁশ, বেলে বা বেলে দোআঁশ মাটির মতো হালকা মাটিতে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিলে ভূমি কর্ষণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মতো ভারী মাটিতে ৫/৬ বার চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে রস থাকলে চাষের সময় মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয় আর রস না থাকলে বড় বড় ঢেলা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে মাটির কণা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অঙ্কুরোদগম হয়।

২। **মাটি সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রকরণ :** জমিতে সার এবং জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। ভূমি কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাটির সাথে সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো। এ জন্যে জমি দুই একবার চাষ দেওয়া হলে গোবর বা কমপোস্ট জমিতে ছিটাতে হয়। পরবর্তী চাষের সময় এগুলো মাটিতে মিশে যায়। অনেক সময় ধৈঞ্চার চাষ করেও সবুজ সার হিসাবে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশানো হয়। তাতে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

৩। **ভূ-অভ্যন্তরস্থ কীট-পতঙ্গ দমন :** মাটির অভ্যন্তরে অনেক পোকা আছে যেগুলো ফসলের অনেক ক্ষতি করে। ভূমি কর্ষণের সময় এসব পোকা, পুত্তলি ও ডিম উন্মুক্ত হয় এবং পাখিরা এগুলো খেয়ে নিধন করে। আর সূর্যালোকও সেগুলো ধ্বংস করে। মাটির নিচের পোকাগুলোর মধ্যে উই, উরচুঙ্গা ও পিপীলিকা প্রধান।

৪। **মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** ভূমি কর্ষণ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। অকর্ষিত ভূমি থেকে পানি তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায় অথবা পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কর্ষিত জমিতে সার বা সেচের পানি আটকা পড়ে যা পরে মাটি শুষে নেয়। অর্থাৎ কর্ষিত জমির মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এরূপ মাটিতে বীজ বুনলে ভালো অঙ্কুরোদগম হয় এবং ফসলের বৃদ্ধি ঘটে।

৫। **মাটিস্থ জীবাণুসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি :** মাটিতে অনেক জীবাণু আছে যা মাটিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তন্মধ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এসব জীবাণু মাটিতে থেকে মাটির জৈব পদার্থ পচনে সাহায্য করে। ভালোভাবে ভূমি কর্ষণ করলে মাটিস্থ এই জীবাণুগুলোর কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়। গাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে এবং ফলন অনেক ভালো হয়।

৬। **মাটির ক্ষয়রোধ :** ভূমি কর্ষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো উঁচু-নিচু জমিকে সমতল করা এবং আঁটসাঁট করা। তাতে বৃষ্টির বা সেচের পানি গড়িয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। আর এতে একদিকে ভূমিক্ষয় নিরোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুব্যবহার হয়।

জমি চাষের বিবেচ্য বিষয়

জমি কীভাবে চাষ করতে হবে তা নির্ভর করে কতকগুলো বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো হচ্ছে :

১। ফসলের প্রকার

২। মাটির প্রকার

৩। আবহাওয়া ও

৪। খামারের প্রকার ইত্যাদি।

১। **ফসলের প্রকার :** জমি চাষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কৃষক কী কী ফসল ফলাবেন। যেমন ধান চাষের জন্য কয়েকবার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি কর্দমাক্ত করতে হয়। কিন্তু মুলা, মরিচ, ইত্যাদির জন্য মাটি মিহি ঝুরঝুরা করে চাষ করতে হয়। আখ ও আলু চাষের জন্য গভীরভাবে জমি চাষ করতে হয়।

২। **মাটির প্রকার :** জমি চাষ মাটির প্রকারের উপর নির্ভর করে। কাদা মাটিতে বেশি আর্দ্রতা বা ভেজা থাকলে চাষ করা যায় না। মাটির "জো" আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আবার হালকা মাটি যেমন দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আর্দ্রতা একটু বেশি থাকলেও চাষ করা যায়। এই মাটিগুলো চাষের জন্য খুব ভালো।

৩। **আবহাওয়া :** আবহাওয়ার প্রভাবে মাটিতে আর্দ্রতার তারতম্য ঘটে। বৃষ্টি-বাদল কম হলে মাটিতে আর্দ্রতার অভাব ঘটে। এই অবস্থায় জমিতে গভীর চাষ দেওয়া অনুচিত। মাটিতে গভীর চাষ দিলে আর্দ্রতার অভাব দেখা দিবে। আবার বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে এবং রোপা আমন চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা সহজ হয়।

৪। **খামারের প্রকার :** বাড়ির আশে পাশের জমিতে নিবিড় শস্য চাষ করা হয়। নিবিড় শস্য চাষে একটা ফসল তুলেই আর একটা ফসল লাগানো হয়। তখন জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে না। জমির মাটি এমনিতেই আলগা থাকে। তবে অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিক্ষয় ও ক্ষয়রোধ

ভূমিক্ষয়

মুষলধারায় বৃষ্টির সময় মাটির দিকে লক্ষ কর। দেখবে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যখন ভূপতিত হয়, তখন বৃষ্টির আঘাতে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয় আর এতে পানি ঘোলা হয়। কাদামিশ্রিত ঘোলা পানি অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে বৃষ্টিপাতের সময় কাদামিশ্রিত ঘোলা পানির মাধ্যমে ভূমিক্ষয় হয়। আবার ঝড়-বাতাস বা ঘূর্ণিঝড়ের দিকে লক্ষ কর। দেখবে বাতাসের বেগের সাথে মাটির কণা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যায়। বাইরে থাকলে তোমার চোখে মুখেও মাটির কণাগুলো আঘাত করে। অর্থাৎ বাতাস দ্বারাও ভূমিক্ষয় হয়। এখন হয়তো বলতে পারবে যে বিভিন্ন কারণে জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে।

ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়ায় একস্থানের মাটি ক্ষয় হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নতম স্থানে জমা হয়। ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিবাত্যা, নদীর স্রোত, বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ, পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ ইত্যাদি। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি মাটির উপরের স্তরের কিছু মৃত্তিকা কণা বহন করে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পানি প্রবাহের সাথে ভূমির উপরি স্তরের মাটি আলগা হয় এবং নিম্নভূমিতে গিয়ে জমা হয়। তেমনি কর্ষিত জমি হতে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেও ধুলার আকারে মাটি দূরদূরান্তে চলে যায়। নদীর স্রোত নদী তীরের পাড় ভেঙে মাটি অন্যস্থানে বহন করে নিয়ে যায় ও চরাঞ্চল গড়ে তোলে। মানুষ যখন বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফসলের আবাদ করে তখন ভূমি উন্মুক্ত হয়। আর গবাদিপশুও বিচরণ করে। এতে ভূমির ক্ষয় হয়। একইভাবে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ করে। বৃষ্টিপাতের জলস্রোত উপরের স্তরের মাটি উপত্যকায় পরিণত হয়।

ভূমিক্ষয়ের প্রকার

ভূমিক্ষয় দুই প্রকার। যথা: (১) প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় ও (২) মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় : প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় হয়। ভূ-সৃষ্টির শুরু থেকেই এর ক্ষয় শুরু হয়েছে। দীর্ঘকালের এই ক্ষয়ের ফলেই নদীর মোহনায় বা সমুদ্রে চর সৃষ্টি হয়েছে বা দ্বীপ গড়ে উঠেছে। এই ভূমিক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল উর্বর হয়েছে, আবার অনেক অঞ্চল অনুর্বর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনবরত ভূমিক্ষয় হচ্ছে অথচ আমরা তা উপলব্ধি করি না।

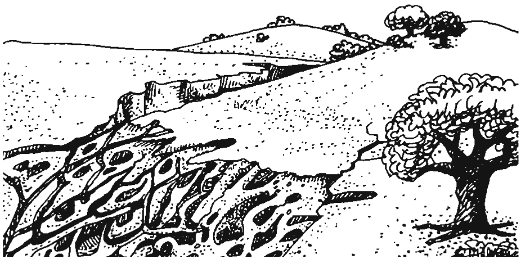

চিত্র : প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলো চলার পথে ভূপৃষ্ঠের মাটির কণা বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য যে পরিমাণ মাটির ক্ষয় হয় তা খুবই নগণ্য এবং দৃষ্টিগোচর হয় না। হয়তো তাই ভূমির এই ক্ষয়কে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় মাটি গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। মাটি গঠন ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয়ের ফলে কৃষিকাজ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের শ্রেণিবিভাগ

ভূমিক্ষয়কে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় এবং
খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় : বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয়কে নিচের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়;

i) আস্তরণ ভূমিক্ষয়
ii) রিল ভূমিক্ষয়
iii) নালা বা গালি ভূমিক্ষয়
iv) নদী ভাঙন।

নিচে এই ভূমিক্ষয়গুলোর আলোচনা করা হলো

i) আস্তরণ ভূমিক্ষয় : যখন বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি উঁচু স্থান থেকে ঢাল বেয়ে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন জমির উপরিভাগের নরম ও উর্বর মাটির কণা কেটে পাতলা আবরণের বা আস্তরণের মতো চলে যায়। একেই বলা হয় আস্তরণ ভূমিক্ষয়। বৃষ্টির ফলে যে ভূমিক্ষয় হয় তা সহজে চোখে পড়েনা। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বোঝা যায় যে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। আর এর কারণ হলো আস্তরণ ভূমিক্ষয়।

ii) রিল ভূমিক্ষয় : রিল ভূমিক্ষয় আস্তরণ ভূমিক্ষয়েরই দ্বিতীয় ধাপ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পানি বেশি হলে জমির ঢাল বরাবর লম্বাকৃতির রেখা সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা হাতের রেখার মতো। এই ছোট ছোট রেখা কালক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হতে থাকে। বৃষ্টির পানির স্রোতধারায় উর্বর মাটি জমি থেকে স্থানচ্যুত হয় ফলে জমি উর্বরতা হারায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও অসুবিধার সৃষ্টি করে।

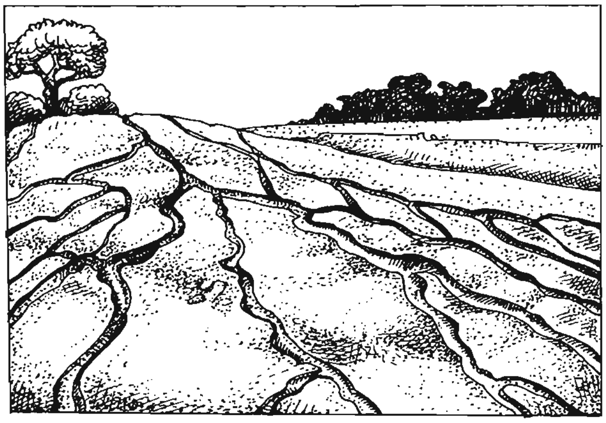

চিত্র : রিল ভূমিক্ষয়

iii) নালা বা গালি ভূমিক্ষয় : এই ভূমিক্ষয় আস্তরণ ভূমিক্ষয়ের তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ রিল ভূমিক্ষয় থেকেই নালা বা গালি ভূমিক্ষয়ের উদ্ভব। দীর্ঘকাল ধরে রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে এর ছোট ছোট নালাগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ফসলের মাটিও বেশি ক্ষয় হতে থাকে। একসময় এগুলো নর্দমা বা ছোট নদীর মতো দেখায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে নালা বা গালি ভূমিক্ষয় ততই বেশি হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ ভূমিক্ষয় দেখা যায়।

iv) নদীভাঙন : নদীভাঙন বাংলাদেশের ভূমিক্ষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি বছরই নদীভাঙনে শত শত হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে। বর্ষার শুরুতে কিংবা বর্ষার শেষে নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নদীতীরের কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

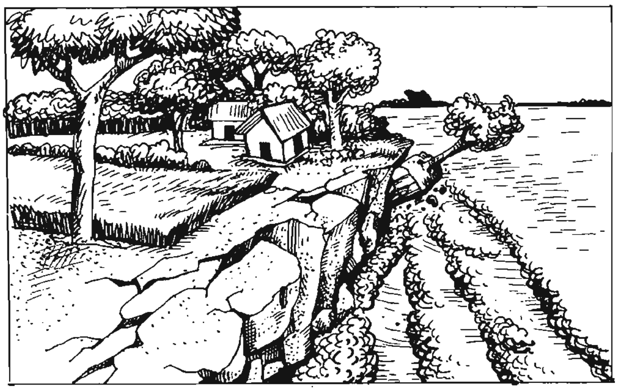

চিত্র : নদী ভাঙন

খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

গতিশীল বায়ু প্রবাহ কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয় বলে। যেসব এলাকা সমতল, তুলনামূলকভাবে গাছপালা কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম, সেসব এলাকায় বাত্যাজনিত কারণে ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা যায়। বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটি আলগা ও হালকা। কাজেই প্রবল বেগে বায়ুবাহিত হলে এসব মাটি সহজেই উড়ে যায়। আর যে স্থানে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সে স্থানের বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয় আরও বেশি।

মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহ উর্বর অঞ্চলে বালি নিক্ষেপ করে অনুর্বর করে তোলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর - রাজশাহী অঞ্চলে চৈত্র - বৈশাখ মাসে বায়ু প্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ সামান্য দেখা যায়। এর ফলে বায়ু প্রবাহে আবাদি জমির উর্বরতা কমে যায়।

২। মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয় : মানুষের বাঁচার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানুষ মাটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আসছে কৃষি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে। ভূমিকর্ষণ, পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ কৃষিকাজের মূল অংশ। এ কাজগুলো দ্বারা মাটিকে প্রতিনিয়ত উৎপীড়ন করা হচ্ছে। ফলে ভূমিগুলো প্রাকৃতিক শক্তির তথা বৃষ্টি ও বাতাসের নিকট উন্মোচিত করছে এবং ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে যত ব্যবহার করা হবে ততই এর ক্ষয় হতে থাকবে। অনাচ্ছাদিত মাটি বৃষ্টি, বায়ু, বন্যা, এগুলোর আক্রমণের শিকার। পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষের ফলে বা ধাপ করে চাষ করার ফলে মাটি আলগা হয়ে যায়। মুষলধারায় বৃষ্টির ফলে সেখানকার মাটিতে পাহাড়ি ধস নামে। এতে বিপর্যয় আকারে ভূমিধস হয়। শুধু তাই নয়- এতে জান মালেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া গবাদিপশু বিচরণকালে অনেক ধুলাবালি উড়ে যায়। মেঠোপথে চলার সময়ও ধুলাবালি উড়ে।

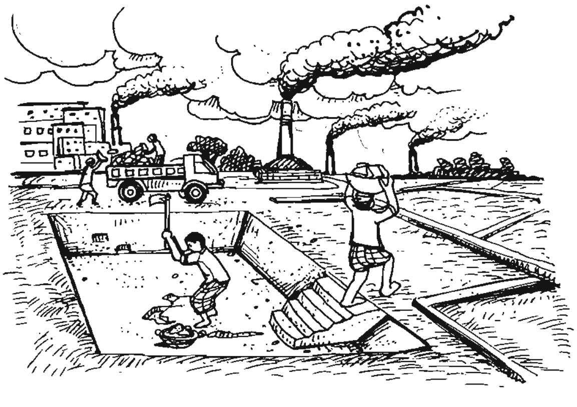

চিত্র : মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতির বিভিন্ন দিক

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিম্নরূপ:

(১) ভূমিক্ষয়ের কারণে জমির পুষ্টিসমৃদ্ধ উপরের স্তরের মাটি অন্যত্র চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতার ব্যাপক অপচয় হয়।

(২) ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটিতে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ফসলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

(৩) ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে নদী-নালা, হাওর-বিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে দেশে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে ফসল, পশুপাখি, বাড়িঘরের অনেক ক্ষতি হয়।

(৪) ভূমিক্ষয়ের বিরাট অংশ নদীতে জমা হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

(৫) প্রবাদ আছে যে উর্বর মাটির ক্ষয় মানে সভ্যতার ক্ষয়।

ভূমিক্ষয়ের কারণ

অনেক কারণেই ভূমিক্ষয় হয়। উপরের ভূমিক্ষয়ের প্রকার থেকেও অনুধাবন করা যায় ভূমিক্ষয়ের কারণ কী কী। নিচে ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

(১) বৃষ্টিপাত
(২) ভূমি ঢাল
(৩) মাটির প্রকৃতি
(৪) শস্যের প্রকৃতি
(৫) জমি চাষের পদ্ধতি
(৬) নিবিড় চাষ
(৭) বায়ু
(৮) মানুষের কার্যাবলি।

বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাত চাষাবাদের জন্য যেমন ভালো আবার ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সংখ্যা ও পরিমাণ ভূমিক্ষয়কে প্রভাবিত করে। মুষলধারায় বৃষ্টি হলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় এবং মাটিতে সজোরে আঘাত করে আর এতে মাটির কণা আলগা হয়। মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি একটি প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। যাওয়ার পথে পানির সঙ্গে আলগা ও নরম মাটি স্থানান্তরিত হয়। পানির বেগ যত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হবে।

ভূমির ঢাল : অধিক ঢালু মাটিতে অধিক বেগে পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য পার্বত্য এলাকায় সমতল এলাকার চেয়ে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় সাধারণত জুম চাষ করা হয়। ফলে জুম চাষে এলাকার মাটি আলগা হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই মাটি বৃষ্টির পানির সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে চলে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে জুম চাষের স্থানটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

মাটির প্রকৃতি : ভূমিক্ষয় মাটির কাঠামো, বুনট ও জৈব পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। বেলে-দোআঁশ মাটি অধিক সচ্ছিদ্রতা বলে সম্পূর্ণ বৃষ্টির পানি সহজেই শুষে নিতে পারে। তাই এই মাটির ভূমিক্ষয় কম। কিন্তু কাদা ও ভারী মাটি সচ্ছিদ্রতা কম থাকায় এর শোষণক্ষমতাও কম। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও মাটির উপরে পানি জমে যায় এবং ভূমির ক্ষয় করে মাটি নিচের দিকে ধাবিত হয়।

চাষ পদ্ধতি ও শস্যের প্রকৃতি : পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে যদি ঢালের বরাবর চাষ করা হয়, তবে বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিক্ষয় হয়। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ সৃষ্টি করে ফসলের চাষ করা হয়। কিন্তু যদি তা না করে সাধারণভাবে জমি চাষের চেষ্টা করা হয় তবে পাহাড়টি ভূমিধস বা ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়। জমি ঘন ঘন চাষ করলেও ভূমিক্ষয় হয়।

যেসব ফসল মাটি ঢেকে রাখে, সেগুলো মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন চিনাবাদাম, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি। কিন্তু আখ, ভুট্টা, ধান, গম ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে মাটিকে ঢেকে রাখেনা। ফলে ভূমিক্ষয় হয়।

বায়ু প্রবাহ : যে অঞ্চলে গাছপালা কম সে অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় হয়। বাংলাদেশের রাজশাহীও দিনাজপুর অঞ্চলে এরূপ ভূমিক্ষয় হয়।

মানুষের কার্যাবলি : ভূমিক্ষয়ের প্রকৃত কারণ মানুষ নিজে। ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। তাতে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত হয় এবং ভূমিক্ষয়েরও সূচনা হয়। তাছাড়া মানুষ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করেও কৃষিজমি বিনষ্ট করছে এবং ভূমিক্ষয় করছে।

ভূমিক্ষয়রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

কৃষিকাজের অন্যতম একটি প্রযুক্তি হলো ভূমিক্ষয়রোধ করা। এই প্রযুক্তি ভূমিক্ষয়রোধের কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

পানিপ্রবাহ হ্রাসকরণ

১) ভূমিক্ষয় কমাতে পানি প্রবাহের বেগ কমানো জরুরি। বিভিন্নভাবে পানি প্রবাহের বেগ কমানো যায়। যথা, বাঁধ বা আইল দিলে পানির বেগ কমে আসে, মাটি পানি শোষণের সময় পায় ও ভূমিক্ষয়রোধ হয়।

২) রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয় তা ভরাট করে সমান করে দিলে পানির বেগ কমে যাবে এবং ভূমিক্ষয়ও রোধ হবে।

৩) বড় নালার মধ্যে আগাছা জন্মাতে দেওয়া এবং শেষ প্রান্তে খুঁটি পুতে তারের জাল বাঁধলে পানির বেগ কমে যাবে।

৪) উপরন্তু তারের জালের মূলে খড়কুটা ফেললে পানির বেগ একেবারেই মন্থর হবে এবং ভূমিক্ষয়রোধ হবে।

পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তকরণ

জমিতে পানি জমা থাকলে এর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হলে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং জমির মাটি আলগা হয়ে সরে যায়। কাজেই কৃষিজমি কয়েক খণ্ডে ভাগ করে প্রতি খণ্ড হতে পানি সরালে ভূমির এরূপ ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হবে।

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

জমিতে জৈব পদার্থ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে মাটির দানাবন্ধন ভালো হয়। বৃষ্টির পানি মাটিকে ক্ষয় না করে সহজেই নিচের দিকে চলে যেতে পারে। যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমির মাটি সহজেই ক্ষয় হয়।

পাহাড়ে ধাপে ধাপে ফসল চাষ করা

জুম চাষের ফলে পাহাড়ের মাটি সহজেই আলগা হয় ও ভূমিক্ষয় হয়। জুম চাষ না করে যদি পাহাড়ের গায়ে চতুর্দিক ঘিরে সমতল সিঁড়ি বা ধাপ করে চাষাবাদ করা হয় তা হলে বৃষ্টির পানি পাহাড়ের মাটির ক্ষয় করতে পারবে না।

কন্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি সমন্বিত লাইনে জমি চাষ করা হয়। ঢালের আড়াআড়ি জমি চাষ হয় বলে বৃষ্টির পানির গতি কম হয়। মাটি স্থানান্তরিত না হয়ে ফসলের গোড়ায় আটকে থাকে।

কাজ : ১. শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় কৃষিজমি ক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।
২. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভূমিক্ষয়রোধে সচেতনতামূলক পোস্টার লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীজ সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

বীজ উৎপাদন থেকেই বীজ সংরক্ষণের শুরু। জমিতে এর বপন বা রোপণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীজ সংরক্ষণ বলতে বীজের উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাকেই বোঝায়।

বীজ সংরক্ষণের শর্তসমূহ

বীজ উৎপাদন

বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার:

১) কেবল বীজের জন্যই ফসলের চাষ করা;
২) নির্বাচিত জমির আশপাশের জমিতে ঐ নির্দিষ্ট বীজ ফসলের অন্য জাতের আবাদ না করা;
৩) বীজ উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ করা;
৪) বীজের চারা বৃদ্ধিকালে জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলা;
৫) বীজের ক্ষেত ঘন ঘন পরিদর্শন করা যাতে (ক) আগাছা দমন (খ) ভিন্ন জাতের গাছ তোলা ও (গ) রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়;
৬) ফসলের পরিপক্বতার দিকে দৃষ্টি রাখা;
৭) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ফসল কাটা, মাড়াই করা ও ঝাড়া।

বীজ শুকানো

বীজকে দীর্ঘায়ু ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজকে শুকানো প্রয়োজন। বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়াতে বীজ শুকানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের আর্দ্রতা একটি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রায় আনার জন্যই বীজ শুকানো হয়। ক্ষেত থেকে যখন ফসল কাটা হয় তখন এর আর্দ্রতা থাকে ১৮% থেকে ৪০% পর্যন্ত। এই আর্দ্রতা বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলে। তাই বীজকে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের নিমিত্তে বীজের আর্দ্রতাকে ১২% বা তার নিচে নামিয়ে আনা আবশ্যক। আর এ জন্যই বীজ শুকানোর প্রয়োজন হয়।

বীজ শুকানোর পদ্ধতি

দুই প্রকারে বীজ শুকানো যায়। যথা: (১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বাতাসে শুকানো এবং (২) উত্তপ্ত বাতাসে শুকানো।

বীজের চারিপার্শ্বস্থ বাতাসের আর্দ্রতা যদি বীজের আর্দ্রতা থেকে বেশি হয় তবে বাতাস থেকে আর্দ্রতা বীজের মধ্যে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বীজ ও বাতাসের আর্দ্রতা সমান হয়। বীজের আর্দ্রতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখতে হলে চারিপার্শ্বস্থ বাতাসকে শুকনো রাখা প্রয়োজন।

বীজ শুকানোর সময় নির্ভর করে (১) বীজের আর্দ্রতার মাত্রা (২) বাতাসের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মাত্রা (৩) বাতাসের গতি এবং (৪) বীজের পরিমাণের উপর।

মনে রাখতে হবে যে, (১) বেশি তাপমাত্রায় বীজ শুকালে বীজের সমূহ ক্ষতি হয়। যেমন- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। (২) অপর্যাপ্ত তাপে বীজ শুকালেও একই রকম ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পরিমিত তাপে দক্ষতার সাথে বীজ শুকালে-

- সর্বোচ্চ মানের বীজ পাওয়া যায়।
- বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজের ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসল কাটার পর ফসলের দানাকে বীজে পরিণত করা এবং পরবর্তী বপনের পূর্ব পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বপ্রকার পরিচর্যাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। বীজ শুকিয়ে মান ও আকার অনুযায়ী ভাগ করা এবং সর্বশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ।

বীজকে সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে যে সুফল পাওয়া যায়

১) বীজের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়;
২) বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়;
৩) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কৃষিতাত্ত্বিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন হয়েছে কি না, সঠিকভাবে ফসল কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে বীজ শুকিয়ে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় আনা হয়েছে কি না বোঝায়। প্রতিটি কাজেই বীজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বীজের নমুনার মধ্যে (১) বিশুদ্ধ বীজ (২) ঘাসের বীজ (৩) অন্যান্য শস্যের বীজ ও (৪) পাথর থাকে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হার বের করাই বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।

বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গজায় তা বের করাই বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা। যখন বীজের আর্দ্রতা ৩৫ - ৬০% বা তার উপর হয় তখন অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। এর হার শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ১০০ টি বীজ গুণে একটি বেলে মাটিপূর্ণ মাটির পাত্রে রেখে পানি দ্বারা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে পানি যেন শুকিয়ে না যায়। নির্ধারিত সময় পরে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হবে। যতটি বীজ গজাবে ততটি হবে বীজের অঙ্কুরোদগম হার।

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা

বীজ থেকে আর্দ্রতা বের করে দিয়ে তাতে কতটুকু আর্দ্রতা আছে তা জানার পদ্ধতিকে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা বলা হয়। তা শতকরা হারে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সূত্র: আর্দ্রতার শতকরা হার} = \frac{\text{নমুনা বীজের ওজন - নমুনা বীজ শুকানোর পর ওজন}}{\text{নমুনা বীজের ওজন}} \times ১০০$$

বীজের জীবনীশক্তি পরীক্ষা

এই পরীক্ষার জন্য বীজ গজানোর একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজ বেশি গজাবে সে বীজেরই জীবনীশক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হবে।

বীজ বিপণন

বীজ বিপণন বীজ প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বীজ বিপণন বলতে বীজ সংগ্রহ, প্যাকেজ করা, বিক্রিপূর্ব সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিক্রি এসব কাজকে এক কথায় বিপণন বলে। বীজ বিপণনকালে ক্রেতাদের নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।

- বীজের জাত নির্ধারণ
- বীজের পরিমাণ নির্ধারণ
- বীজ অনুমোদনপ্রাপ্ত বা প্রত্যায়িত কি না
- বীজের অঙ্কুরোদগমের হার
- বীজের বিশুদ্ধতার হার
- বীজের আর্দ্রতা
- বীজের জীবনকাল
- বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার নাম
- বীজ অনুমোদন সংস্থার নাম
- বীজ বপনের পদ্ধতি
- সংরক্ষণের নির্দেশ
- বীজের মূল্য

বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব

বীজ ভীষণ অনুভূতিপ্রবণ। একটু অসর্তকতার জন্য বিপুল পরিমাণে বীজ নষ্ট হয়। কৃষকেরা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বীজ সংরক্ষণ করেন। একটাই উদ্দেশ্য সামনের মৌসুমে যাতে সুস্থসবল বীজ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তবুও কীভাবে বীজের জীবনীশক্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ফসল বাছাই মাড়াই ও পরিবহনকালেই বীজ বেশি নষ্ট হয়। ইঁদুর, পাখি, ছত্রাক, আর্দ্রতা ইত্যাদির কারণে প্রায় দশ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বীজের সাথের ধুলাবালি, নুড়ি পাথরও বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে।

বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণগতমান রক্ষা করা এবং যেসব বিষয় বীজকে ক্ষতি করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে বীজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আছে। এক এক ফসলের বীজের জন্য এক এক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন দানাজাতীয় শস্য- ধান, গম, ভুট্টা, বীজের জন্য ধানগোলা, ডোল মাটির পাত্র, চটের বস্তা, পলিব্যাগ ও বেড ব্যবহার করা হয়। নিম্নে ফসল সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বীজ শুকানো ও চটের বস্তায় সংরক্ষণ

বীজ শুকানো অর্থ হচ্ছে বীজ থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সরানো এবং পরিমিত মাত্রায় আনা। আর্দ্রতার মাত্রা ১২ - ১৩% হলে ভালো হয়। বাংলাদেশে বীজ শুকানো হয় রোদে বা সূর্যতাপে। এই আর্দ্রতা ১২-১৩ শতাংশ নামাতে বীজগুলোকে প্রায় তিনদিন প্রখর রোদে শুকাতে হয়। ঠিকমতো শুকিয়েছে কিনা তা বীজে কামড় দিয়ে পরখ করতে হবে। বীজে কামড় দেওয়ার পর যদি 'কট' করে আওয়াজ হয় তবে মনে করতে হবে বীজ ভালোমতো শুকিয়েছে। অতঃপর বীজগুলোকে চটের বস্তায় নিয়ে গোলা ঘরে রাখা হয়। বীজ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য বীজের বস্তায় নিমের পাতা, নিমের শিকড়, আপেল বীজের গুঁড়া, বিশকাটালি ইত্যাদি মেশানো হয়।

ধান গোলায় সংরক্ষণ

ধান সংরক্ষণের জন্য ধানের গোলা ব্যবহার হয়ে থাকে। ধানগোলার আয়তন বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করা হয়। বীজ রাখার আগে ধানগোলার ভিতরে ও বাইরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করতে হবে। বীজগুলো এমনভাবে ভরতে হবে যেন এর ভিতর কোনো বাতাস না থাকে। সেই জন্য ধানগোলার মুখ বন্ধ করে এর উপর গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

ডোলে সংরক্ষণ

ডোল আকারে ধানগোলার চেয়ে ছোট। ডোল ধানগোলার চেয়ে কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ পাত্র। এটি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে তৈরি করা হয়। ধানগোলার মতোই ডোলের বাইরে ও ভিতরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করা হয়।

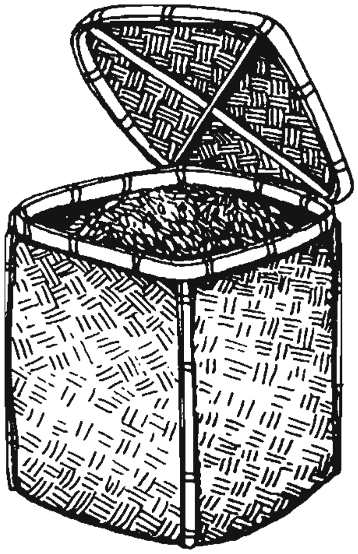
চিত্র : ডোলে বীজ সংরক্ষণ

পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ

আজকাল পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এই ব্যাগ আরডিআরএস কর্তৃক উদ্ভাবিত। সাধারণ পলিথিনের চেয়ে বীজ রাখার পলিথিন অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। শুকনো বীজ এমনভাবে পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে এবং ব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ বাতাস বেরিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাগের মুখ তাপের সাহায্যে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইরে থেকে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ না থাকে।

মটকায় সংরক্ষণ

মটকা মাটি নির্মিত একটি গোলাকার পাত্র। গ্রাম বাংলায় এটি বহুল পরিচিত। এটি বেশ পুরু এবং মজবুত। মটকার বাইরে মাটি বা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলা ঘরের মাচার নির্দিষ্ট স্থানে মটকা রেখে এর ভিতর শুকনো বীজ পুরোপুরি ভর্তি করা হয়। অতঃপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করা হয়।

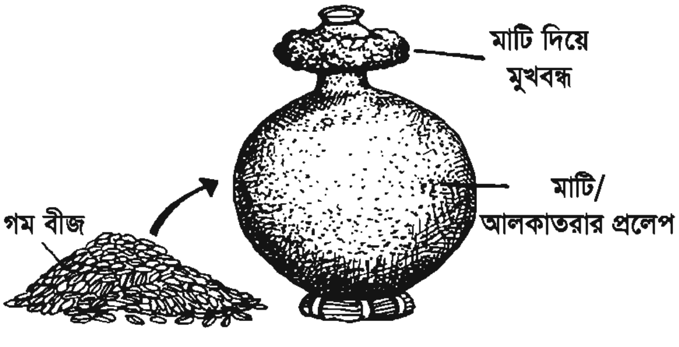

চিত্র : মাটির কলসে বীজ সংরক্ষণ

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটির কলসে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে সে পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য সংরক্ষণ

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছ চাষকে লাভজনক করতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে দেওয়া সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে যা খরচ হয় তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় করতে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে সচরাচর যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো- চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু-ছাগলের রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ি, জলজ উদ্ভিদ যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রয়োজনমতো মিশ্রিত করে চাষিরা মৎস্য খাদ্য তৈরি করে। কারখানায় তৈরি বাণিজ্যিক খাদ্যও মৎস্য খামারে ব্যবহার করা যায়। যে ধরনের খাদ্যই মাছ চাষের পুকুরে ব্যবহার করা হোক না কেন তার গুণগতমান ভালো হওয়া আবশ্যক। খাবারের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্থসবল পোনা ও মাছ হবে না, মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হবে এবং মাছের মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যাবে। আবার মাছের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হবে না। খাদ্যের গুণগতমান ভালো রাখার জন্য যথাযথ নিয়মে খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং ওজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে-

১। **খাদ্যের আর্দ্রতা:** খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।

২। **বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।

৩. **তাপমাত্রা:** অতিরিক্ত তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট হয়। পোকা-মাকড়সমূহ ২৬-৩০° সে. তাপমাত্রায় খুব ভালো জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ফেলে ও তাদের মলমূত্র দ্বারা ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে।

৪। **সূর্যালোক:** সূর্যালোকে খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

৫। **অক্সিজেন:** খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেন্সিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) ঘটাতে পারে যা খাদ্যের গুণগতমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । অক্সিজেন ছত্রাক ও পোকা-মাকড় জন্মাতেও সহায়তা করে।

সঠিক খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

ক) শুকনো খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

১) খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোনো মুখ বন্ধ পাত্রে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে এই খাদ্য পুনরায় রোদে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়।

২) খাদ্য পরিষ্কার, শুকনো, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।

৩) গুদাম ঘরে সংরক্ষিত খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সেমি উপরে কাঠের পাটাতনে রাখতে হবে।

৪) পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের বস্তার নিচে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৫) খাদ্য তিন মাসের বেশি গুদামে রাখা যাবে না। এর মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলা উচিত।

৬) ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর উপদ্রবমুক্ত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৭) খাদ্য কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সাথে রাখা যাবে না।

খ) আর্দ্র/ভেজা খাদ্য উপাদান

১) খাদ্য তৈরির জন্য তাজা ছোট মাছ হলে তাৎক্ষণিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

২) তৈলাক্ত/চর্বিযুক্ত খাদ্য কালো রঙের বা অস্বচ্ছ পাত্রে নির্ধারিত তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।

৩) ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহ বাতাস এবং আলোকবিহীন পাত্রে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

কাজ :শিক্ষার্থীরা খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করবে এবং পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ: রেসিডিটি

পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কোনো খাদ্যের গুণাগুণ ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। আবার তৈরি করা পশুখাদ্যের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্যও গুদামজাত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদিপশুর খাদ্যের বেশির ভাগ কৃষি শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়াই বা শস্যদানা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে অনেক ঘাস উৎপাদিত হওয়ায় তা গবাদিপশুকে খাওয়ানোর পরও অতিরিক্ত থেকে যায়। আবার শীতকালেও অতিরিক্ত শিম গোত্রীয় ঘাস উৎপাদন হয়। তাই এই অতিরিক্ত ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যখন ঘাসের অভাব হয় তখন এই সংরক্ষিত ঘাস গবাদিপশুকে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যকে রোগজীবাণু ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। পশুপাখির দানাদার খাদ্যকে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করে বেশি দিন গুণাগুণ ঠিক রেখে সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্যের আর্দ্রতা বেশি হলে এতে ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক জন্মানো খাদ্য খেলে পশুপাখির দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক সময় পশু অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের বিভিন্ন ধাপসমূহ

ক) হে তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হে তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে হে তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন, সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

২। ফুল আসার সময় ঘাস কাটতে হয়।

৩। ঘাস রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে রাখা হয়।

৪। ঘাস শুকিয়ে মাচার উপর স্তূপাকারে বা চালাযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

খ) সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইলেজ তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে সাইলেজ তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা, নেপিয়ার, গিনি ঘাস বেশি উপযোগী।

২। ফুল আসার সময় রসাল অবস্থায় ঘাস কাটতে হয়।

৩। ঘাস কেটে বায়ুনিরোধক স্থানে বা সাইলো পিটে রাখা হয়।

৪। সাইলো পিটে ঘাস রাখার সময় ঝোলাগুড়ের দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হয়।

৫। তারপর বায়ু চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

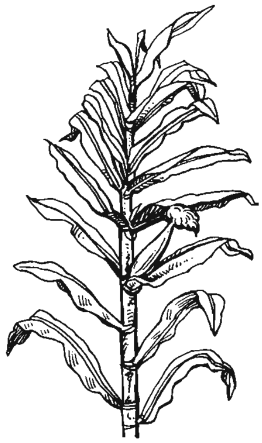

চিত্র : সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা কাটার উপযুক্ত অবস্থা

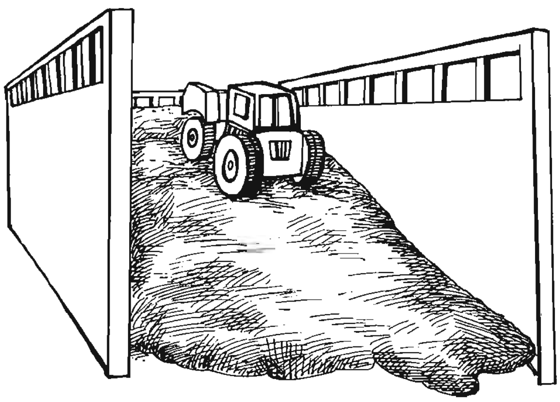

চিত্র : সাইলো পিটে সবুজ ঘাস পরিপূর্ণ করা হচ্ছে

গ) খড় তৈরির মাধ্যমে ফসলের বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে বেশিরভাগ কৃষক পরিবারে গরুর জন্য খাদ্য হিসাবে খড় ব্যবহার করা হয়। গরুকে দৈনিক ৩-৪ কেজি শুকনো খড় দেওয়া হয়। এটি আঁশজাতীয় খাদ্য। নিম্নে খড় তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। শস্যগাছ (ধান, ভুট্টা, খেসারি ইত্যাদি গাছ) ক্ষেত থেকে কাটার পর সেগুলো মাড়াই করে শস্যদানা আলাদা করে ফেলা হয়।

২। বর্জ্য গাছগুলো রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে এনে খড় তৈরি করা হয়।

৩। খড় সাধারণত গাদা করে রাখা হয়।

ঘ) দানাশস্য ও তৈলবীজের উপজাত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ধান, গম, ভুট্টা, খেসারি, কলাই ইত্যাদি দানাশস্যের উপজাতসমূহ যেমন, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের খোসা, খৈল ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়।

ঙ) কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, পোল্ট্রির জন্য দানাদার খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করে মেশ, পিলেট ও ক্রাম্বল ফিড তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাছের সম্পূরক খাদ্য

মাছের সম্পূরক খাদ্যের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

দেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ফাইটোপ্লাংকটন (উদ্ভিদকণা), জু-প্লাংকটন (প্রাণিকণা) খুদিপানা, ছোট জলজ পতঙ্গ, পুকুরের তলদেশের কীট, লার্ভা, কেঁচো, ছোট ছোট শামুক, ঝিনুক, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরে অধিক ঘনত্বে পোনা ছাড়া হয়। এ অবস্থায় শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করলেও তা যথেষ্ট হয় না। এজন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাহির থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। একে সম্পূরক খাদ্য বলে। যেমন-চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশ মিল ইত্যাদি। গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এদের জন্য খুদিপানা, কুটিপানা, শাকসবজির নরম পাতা, ঘাস কেটে সম্পূরক খাবার হিসাবে পুকুরে দেওয়া যায়। মাছকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-আমিষ, স্নেহ বা তেল, শর্করা, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের মাত্রা যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে সম্পূরক খাবার এ সকল পুষ্টি উপাদান যথাযথ মাত্রায় রেখে তৈরি করা হয় তাকে সুষম সম্পূরক খাদ্য বলে।

মাছের সম্পূরক খাদ্যের উৎস

মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসের উপর ভিত্তি করে এসব উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) উদ্ভিদজাত খ) প্রাণিজাত। নিচে এদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক) উদ্ভিদজাত: উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- চালের কুঁড়া, গম ও ডালের মিহিভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, আটা, চিটাগুড়, খুদিপানা, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট, বিভিন্ন নরম পাতা যেমন- মিষ্টিকুমড়া, কলাপাতা, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

খ) প্রাণিজাত: প্রাণিজাত কয়েকটি খাদ্য উপাদান হচ্ছে শুটকি মাছের গুঁড়া বা ফিশমিল, রেশম কীট মিল, চিংড়ির গুঁড়া (শ্রিম্প মিল), কাঁকড়ার গুঁড়া, হাড়ের চূর্ণ (বোন মিল), শামুকের মাংস, গবাদিপশুর রক্ত (ব্লাড মিল) ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের উপকারিতা

১। মাছকে নিয়মিত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করলে অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ চাষ করা যায়।

২। অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থসবল পোনা উৎপাদন করা যায়।

৩। পোনার বাঁচার হার বেড়ে যায়।

৪। মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫। মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

৬। মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

৭। সর্বোপরি কম সময়ে জলাশয় থেকে অধিক মাছ ও আর্থিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সহজলভ্য কয়েকটি খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করবে এবং উপাদানের নাম খাতায় লিখবে।

মাছের পুষ্টি চাহিদা ও সম্পূরক খাদ্য তালিকা

মাছের প্রজাতি, বয়স ও আকারের উপর ভিত্তি করে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিভিন্ন হয়। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেণু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙ্গুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। সুস্থ-সবল মাছ ও এর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাবারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যক। এসব উপাদানের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। এটি খাবারে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা বলতে প্রধানত আমিষের চাহিদাকে বোঝায়। মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন-শর্করা, তেল ও খনিজ লবণ কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। এসব খাদ্যে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। খাদ্যে আমিষের এই চাহিদা প্রজাতি ও জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর ভেদে কার্প বা রুই জাতীয় মাছের জন্য ২০-৩০%, চিংড়ির জন্য ৩০-৪৫% ও ক্যাটফিশ (আঁশ বিহীন লম্বা শুঁড়যুক্ত মাছ) বা মাগুর জাতীয় মাছের জন্য ৩৫-৪৫% থাকে।

একটি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে যখন মাছ উৎপাদন করা হয় তখন ঐ খাদ্য কী পরিমাণ মাছ দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে (মাছ খাচ্ছে) এবং তা থেকে কী পরিমাণ মাছ উৎপাদন হচ্ছে তা খাদ্য রূপান্তর হার বা FCR (Food conversion ratio) নির্ণয়ের মাধ্যমে হিসাব করা যায়। এভাবে একাধিক খাদ্যের FCR নির্ণয় করে তুলনা করলে কোন খাদ্য অধিক ভালো তা বোঝা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খাদ্য রূপান্তর হার বা FCR হচ্ছে খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাই খাদ্য রূপান্তর হার।

$$\text{FCR} = \frac{\text{মাছকে প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মজুদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হলো যার মোট ওজন ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণের সময় মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল। এ ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হলো ।

সুতরাং, $\text{FCR} = \frac{২১}{১৫ - ১} = ১.৫$

FCR-এর মান সবসময় ১ এর চেয়ে বড় হয়। যে খাদ্যের FCR এর মান যত কম সে খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো অর্থাৎ, সে খাদ্য ব্যবহার করে অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়।

কার্প বা রুই জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিম্নের উপাদানগুলোর মিশ্রণে সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
ফিসমিল	১০-২১
সরিষার খৈল	৪৫-৫৩
চালের কুঁড়া	২৮-৩০
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	০.৫-১.০
চিটাগুড় ও আটা	৫
মোট	১০০

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে ভালো মান সম্পন্ন নির্ধারিত খাদ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। উপাদানসমূহ প্রয়োজনে আটা পেষা মেশিনে বা ঢেঁকিতে ভালো করে চূর্ণ বা গুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। সূত্র অনুযায়ী খাদ্য উপাদানসমূহ একটি একটি করে মেপে নিয়ে মিক্সার মেশিনে বা একটি বড় পাত্রে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো উপাদানগুলোতে পানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে। এখন মণ্ড ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে ভেজা বা আর্দ্র খাদ্য হিসাবে মাছকে দিতে হবে। মাছকে সরবরাহকৃত খাবার পানিতে বেশি স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসাবে আটা বা ময়দা বা চিটাগুড় ব্যবহার করা যায়। ভেজা বা আর্দ্র খাবার প্রতিদিন প্রয়োগের পূর্বে পরিমাণমতো তৈরি করতে হবে।

আবার এই মণ্ড দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প মূল্যে দেশীয় পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিলেট বা দানাদার খাবার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বায়ুরোধী প্লাস্টিক ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে। খৈলে কিছু বিষাক্ত উপাদান থাকে, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই খৈল একদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হয়। খৈল ভেজানো পানি মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য নির্বাচিত খাদ্য

উপাদানের সাথে ০.৫-১% ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়।

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

১। মাছ দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ করে। এজন্য চাষের পুকুরে দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে দিতে হবে। অন্যদিকে চিংড়ি নৈশভোজী বলে এদেরকে সন্ধ্যায় বা রাতে খাবার দিতে হয়।

২। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেণু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙ্গুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ বার এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিন বা মাসে ১ বার জাল টেনে কয়েকটি মাছের গড় ওজন নিয়ে পুকুরে সর্বমোট যতটি মাছ ছাড়া হয়েছিল তা দিয়ে গুণ করলে পুকুরে মোট মাছের ওজন পাওয়া যাবে। এভাবে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।

৩। পুকুরে গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি চাষ করা হলে এদেরকে খুদিপানা, কুটিপানা, সবুজ ঘাস, হেলেঞ্চা, কচুরিপানার নরম অংশ ও বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা যেমন-বাঁধাকপি, পুঁইশাক, কলাপাতা কেটে পুকুরে সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাঁশের টুকরা বা গাছের ডালদিয়ে বর্গাকারের একটি ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ফ্রেমটি একটি খুঁটির সাহায্যে পুকুরের পানিতে স্থাপন করতে হবে যেন এটি সবসময় একই স্থানে থাকে। এই ফিডিং ফ্রেম বা রিং-এ উপরোক্ত খাদ্য দিতে হবে। মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করতে হবে।

৪। শুকনো খাবার পানির উপরে ছিটিয়ে এবং আর্দ্র বা ভেজা খাবার পানির ৩০-৬০ সেমি নিচে স্থাপিত খাদ্যাদানি, ট্রে বা মাচায় প্রয়োগ করতে হবে। এতে খাদ্যের অপচয় কম হবে।

৫। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের চারপাশে ৩-৪ টি নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিতে হবে। এতে করে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

৬। শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় বলে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ কমিয়ে আনতে হয়।

৭। পুকুর অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

৮। খাদ্য প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পর খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।

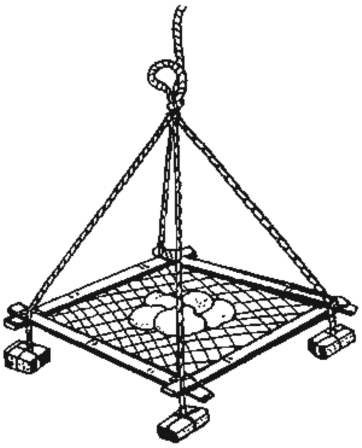

চিত্রঃ খাদ্যদানি বা ট্রে

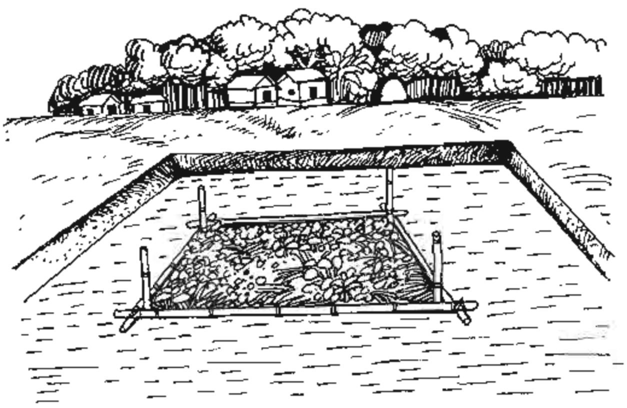

চিত্রঃ ফিডিং ফ্রেম/ রিং

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ যে কোনো মৎস্য খামারে গিয়ে মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি দেখে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

নতুন শব্দ : ব্লাড মিল, বোন মিল, শ্রিম্প মিল, ফিডিং ফ্রেম/রিং, খাদ্যদানি, খাদ্যরূপান্তর হার (FCR)

পশুপাখির সম্পূরক খাদ্য

পশুপাখির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এদেরকে প্রচলিত খাবারের সাথে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে। পশুপাখির মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই পশুপাখি পালনে সম্পূরক খাদ্যের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।

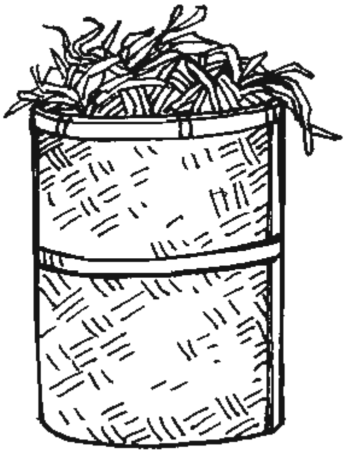

চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি দ্বারা ভেজা খড়

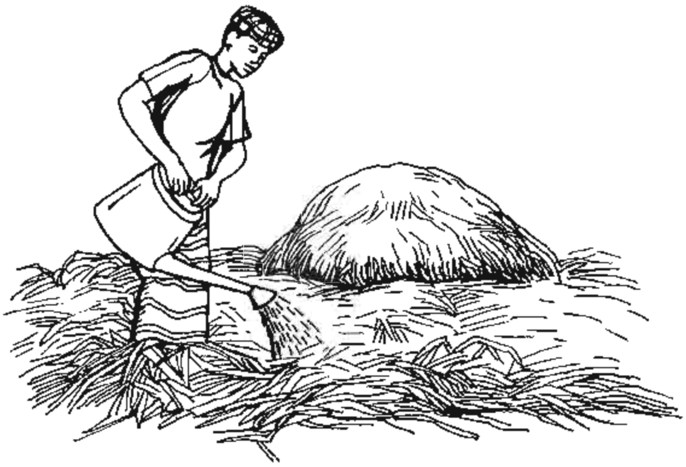

চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি খড়ে মেশানো হচ্ছে

বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-

ক) ইউরিয়া মোলাসেস খড় : ইউরিয়ার সাহায্যে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ-

উপকরণ

খড় : ২০ কেজি,
ইউরিয়া : ১ কেজি,
পানি : ২০ লিটার,
একটি মাঝারি আকারের পাত্র, বস্তা ও মোটা পলিথিন ।

তৈরির পদ্ধতি

১ । প্রথমে একটি বালতিতে ১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে ।

২ । ডোলের চারদিকে গোবর ও কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে ।

৩ । এবার ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া মেশানো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে ।

৪ । সমস্ত খড় সম্পূর্ণ পানি দ্বারা মিশিয়ে ডোলের মুখ বস্তা ও মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে ।

৫ । দশ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে ।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১ । একটি গরুকে দৈনিক ২-৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে ।

২ । খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে ।

খ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক : দানাদার খাদ্যের সাহায্যে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরিকরণ-

উপকরণ

গমের ভুসি : ৩ কেজি
ঝোলাগুড় : ৬ কেজি
ইউরিয়া : ৯০ গ্রাম
লবণ : ৩৫ গ্রাম
খাবার চুন : ৫০০ গ্রাম
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স : ৫০ গ্রাম এবং
কাঠের ছাঁচ (১ কেজি ব্লক তৈরির জন্য)

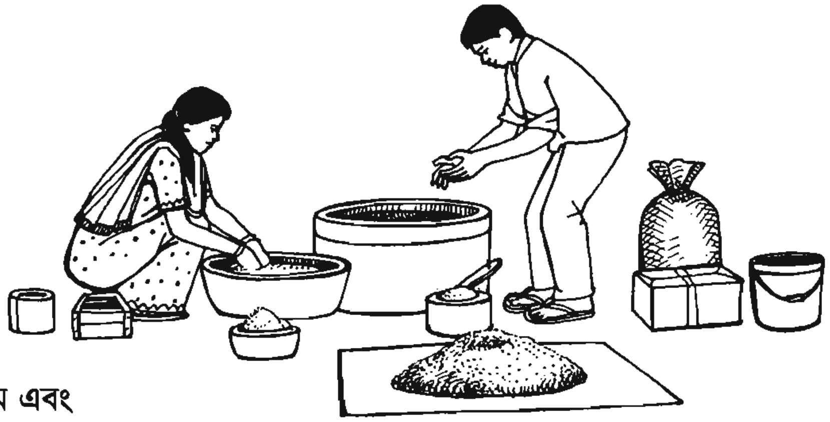

চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরির উপকরণ

তৈরির পদ্ধতি

১ । প্রথমে একটি লোহার কড়াইতে সামান্য ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ ঝোলাগুড়সহ জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করতে হবে ।

২ । কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে এর মধ্যে ইউরিয়া, চুন, লবণ, গমের ভুসি যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হবে ।

৩। এরপর ছাঁচের মধ্যে কিছু ভুসি ছিটিয়ে মিশ্রিত দ্রব্যগুলো ভরে ব্লক তৈরি করতে হবে।

৪। ব্লকগুলো শুকনো আলো বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১। একটি গরুকে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে দিতে হবে।

২। প্রথমে ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে না চাইলে ব্লকের উপর কিছু ভুসি ও লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।

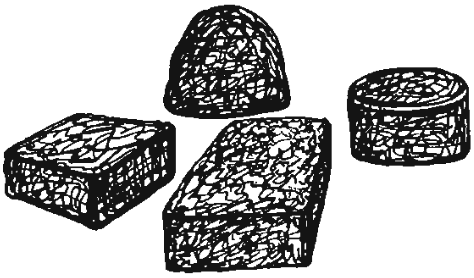

চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

গ) গবাদিপশুকে অ্যালজি বা শেওলা খাওয়ানো

অ্যালজি বা শেওলা এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী হতে পারে। তবে এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এক কোষী অ্যালজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এদের মধ্যে প্রধান হলো ক্লোরেলা। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা বাংলাদেশের মতো উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত বর্ধনশীল ।

অ্যালজির পুষ্টিমান

অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। অ্যালজি পানি ব্যবহার করে কম খরচে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর বা জলাধার, পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি, মাসকলাই বা অন্যান্য ডালের ভুসি ও ইউরিয়া

অ্যালজির উৎপাাদন পদ্ধতি

১। প্রথমে সমতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি করতে হবে। জলাধারটি লম্বায় ৩ মিটার, চওড়ায় ১.২ মিটার এবং গভীরতায় ০.১৫ মিটার হতে পারে। এর পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ৩.৩৫ মিটার, ১.৫২ মিটার চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম জলাধারটির তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে জলাধারটির আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতে অ্যালজি চাষ করা যায়।

২। এরপর ১০০ গ্রাম মাসকলাই বা অন্য ডালের ভুসিকে ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে।

এভাবে একই ভুসিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করে পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।

৩। এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ এবং মাসকলাই ভুসি ভেজানো পানি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকালে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির পানিকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুরে ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।

৫। এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এসময় অ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়। প্রতি ১০ বর্গমিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি উৎপাদন করা সম্ভব।

৬। একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মতো পানি, সার এবং মাসকলাই ভুসি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি চাষ শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

৭। যখন অ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামি রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

খাওয়ানো পদ্ধতি

১। সব বয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যায়।

২। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

৩। অ্যালজি পানি দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়।

৪। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে।

৫। খামারের ৫টি গরুর জন্য ৫টি কৃত্রিম পুকুরে অ্যালজি চাষ করতে হয় যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হলে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

ঘ) বাজারে তৈরি সম্পূরক খাদ্য : পশুপাখির উৎপাদন চলমান রাখার জন্য এদেরকে বাজারে তৈরি বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১. আমিষ সম্পূরক খাদ্য - যেমন, প্রোটিন কনসেনট্রেট

২. খনিজ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স

৩. খাদ্যপ্রাণ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স।

ঙ) বাছুরের সম্পূরক খাদ্য তালিকা-

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) : বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পশুখাদ্য যাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এতে ২০% আমিষ ও ১০% এর অধিক চর্বি থাকে। এর উপাদানসমূহকে গরম স্কিম মিল্কে বা পানিতে মিশ্রিত করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) তৈরির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	রেশন-১ (%)	রেশন-২ (%)
১	স্কিম মিল্ক	৬৫	-
২	স্কিম মিল্ক পাউডার	-	৬
৩	পানি	-	৬০
৪	উদ্ভিজ্জ তেল	২০	২০
৫	ছানার দুধ	১০	৯
৬	ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স	০৫	০৫
	মোট	১০০	১০০

কাফ স্টার্টার (Calf Starter) : বাছুরের খাবার উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ ও ১০% এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে। কাফ স্টার্টারের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	তুলাবীজ	৩৮
২	ভুট্টা	৩০
৩	যব	১০
৪	ছানার গুঁড়া	১০
৫	গমের ভুসি	১০
৬	হাড়ের গুঁড়া	১
৭	খাদ্য লবণ	১
	মোট	১০০

কাজ : শিক্ষার্থীরা গবাদিপশুর বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরণের মাটিতে আলু উৎপাদন বেশি হয় ?

ক. দোআঁশ মাটিতে খ. বেলে দোআঁশ মাটিতে

গ. পলি মাটিতে ঘ. দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে

২. উদ্ভিদভোজী মাছ কোনটি ?

ক. রুই খ. মৃগেল

গ. তেলাপিয়া ঘ. সরপুঁটি

৩. বীজের বস্তায় পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মেশানো হয় –

i. নিমের পাতার গুঁড়া

ii. আপেলের বীজের গুঁড়া

iii. কমলার বীজের গুঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি নদীর ধারের একটি জমিতে আলুর চাষ করে আসছিলেন। প্রথম দিকে তার জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পেলেও বর্তমানে তার জমির ফলন কমে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে জমির ঢালু অংশে ভালোভাবে আইল তৈরির পরামর্শ দেন।

৪. তাসফির জমির ফলন কমে যাওয়ার কারণ –

i. জমির উর্বরতা হ্রাস

ii. জৈব পদার্থের অভাব

iii. মাটির অনুন্নত গঠন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কৃষি কর্মকর্তা তাসফিকে জমিতে আইল তৈরির পরামর্শ দেওয়ার কারণ কোনটি ?

ক. জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ খ. জমির ভূমিক্ষয় রোধ

গ. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘ. মাটির গঠনের উন্নয়ন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সফিক সাহেব তার বন্ধু রফিকের জমিতে উন্নত জাতের নতুন গম দেখে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী মৌসুমে চাষের জন্য তিনি তার বন্ধুর নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করলেন। বীজগুলোর আর্দ্রতা পরীক্ষা করার জন্য ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বীজের সম্পূর্ণ আর্দ্রতা বের করে ওজন নিয়ে ৯০ গ্রাম ওজন পেলেন। এরপর অঙ্কুরোদগম ও সতেজতা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট চিত্তে গমের আবাদ করে কাঙ্খিত ফলন পান।

ক. মাটি কাকে বলে?

খ. FCR এর মান যত কম খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো ব্যাখ্যা কর।

গ. সফিক সাহেবের পরীক্ষিত বীজের আর্দ্রতার হার নির্ণয় কর।

ঘ. সফিক সাহেব এর বীজ পরীক্ষার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর।

২. রিতা পাল মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করলেন । তিনি সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে পুকুরে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে সফল হন । তার সফলতা দেখে এলাকার অন্য চাষিরা নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন ।

ক. সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?

খ. মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট নয় কেন? ব্যাখ্যা কর ।

গ. রিতা পালের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. এলাকার অন্য মাছ চাষিদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ। এদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন বছরের পর বছর ফসল উৎপাদন করতে পারি, তেমনি একটি দেশে নতুন ফসল আত্তীকরণ ও সংযোজন করতে পারি, একটি ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ ধরে রাখতে পারি এবং নানা জীব কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উন্নততর করে তুলতে পারি।

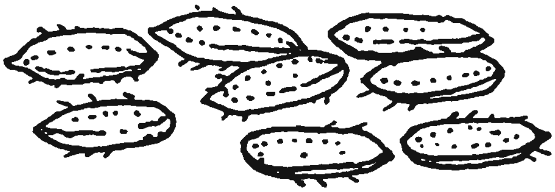

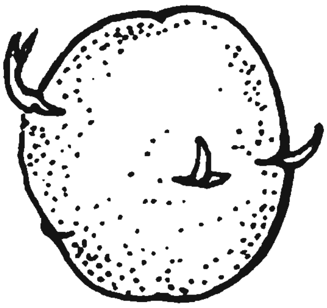

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ ও ধাপগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের পুকুরের স্বরূপ ও পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- মাছের পুকুর প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুকুরের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ও বাস্তুসংস্থান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থায়ী মৌসুমী ও আঁতুড় পুকুর বর্ণনা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের অভয়াশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের আবাসস্থল রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির আবাসন স্বরূপ এবং আবাসন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির আবাসন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির খাদ্য এবং খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গবাদিপশুর খাদ্য ও খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গবাদিপশুর খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণ

বীজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারের প্রধান মাধ্যম। সাধারণভাবে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে আমরা বীজকে দুইভাবে বুঝতে পারি। যথা-

ক) উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে, উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলে। এ ধরনের বীজকে ফসল বীজ বা প্রকৃত বীজ বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজও বলে। যেমনঃ- ধান, গম, সরিষা, তিল, শিম, বরবটি, টমেটো, ফুলকপি, মরিচ, জিরা, ধৈঞ্চা, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

খ) কৃষিতত্ত্ব অনুসারে উদ্ভিদের যে কোনো অংশ (মূল, পাতা, কাণ্ড, কুঁড়ি, শাখা) যা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে বংশবিস্তারক উপকরণ বলে। এ ধরনের উপকরণকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বা অঙ্গজ বীজও বলা হয়। যেমন : আমের কলম, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ্ড, পাথরকুচি গাছের পাতা, কাকরোলের মূল, গোলাপের ডাল ও কুঁড়ি, আনারসের মুকুট, কলাগাছের সাকার, আদা, হলুদ, রসুন, কচু ও সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ।

কাজেই দেখা যায় সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সকল কৃষিতাত্ত্বিক বীজ উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ধান, গম, মুলা, মরিচ ফসলের এবং আলু, আদা, গাঁদা ফুল ও মেহেদীর কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হলো এই যে, বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন- ধান, পাট, গম, মুলা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহের বিশেষ যত্নবান হতে হয় :

১। **বীজ জমি নির্বাচন :** বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।

২। **বীজ জমি পৃথকীকরণ :** বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

ক) জাতের নাম
খ) বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর
গ) অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ) বীজের আর্দ্রতা
চ) বীজ পরীক্ষার তারিখ

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের বস্তায় বা প্যাকেটে রাখা হয়।

৪। **বীজের হার নির্ধারণ :** বীজের বিশুদ্ধতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।

৫। **নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ :** এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাক্ত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।

৬। **বীজ বপন :** নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির উপর নির্ভর করে।

৭। **রগিং বা বাছাইকরণ :** বীজ বপনের সময় যতই বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিন পর্যায়ে রগিং বা বাছাই করা হয়।

ক। ফুল আসার আগে খ। ফুল আসার সময় গ। পরিপক্ব পর্যায়ে

৮। **পরিচর্যা :** বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যার ধরন উল্লেখ করা হলো :

ক) সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা
খ) জৈব সার প্রয়োগ
গ) প্রয়োজনমতো সেচ দেওয়া
ঘ) বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ) আগাছা পরিষ্কার করা
চ) রোগ ও পোকা দমন করা
ছ) সারের উপরি প্রয়োগ করা

৯। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ পরিপক্ব হওয়ার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বাংলাদেশে ফুল ও ফলের চারা অঙ্গজ পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রচলন খুব বেশি। কারণ এসব গাছের বংশবিস্তার প্রকৃত বীজের মাধ্যমে হলে ফুল ফল পেতে সময় বেশি লাগে ও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এ ছাড়া অনেক ফসলের প্রকৃত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার ঘটানোও সম্ভব নয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখা প্রভৃতি দ্বারা দ্রুত ও অল্প সময়ে চারা উৎপাদন সম্ভব। তাই এগুলো হলো ফসলের বংশবিস্তারক উপকরণ। কিছু কিছু ফসল যেমন– আনারস, কলা, আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির বংশবিস্তারক উপাদান সরাসরি রোপণ করা যায়। আবার কিছু ফসল যেমন– আম, লেবু, লিচু, জামরুল, গোলাপ ইত্যাদির বংশবিস্তারক উপাদান বিভিন্ন ধরনের কলম তৈরির মাধ্যমে প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয়। নিম্নে

বংশবিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজ হিসাবে বীজ আলু উৎপাদনের ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও তৈরি : বীজ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। নির্বাচিত জমি অন্যান্য ফসল যেমন- মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি সোলানেসি গোত্রভুক্ত ক্ষেত থেকে অন্তত ৩০ মিটার দূরে থাকতে হয়। ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা করে আগাছা মুক্ত করতে হবে। চাষ অন্তত ১৫ সেমি গভীর হতে হবে। মাটি বেশি শুকনো হলে প্লাবন সেচ দিয়ে মাটিতে ‘জো’ আসার পর আলু লাগাতে হবে।

বীজ শোধন : হিমাগারে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (১ লি. পানি + ৩০ গ্রাম বরিক পাউডার মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)।

বীজ প্রস্তুতি : বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্ত আলু বপন করা ভালো, কারণ আস্ত বীজ রোপনের পর এগুলোর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। আলু কেটে লাগালে প্রতি কর্তিত অংশে অন্তত ২ টি চোখ অবশ্যই রাখতে হবে। আলু কাটার সময় বারবার সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়িভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হবে।

মাটিতে ঔষধ প্রয়োগ : ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য শেষ চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেবল ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরোপিক্রিন মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া উত্তম।

সার প্রয়োগ : দুটি কারণে আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। প্রথমত সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভালো হয়। দ্বিতীয়ত গাছে কোনো খাদ্যোৎপাদনের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে আলু চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, বরিক পাউডার জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতাংশে
পচা গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম
এমওপি	১০৬০ গ্রাম
বরিক পাউডার/ বোরন সার	২৫ গ্রাম
জিঙ্কসালফেট	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	-

বীজ হার ও রোপণ সময় : বীজ হার নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব ও বীজের আকারের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলুর প্রয়োজন (একরে ৬০০-৮০০ কেজি)।

রোপণ দূরত্ব

দূরত্ব	আস্ত আলুর ক্ষেত্রে	কাটা আলুর ক্ষেত্রে
লাইন থেকে লাইন দূরত্ব	৬০ সেমি	৬০ সেমি
বীজ থেকে বীজ দূরত্ব	২৫ সেমি	১০-১৫ সেমি

সেচ ব্যবস্থাপনা : মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ প্রদান করা উচিত। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্কুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাবে। রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে কারণ ৩০ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হতে শুরু করে। সাধারণত কেইলের ২/৩ ভাগ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন : রোপণের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। সাধারণত গাছ ছোট থাকাকালীন অবস্থায় আগাছা যথাসম্ভব দমন করে রাখতে হবে। এছাড়া বথুয়া জাতের আগাছা যা ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসাবে কাজ করে তা অবশ্যই নির্মূল করে ফেলতে হবে।

মাটি উঠিয়ে দেওয়া : ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে 'জো' আসলে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরও এক বার এমনভাবে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে আলু বাহিরে না যায় এবং স্টোলন ও আলু মাটির ভিতরে থাকে।

রগিং : চারা গজানোর পর থেকে রগিং শুরু করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ শিকড়সহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগবালাই ও পোকা দমন

(ক) আলুর রোগ : আলুর রোগসমূহের মধ্যে মড়ক রোগ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ, দাঁদ রোগ, কাণ্ড পচা রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (লেইট ব্লাইট) আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আলু ফসলকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য স্পর্শক (কন্টাক্ট) জাতীয় ছত্রাকনাশক নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

খ) কাটুই পোকা : এ পোকার কীড়া আলুর প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা গাছ কেটে দেয় এবং আলু আক্রমণ করে।

- খুব সকালে যে সব গাছ কাটা পাওয়া যায় সেগুলোর গোড়ার মাটি সরিয়ে পোকার কীড়া বের করে মারতে হবে।
- আক্রমণ তীব্র হলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গ) জাব পোকা : জাব পোকা গাছের রস খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাব পোকা দমন অত্যন্ত জরুরি। এজন্য গাছের পাতা গজানোর পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ এড়াতে ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই আলু সংগ্রহ করা উত্তম।

ফসল সংগ্রহ এবং পরিচর্যা : আধুনিক জাতে পরিপক্বতা আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। তবে বীজ আলুতে সংগ্রহের অন্তত ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ক) হাম পুলিং : মাটির উপরের গাছের সম্পূর্ণ অংশকে উপড়ে ফেলাকে হাম পুলিং বলে। আলু সংগ্রহের ৭-১০ দিন পূর্বে হাম পুলিং করতে হবে। এতে সম্পূর্ণ শিকড়সহ গাছ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচে থেকে যাবে। হাম পুলিং এর ফলে আলুর ত্বক শক্ত হয়, রোগাক্রান্ত গাছ থেকে রোগ বিস্তার কম হয় ও আলুর সংরক্ষণগুণ বৃদ্ধি পায়। বীজ আলুতে অবশ্যই হাম পুলিং করতে হবে, তবে খাবার আলুর বেলায় হাম পুলিং জরুরি নয়।

(খ) আলু উত্তোলন : আলু উত্তোলনের পর পরই বাড়িতে নিয়ে আসা উত্তম। আলু তোলার পর কোনো অবস্থাতেই ক্ষেতে স্তূপাকারে রাখা যাবে না, কারণ ক্ষেতে আলু খোলা রাখলে তা বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে (যেমন-সুতলি পোকা ডিম পাড়তে পারে)।

(গ) আলু সংরক্ষণ : আলু উত্তোলনের পর বাড়িতে এনে সাথে সাথে কাটা, দাগি ও পচা আলু আলাদা করে বেছে ফেলতে হবে। তারপর ৭-১০ দিন মেঝেতে আলু বিছিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর আবারও দাগি ও পচা আলু বেছে বাদ দিয়ে ভালো আলু বস্তায় ভরে হিমাগারে পাঠাতে হবে।

এছাড়া বীজ আলু উৎপাদনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন–

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি
(খ) স্প্রাউট ও টপ শুট কাটিং পদ্ধতি
(গ) বিনাচাষে বীজ আলু উৎপাদন
(ঘ) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।

ফসল বীজের গুরুত্ব : ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সব ফসল কেবল বীজের মাধ্যমেই ফলানো সম্ভব সে ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বংশরক্ষার্থে ফসল বীজের বিকল্প নেই। এছাড়াও-

১। ফসল বীজ ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ।
২। ফসল বীজ মানুষসহ পশু পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩। বিশুদ্ধ ফসল বীজ রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা বিস্তার রোধ করে।
৪। ফসল বীজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব।
৫। ফসল বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশধারা টিকে থাকে।
৬। কোনো কোনো বীজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৭। ফসল বীজ অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব : অধিকাংশ ফসলের বংশবিস্তার বীজ দ্বারা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে ফলন পাওয়া যায়। কাজেই জনবহুল কোনো দেশের জন্য ফসল দ্রুত পাওয়ার জন্য বংশবিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজের বিকল্প নেই। এতে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, শিকড়, কুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে বংশবিস্তার করা হয় বলে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে। একই গাছে একাধিক জাতের সংযোজন ঘটানো যায়। যেমন : মিষ্টি ও টক কুল একই গাছে এবং লাল, হলুদ, কালো ও সাদা ফুল একই গোলাপ গাছে ফোটানো সম্ভব। এছাড়াও এ উপকরণ ব্যবহার করে বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অল্প সময়ে ও কম খরচে সহজে ফুল, ফল পাওয়া যায়। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি উৎপাদনে ফসল বীজ সংগ্রহ করবে এবং বীজের বর্ণনা খাতায় লিখবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাছের পুকুর

পুকুর হচ্ছে ছোট ও অগভীর বদ্ধ জলাশয়, যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা যায় এবং প্রয়োজনে এটিকে সহজেই সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলা যায়। এক কথায় পুকুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের বাসস্থান। পুকুরে পানি স্থির অবস্থায় থাকে। তবে বাতাসের প্রভাবে এতে অল্প ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক এবং এই ধরনের পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল হয়।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

মাছ চাষের পুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যা চাষ প্রক্রিয়াকে লাভজনক করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

১। পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হতে হবে।

২। পুকুরের মাটি দোআঁশ, পলি- দোআঁশ বা এঁটেল- দোআঁশ হলে সবচেয়ে ভালো।

৩। সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত।

৪। পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২ মিটার সুবিধাজনক।

৫। পুকুরটি খোলামেলা স্থানে হলে ভালো হয় এবং পাড়ে কোনো বড় গাছপালা না লাগালে ভালো হয়। এতে পুকুর প্রচুর আলো-বাতাস পাবে। ফলে পুকুরে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হবে ও মাছের খাদ্য বেশি তৈরি হবে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মিশবে। উত্তর-দক্ষিণমুখী পুকুর সূর্যালোক বেশি পাবে।

৬। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকা উচিত নয়। তলার কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সেমি এর বেশি হওয়া ঠিক নয়।

৭। চাষের পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। পুকুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ভালো। এতে করে জাল টেনে মাছ আহরণ করা সহজ হয়।

৮। পুকুরের পাড়গুলো ১ঃ২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ পুকুরের তলা হতে পুকুরের পাড় যতটুকু উঁচু হবে পাড় ঢালু হয়ে পুকুরের তলার দিকে দ্বিগুণ দূরত্বে গিয়ে মিশবে।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ

মাছের বেঁচে থাকা, খাদ্যগ্রহণ ও আশানুরূপ বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় থাকা দরকার। পুকুরে পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ভৌত গুণাগুণ ২) রাসায়নিক গুণাগুণ। মাছ চাষে এদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। ভৌত গুণাগুণ

ক) গভীরতা: পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যের আলো পুকুরের অধিক গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে অধিক গভীর অঞ্চলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংকটন তৈরি হয় না। আবার সেখানে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। অন্যদিকে পুকুর অগভীর হলে গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। এসব কারণে মাছের ক্ষতি হতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

খ) তাপমাত্রা: তাপমাত্রার বৃদ্ধির উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন– শীতকালে মাছ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয় ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এ কারণে শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো হয়।

গ) ঘোলাত্ব: কাদা কণার কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ঘ) সূর্যালোক: যে পুকুরে সূর্যালোক বেশি পড়ে সেখানে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। ফলে সেখানে ফাইটোপ্লাংটন বেশি উৎপাদিত হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২। রাসায়নিক গুণাগুণ

ক) দ্রবীভূত অক্সিজেন: পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত ফাইটোপ্লাংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত হয়। বায়ুমণ্ডল হতে সরাসরি পানির উপরিভাগেও কিছু অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। পুকুরে বসবাসকারী মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সূর্যালোকের অভাবে সালোকসংশ্লেষণ হয় না বলে পানিতে কোনো অক্সিজেন তৈরি হয় না। এজন্য সকালে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও বিকেলে বেশি থাকে। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ মিলি গ্রাম/লিটার (৫ পিপিএম বা ১ মিলিয়ন ভাগের পাঁচ ভাগ) থাকা প্রয়োজন।

খ) দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড: পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকা প্রয়োজন। তবে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা ১২ মিলি গ্রাম/লিটারের (১২ পিপিএম) নিচে থাকলে তা মাছ ও চিংড়ির জন্য বিষাক্ত নয়। মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরের পানিতে ১-২ পিপিএম কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকা প্রয়োজন।

গ) পিএইচ (P^H): পুকুরের পানির P^H মান নির্ণয় করে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রা বোঝা যায়। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির P^H ৬.৫ হতে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। P^H ৪ এর নিচে বা ১১ এর উপরে হলে মাছ মারা যায়। পানির P^H কমে অম্লীয় হয়ে গেলে পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক) প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে P^H বেড়ে ক্ষারীয় অবস্থা বেশি বেড়ে গেলে এমোনিয়াম সালফেট বা তেঁতুল পানিতে গুলে পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) ফসফরাস: প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপ্লাংটন জন্মায়।

পুকুরের প্রকারভেদ ও এর বিভিন্ন স্তর

পুকুরের প্রকারভেদ

পানি ধারণক্ষমতা, পুকুরে মাছের ধরন, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে পুকুরের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণিবিভাগ

ক) **স্থায়ী বা বার্ষিক পুকুরঃ** এসব পুকুরে সারা বছর পানি থাকে। এ ধরনের পুকুর অধিক গভীর হয়। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে। যেমন- এঁটেল ও দোঁআশ মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদির মিশ্র চাষ, গলদা চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ করা যায়।

খ) **অস্থায়ী বা মৌসুমি পুকুরঃ** এসব পুকুরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮মাস) পানি থাকে। এগুলো বেশি গভীর হয় না। এদের মাটি বেশি সময় পানি ধরে রাখতে পারে না। যেমন- বেলে মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ যেগুলো এক বছরের কম সময়ে বাজারজাত করার উপযোগী হয় সেসব মাছ চাষ করা যায়। যেমন- সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, শিং, মাগুর ইত্যাদি।

২। চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

মাছের পোনাকে বয়স ও দৈর্ঘ্য অনুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম পোনা, রেণু পোনা, ধানী পোনা ও আঙ্গুলে বা চারা পোনা। ডিম ফোটার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে। এদের পেটের নিচে একটি থলি থাকে। থলি থাকা অবস্থায় (২-৩দিন) এরা বাইরে থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। কুসুম থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেণু পোনা বলে। রেণু পোনা আরও বড় হয়ে ধানের মতো আকার (যেমন- ২ বা ২ সেমি এর উপর) হলে একে ধানী পোনা এবং আঙ্গুলের মতো লম্বা (৭ সেমি এর উপর) হলে একে আঙ্গুলে বা চারা পোনা বলে। বিভিন্ন আকারের পোনার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশের পুকুর প্রয়োজন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক) **আঁতুড় বা নার্সারি পুকুরঃ** যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর বলে। এখানে শতক প্রতি ৫০-১০০ গ্রাম রেণু পোনা ছেড়ে ১৫-৩০ দিন চাষ করা হয়।

খ) **লালন পুকুরঃ** যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা বা আঙ্গুলে পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। লালন পুকুরের আয়তন ২০ থেকে ১০০ শতক ও গভীরতা ১.৫-২ মিটার হতে পারে। এ পুকুরে শতক প্রতি ২৫০০-৪০০০ টি ধানী পোনা ছেড়ে ২-৩ মাস চাষ করা হয়।

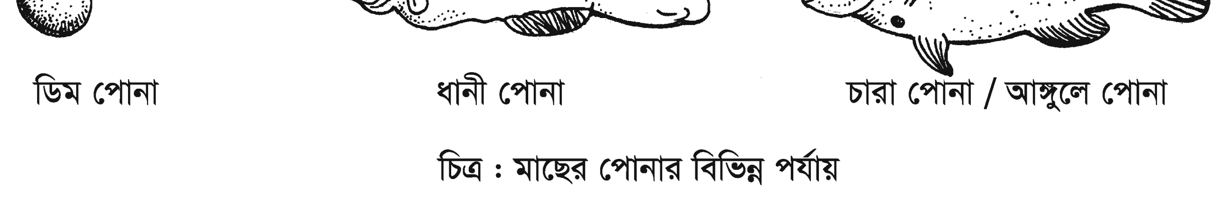

ডিম পোনা ধানী পোনা চারা পোনা / আঙ্গুলে পোনা

চিত্র : মাছের পোনার বিভিন্ন পর্যায়

গ) **মজুদ পুকুরঃ** এটিই মাছ চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে ধানী বা আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এর আয়তন ৩০ শতকের উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। এখানে সাধারণত ১ বছরের উপরে মাছ লালন না করাই ভালো। কারণ খাদ্য দিলেও এ সময়ের পর মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।

এছাড়া আয়তনের উপর ভিত্তি করেও পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর (১-৫ শতক), মাঝারি পুকুর (১০-৩০ শতক) এবং বড় পুকুর (৩০ শতকের উপর)।

পুকুরের বিভিন্ন স্তর

পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে তাপমাত্রা, অক্সিজেন, ও প্লাংকটনের তারতম্য ঘটে। পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন মাছ ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে। এই সব তারতম্য অনুযায়ী পুকুরকে ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- (১) উপরের স্তর (২) মধ্যস্তর এবং (৩) নিচের স্তর

১) **উপরের স্তর বা উপরিভাগঃ** পুকুরের উপরের স্তর যেহেতু বাতাসের সংস্পর্শে থাকে তাই এই স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পুকুরের উপরের স্তরে ফাইটোপ্লাংকটন বেশি থাকে যা মাছের খাদ্য। এই স্তরে সরপুঁটি, কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

২) **মধ্যস্তর বা মধ্যভাগঃ** এই স্তরে পানির তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জু-প্লাংকটন থাকে তবে ফাইটোপ্লাংকটনও থাকতে পারে। রুই মাছ এই স্তরে থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

৩) **নিচের স্তর বা তলদেশঃ** এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। পুকুরের তলদেশে জু-প্লাংকটন, কীটপতঙ্গের লার্ভা, জৈব-আবর্জনা, কেঁচো, শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়। মৃগেল, কালবাউশ, কার্পিও বা কমন কার্প, চিংড়ি, পাঙ্গাশ, শিং, মাগুর এই স্তরে বাস করে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরেই বিচরণ করে যেমন- তেলাপিয়া। অন্যদিকে গ্রাস কার্প পুকুরের উপরে, পাড়ে বা তলদেশে জন্মানো বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

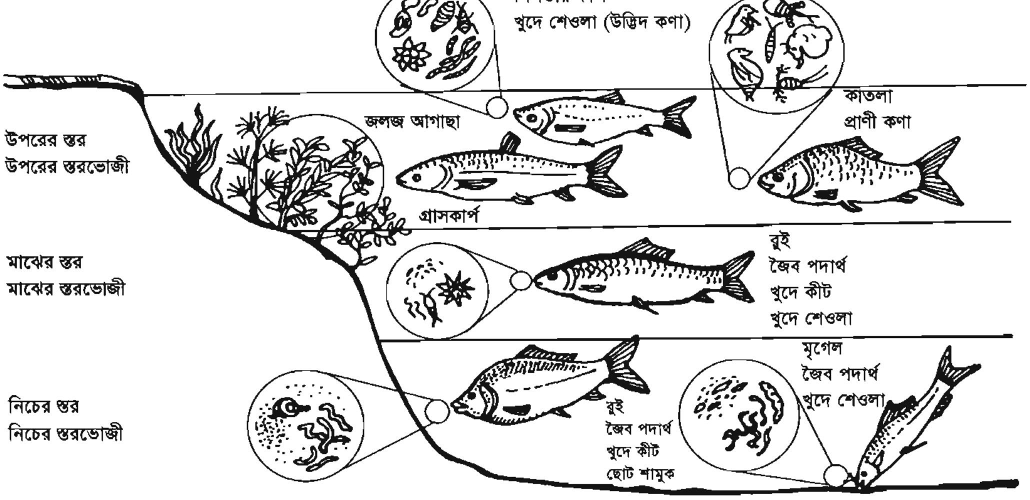
সিলভার কার্প
খুদে শেওলা (উদ্ভিদ কণা)
কাতলা
প্রাণী কণা
জলজ আগাছা
উপরের স্তর
উপরের স্তরভোজী
গ্রাসকার্প
রুই
জৈব পদার্থ
খুদে কীট
খুদে শেওলা
মাঝের স্তর
মাঝের স্তরভোজী
মৃগেল
জৈব পদার্থ
খুদে শেওলা
নিচের স্তর
নিচের স্তরভোজী
রুই
জৈব পদার্থ
খুদে কীট
ছোট শামুক

চিত্রঃ পুকুরের বিভিন্ন স্তর

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুকুরে স্তর ভিত্তিক মাছের অবস্থান ও তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে ।

নতুন শব্দ : নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর, মজুদ পুকুর, বার্ষিক ও মৌসুমি পুকুর ।

পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা জীবকুলকে চার ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

১) **প্লাংকটন:** প্লাংকটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান আণুবীক্ষণিক জীব । এরা দুই প্রকার যথা- ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদকণা ও জু-প্লাংকটন বা প্রাণিকণা । পুকুরের পানির রং সবুজ বা সবুজাভ থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন আছে । ফাইটোপ্লাংকটনকে এককোষী শেওলাও বলে । কয়েকটি ফাইটোপ্লাংকটনের উদাহরণ হচ্ছে- ক্লোরেলা, এনাবেনা, মাইক্রোসিস্টিস ইত্যাদি । আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জু-প্লাংকটন হচ্ছে ড্যাফনিয়া, কপিপোড, রটিফার । পানির রং বাদামি সবুজ, লালচে-সবুজ বা হলদেটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটোপ্লাংকটনের পাশাপাশি পুকুরে জু-প্লাংকটনের উপাদানও ভালো । পুকুরে প্লাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয় । সার হিসাবে জৈব ও অজৈব এ দুধরনের সারই ব্যবহার করা যায় ।

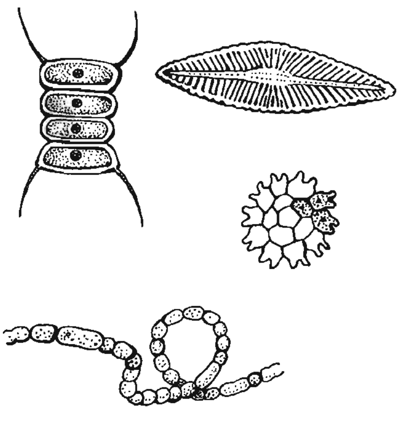

চিত্র: কয়েকটি ফাইটোপ্লাংকটন

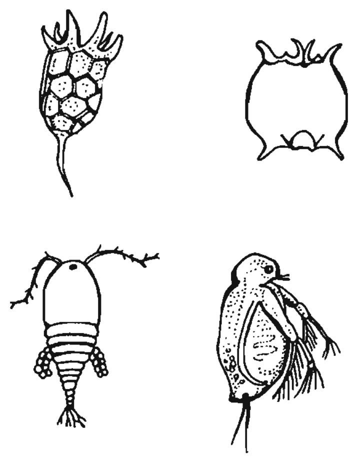

চিত্র: কয়েকটি জু-প্লাংকটন

২) **সাঁতারু বা নেকটন:** এরা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে । এরা সমস্ত পানিতে চরে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে খায় যেমন- মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি । অবশ্য এদের ডিম ও লার্ভার বৈশিষ্ট্য প্লাংকটনের মতো ।

৩) **তলবাসী বা বেনথোস:** পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যে সব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেনথোস বলে । যেমন- পচনকারী ব্যাকটেরিয়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি । তলবাসী প্রাণী পুকুরের তলা থেকে প্লাংকটনের পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে । ফলে পানিতে প্লাংকটনের পুষ্টি উপাদান বাড়ে যা মাছ চাষের জন্য ভালো ।

৪) **জলজ উদ্ভিদঃ** পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন–

ক) **শেওলাঃ** অগভীর পুকুরের তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে। যেমন– স্পাইরোগাইরা।

খ) **ভাসমান উদ্ভিদঃ** এ সকল উদ্ভিদ পানিতে ভেসে থাকে। এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে না। যেমন– কচুরিপানা, টোপাপানা, খুদিপানা ইত্যাদি।

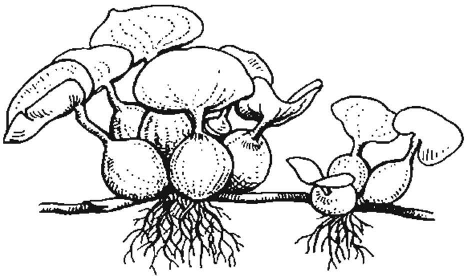
চিত্রঃ কচুরি পানা

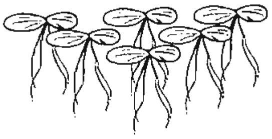
চিত্রঃ খুদি পানা

গ) **নির্গমশীল উদ্ভিদঃ** এ সব উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে। যেমন– শাপলা, পানিফল, শুসনি শাক, আড়াইল।

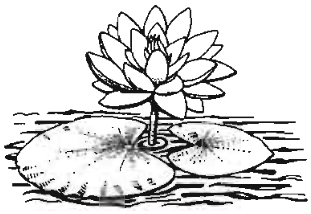
চিত্রঃ শাপলা

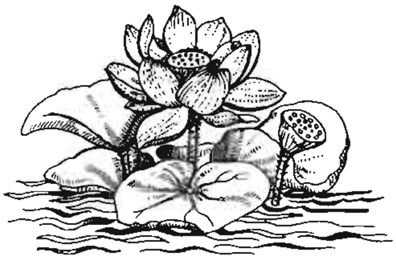
চিত্রঃ পদ্ম

ঘ) **নিমজ্জিত বা ডুবন্ত উদ্ভিদঃ** এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা ও ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন– কাঁটাঝাঁঝি, পাতাঝাঁঝি, কাঁটাশেওলা, নাজাস।

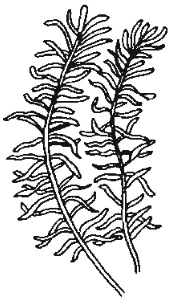
চিত্রঃ পাতাঝাঁঝি

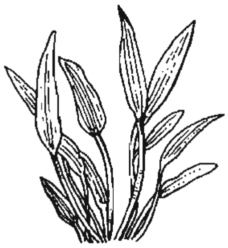
চিত্রঃ নাজাস

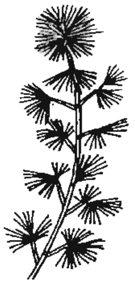
চিত্রঃ কাঁটাঝাঁঝি

ঙ) **লতানো উদ্ভিদঃ** এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এবং কাণ্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন– হেলেঞ্চা, কলমিলতা, মালঞ্চ।

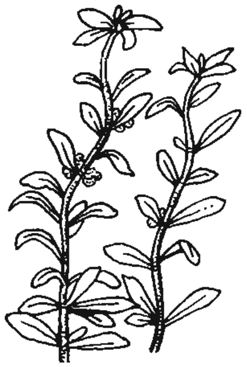
চিত্রঃ মালঞ্চ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ বা উপযোগীকরণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. নতুন পুকুর খনন

কোনো স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২ মিটার পানি থাকে। খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল ন্যূনতম ১.৫ঃ২ রাখা উচিত। তবে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে ১ঃ৩ করা নিরাপদ। অন্যথায় পুকুরের পাড় ভেঙে গিয়ে অল্প দিনে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পুকুর খননের স্থানে যদি উপরের মাটি ভালো ও উর্বর হয় তবে পুকুর খননের সময় আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। পুকুর খনন শেষ হলে পুকুরের তলায় বালু মাটির উপরে তা বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগে ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিতলের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। ঐ জায়গাটুকুকে বকচর বলে। পুকুরের তলা সমান অথচ একদিকে কিছুটা ঢালু করতে হবে। এতে পানি সেচ ও মাছ আহরণে সুবিধা হবে। নতুন পুকুর খননের পর দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে পাড়ের মাটি শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে পাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে ও বর্ষায় পাড়ের মাটি ক্ষয়ে যাবে না।

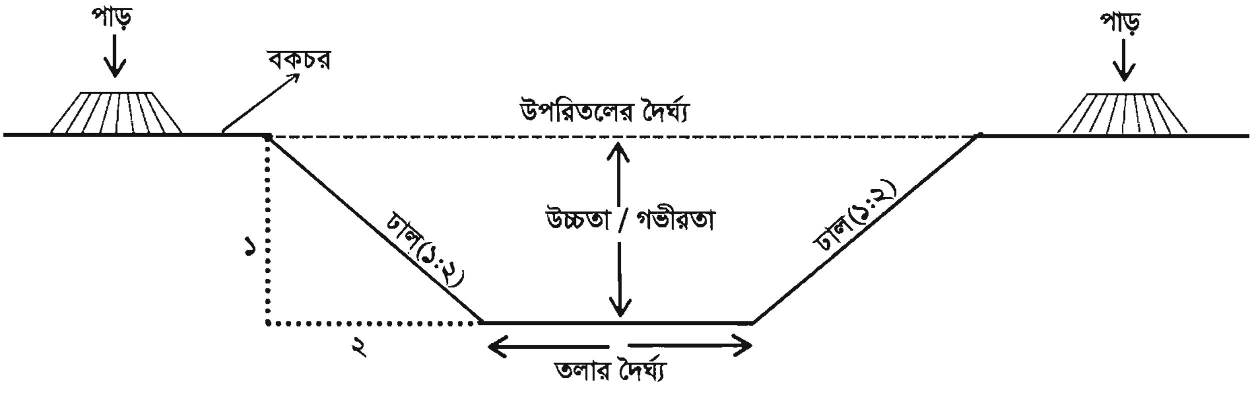

চিত্র: পুকুরের প্রস্থচ্ছেদ

খ. পুকুর প্রস্তুতকরণ বা মাছ চাষের উপযোগীকরণ

পুকুর প্রস্তুতি মাছ চাষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাছ পালনের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিলে মাছ স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে ও রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছ উৎপাদন লাভজনক হয়। পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপ গুলো নিম্নরূপ–

১. পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পাড় ভাঙা থাকলে মেরামত করতে হবে ও পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয় বা থাকলেও তা ছেটে দিতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যের আলো পড়বে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুর পুরানো হলে তলায় অতিরিক্ত কাদা জমা হয়। এ অবস্থায় ২০-২৫ সেমি কাদা রেখে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে সহজেই তা করা যায়। মাছ চাষের পুকুরে ৩-৪ বছর পর পর একবার শুকানো উচিত। পুকুর শুকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুকুরের তলা থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় দূর হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুকুরের তলদেশ সমান করে নিতে হবে। পুকুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে মাছ ধরতে ও জাল টানতে সুবিধা হবে।

২. জলজ আগাছা দমন

পুকুর পাড়ে ও ভিতরে বিভিন্ন আগাছা যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা, হেলেঞ্চা, কলমি লতা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আগাছা পুকুরে দেওয়া সার শোষণ করে নেয়, সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয় এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন-রাক্ষুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ও মাছ ধরে খায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন-কপার সালফেট বা তুঁতে, সিমাজিন ইত্যাদি ব্যবহার করেও জলজ আগাছা দমন করা যায়। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা কাঙ্ক্ষিত নয়। গ্রাসকার্প, সরপুঁটি উদ্ভিদভোজী মাছ। চাষকালীন সময়ে পুকুরে এসব মাছ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ যেমন-শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি সরাসরি চাষের মাছ খেয়ে ফেলে। এছাড়া পুঁটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অচাষযোগ্য মাছ। এরা চাষযোগ্য মাছের জায়গা, খাদ্য, অক্সিজেন সবকিছুতেই ভাগ বসায়। এর ফলে চাষকৃত মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিচের যে কোনো পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও আবাদযোগ্য নয় এমন মাছ দূর করা যায়-

ক) **পুকুর শুকিয়ে:** পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুকুরের তলায় কাদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কড়া রোদে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

খ) **জাল টেনে:** পুকুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।

গ) **মাছ মারার বিষ ব্যবহার করে:** এক্ষেত্রে রোটেনন বা মহুয়ার খৈল ব্যবহার করা যায়। এসব দ্রব্য পুকুরে দিলে মাছের ফুলকার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ফলে মাছ দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সেমি গভীরতায় পানির জন্য শতক প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন অথবা ৩ কেজি মহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মোট পরিমাণকে তিন ভাগ করতে হবে। একভাগ দিয়ে কাই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে দিতে হবে। বাকি ২ ভাগ পানিতে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুকুরের পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে ধরে ফেলতে হবে। বিষ দেওয়ার পর ৭-১০ দিন পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না ও নতুন মাছ ছাড়া যাবে না। রোটেনন ব্যবহারে মৃত মাছ খাওয়া যাবে। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করেও মাছ মারা যায় যেমন- ফসটক্সিন ট্যাবলেট। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা ঠিক নয়।

৪. চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকানোর পরে তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলায় চাষ দেওয়া হলে চাষের দিন চুন দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গুলার পর ঠাণ্ডা হলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতাঃ ১) চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় ২) পানির p^H ঠিক রাখে ৩) পানির ঘোলাত্ব কমায় ও পানি পরিষ্কার রাখে ৪) মাছের রোগবালাই দূর করে এবং ৫) সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুকুরের বয়স ও পানির p^H মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন-এঁটেলমাটি, কাদামাটি ও লাল মাটির পুকুরে চুন একটু বেশি দরকার হয়। নিম্নে p^H মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

পুকুর প্রস্তুতির সময় চুন প্রয়োগের মাত্রা

পানির p^H মান	চুনের (পাথুরে) পরিমাণ (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫. সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে ফাইটোপ্লাংকটন ও জু-প্লাংকটন। সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-ফসফরাস, পটাশিয়াম পানিতে মিশে। এ পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন তৈরি হয়। আর ফাইটোপ্লাংকটনের উপর নির্ভর করে জু-প্লাংকটন তৈরি হয়। সার দুই প্রকার। ক) জৈব সার, যেমন-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, খ) অজৈব সার, যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়। রোদ্রোজ্জ্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

জৈব সার		অজৈব সার	
সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)	সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)
গোবর	৫-৭ কেজি	ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
অথবা		টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি	এমওপি	২০ গ্রাম

৬. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে এটি করা যায়।

ক) **সেক্কিডিস্ক:** ২০ সেমি ব্যাসযুক্ত টিনের একটি সাদা-কালো থালা (একে সেক্কিডিস্ক বলে) সুতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সেমি গভীরতায় থালা দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সেমি এর অধিক গভীরতায় সেক্কিডিস্ক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে খাবার অনেক কম।

খ) **হাত পরীক্ষা:** পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

গ) **গ্লাস পরীক্ষা:** একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস দ্বারা পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সুক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে ।

পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

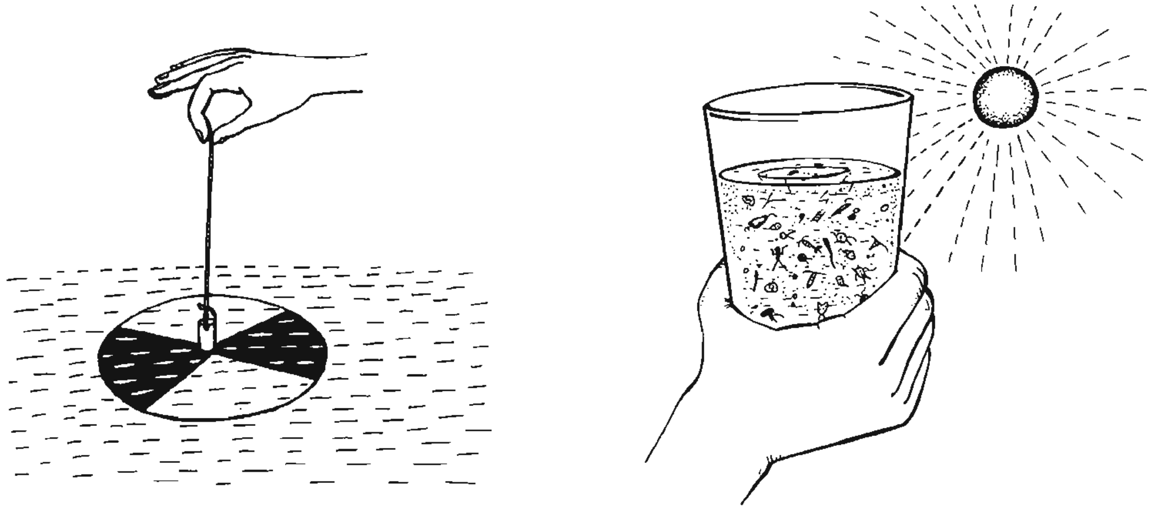

চিত্র: সেক্কিডিস্ক ও গ্লাস পরীক্ষা

৭. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

যে পুকুরে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে মাছ মারা হয়েছে সেখানে পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুকুরে হাপা স্থাপন করে অথবা বালতিতে বা পাতিলে পুকুরের পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এসময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

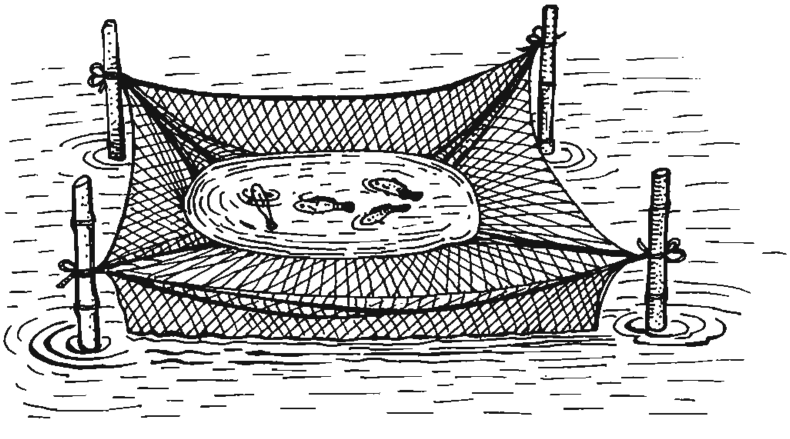

চিত্র : পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষকসহ পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরে গিয়ে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করবে এবং খাতায় লিখে জমা দিবে ।

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নার্সারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে/কাছাকাছি স্থানে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কিন্তু দূরবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে ৩ ভাগের ১ ভাগ পানি ও ২ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ জন্য পোনাভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে আস্তে আস্তে এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার পূর্বে শোধন করে নিলে পোনাগুলো কোনো ক্ষতিকারক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে মুক্ত হবে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে ও মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যাবে। বালতিতে বা পাতিলে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০ টি পোনা আধা মিনিট গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে 8-৫ বার শোধন করা যাবে। তাই পুকুরের জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।

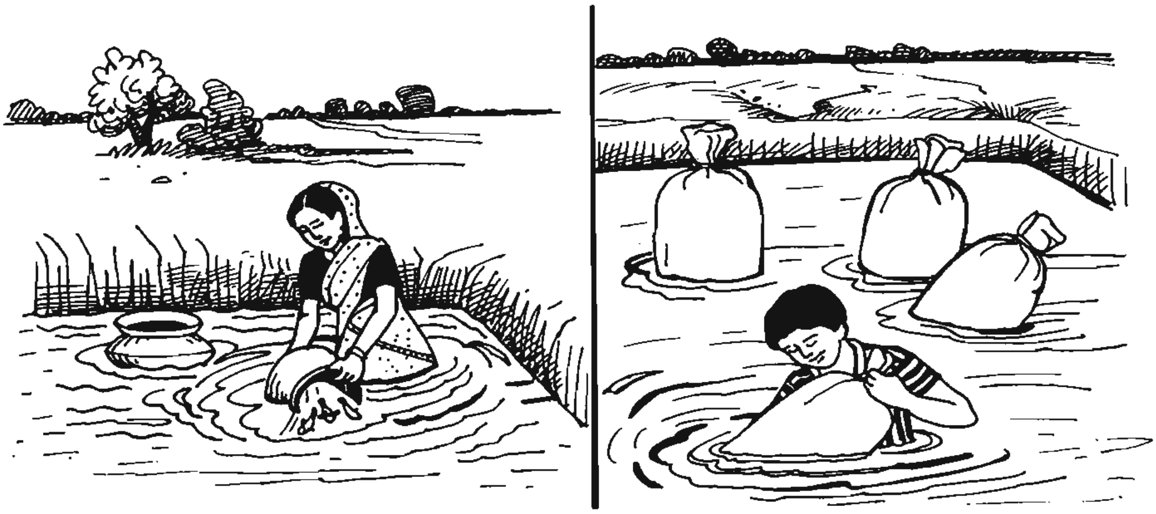

চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

নতুন শব্দ: পিপিএম,রোটেনন, ফসটক্সিন ট্যাবলেট, সেক্কিডিস্ক

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাছের পুকুর/মৎস্য খামার পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয় যার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং আরও রয়েছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিমি এর সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয় যেমন– নদ-নদী, বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, কাপ্তাই লেক, হাওর ও প্লাবনভূমি। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র শতকরা প্রায় ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চিংড়ি খামার। এদের মোট আয়তন হচ্ছে ৬.৭৮ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

সুদূর অতীতে প্রাকৃতিকভাবে এদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ষাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্ন বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। মুক্ত জলাশয়ে শুধু উৎপাদনই নয় সে সাথে মাছের জীববৈচিত্র্যও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপন্ন, ২৮টি বিপন্ন ও ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি (যেমন– সরপুঁটি, মহাশোল, বাঘাআইড়), আর যে প্রজাতি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। অন্যদিকে যে প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির মাছের উদাহরণ হচ্ছে- রানি, পাবদা, টেংরা ইত্যাদি। আর ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হচ্ছে ফলি, গুলশা, কাজলি, মেনি ইত্যাদি। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে কোনো জলাশয় বা এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন– কোনো হাওর, বিল বা নদীর কোনো অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক সময় উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে মাছ আহরণ যেন না করা যায় এজন্য গাছের ডালপালা, বাঁশ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে করে সেখানে মাছ নিরাপদ আশ্রয় পায়, মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে ও অবাধ প্রজনন ঘটাতে পারে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টির মতো অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের বা ঘোষণার মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।

২. মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।

৩. মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৪. মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৫. প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধি করা যায়।
৬. জলজ পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।

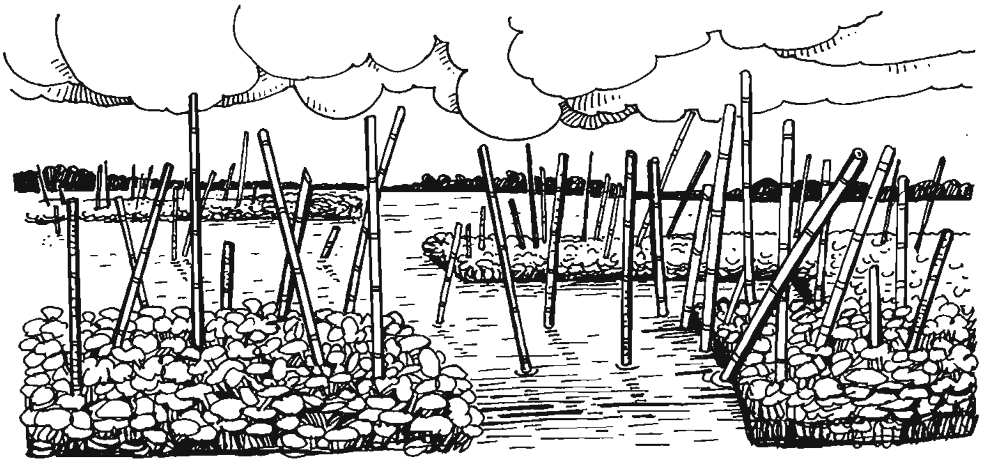

চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে।

নতুন শব্দ : চরম বিপন্ন প্রজাতি, বিপন্ন প্রজাতি, ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

দিনে দিনে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সাথে বাড়ছে মাছের চাহিদাও। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জেলেরা দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে প্রায় ছোট বড় সব মাছই ধরছে। এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছও। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ক্রমান্বয়ে মাছ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এমনকি কিছু প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র্য যেন কমে না যায় বরং বৃদ্ধি পায় বা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে এজন্য সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে "মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন- ১৯৫০" প্রণয়ন করে। এটি সাধারণভাবে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ হলো-

১। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর : ক) জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া; খ) নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি)

মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের ইলিশ (যা "জাটকা" নামে পরিচিত); গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচেরপাঙ্গাশ; ঘ) ফেব্রুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে (১২ ইঞ্চি) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

২। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা মা মাছ ধরা ও ধ্বংস করা যাবে না।

৩। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৪। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৫। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৬। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল (প্রচলিত নাম-কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৭। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ: সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় বছরের নির্ধারিত সময়গুলোতে কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৮। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ: ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতি বছর ১৫-২৪শে অক্টোবর (১-১০ই আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

৯। শাস্তি: (ক) প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা। (খ) পরবর্তীতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

নতুন শব্দ : জাটকা, কারেন্ট জাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির আবাসন

হাঁস-মুরগির আবাসন

পারিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মুরগি পালনের জন্য শুধু রাতে আশ্রয়ের জন্য ছোট খোঁয়াড় বা বাসস্থান তৈরি করা হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে এদের জন্য আবাসন বা বাসস্থান প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে পাখির বাসস্থান করা হয়ে থাকে। যথা-

১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
২। নিবিড়ভাবে যত্ন নেওয়া
৩। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা
৪। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা
৫। সহজে টিকা দেওয়া
৬। বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা
৭। চোরের হাত থেকে রক্ষা
৮। সহজে ডিম সংগ্রহ
৯। সহজে খাদ্য ও পানি সরবরাহ
১০। হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
১১। সহজে লিটার পরিষ্কার
১২। শ্রমিক কম লাগা ইত্যাদি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা, হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির ধাপগুলো লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

হাঁসমুরগির আবাসন তৈরির ধাপসমূহ

১। হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা
২। ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা
৩। হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা
৪। হাঁস-মুরগির ঘর তৈরি করা
৫। হাঁস-মুরগিকে প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া ইত্যাদি।

হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা : নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য হাঁস-মুরগির বাসস্থান বা ঘর তৈরি করতে হবে—

১। উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা
২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে দূরে

৩। ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা
৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা
৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা
৬। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা সম্পন্ন স্থান
৭। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ ইত্যাদি থাকতে হবে।

ঘরের ডিজাইন

হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘর সবচেয়ে ভালো। হাঁসমুরগির সংখ্যার উপর ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটারের মধ্যে হতে হবে। হাঁস-মুরগির ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণমুখী হতে হবে। ছাদের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের মুরগির ঘর বেশি দেখা যায়। যেমন–

১। গ্যাবল টাইপ
২। শেড টাইপ

শেড টাইপ : শেড টাইপ বা একচালা ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। খোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস-মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।

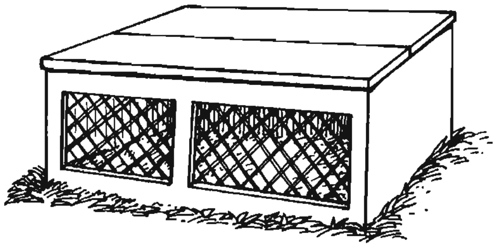

চিত্র : শেড টাইপ ঘর

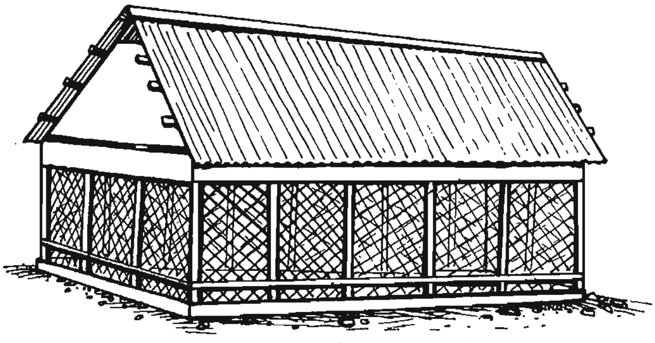

চিত্র : গ্যাবল টাইপ ঘর

গ্যাবল টাইপ : গ্যাবল টাইপ বা দোচালা ঘর তৈরিতে খরচ বেশি হয়। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু থাকে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী।

ঘরের ডিজাইন যে প্রকারের হোক না কেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মুরগির খামারে নিম্নলিখিত ঘরসমূহ থাকবে। যথা-

১। **বাচ্চার ঘর বা ব্রুডার ঘর** -এখানে সদ্য ফোটা বাচ্চাদের জন্ম থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান, টিকা, লিটার, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়।

২। **বাড়ন্ত হাঁস-মুরগির ঘর বা গ্রোয়ার ঘর** -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

৩। **ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির ঘর** -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগি ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

হ্যাচারি ঘর : যে খামারে বীজ ডিম থেকে ইনকিউবেটরের সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো হয়, তাকে হাঁস-মুরগির হ্যাচারি খামার বলে এবং যে ঘরে বাচ্চা ফোটে তাকে হ্যাচারি ঘর বলা হয়।

ব্রয়লার ঘর : যে খামারে মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগি পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার খামার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার ঘর বলা হয়। ব্রয়লার ঘরে মুরগিকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঘর তৈরিকরণ

ছাদ বা চালা : টিন, অ্যাসবেস্টাস এবং করোগেটেড শিট দিয়ে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটের তৈরি ছাদ সবচেয়ে ভালো। গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামারে ছন ও উপযুক্ত গাছের পাতা ব্যবহার করা যাবে।

মেঝে : ঘরের মেঝে শুষ্ক রাখার জন্য হাঁস-মুরগিকে ইটের মেঝে বা মাচার উপর রাখা উত্তম।

দেয়াল : মুরগির ঘরের দেয়াল মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইট, তারের নেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। দেয়ালের উচ্চতা ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ০.৩ মিটার (১ ফুট) ও লেয়ারের ক্ষেত্রে ০.৬ মিটার (২ ফুট) পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। আর দেয়ালের উপরের অংশে তারের নেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে শীতের দিনে উপরের নেটের অংশটুকু চটের বস্তা বা ত্রিপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা : হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের দরজা আকারে বড় হওয়া উচিত।

জানালা : ঘরের লম্বালম্বি পাশে নেট থাকায় জানালা থাকে না। তবে, প্রস্থ পাশ দেয়াল দ্বারা বন্ধ থাকলে জানালা দিতে হবে।

হাঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গা : ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বয়স (মাস)	প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)		
০-১ (১ম দিন থেকে বয়স্ক পাখি)	লিটার পদ্ধতি	খাঁচা পদ্ধতি	মাচা পদ্ধতি
	০.০৫ - ০.২৮	০.০২ - ০.০৭	০.০২ - ০.১৯

নতুন শব্দ : আবাসন, শেড টাইপ ঘর, গ্যাবল টাইপ ও হ্যাচারি ঘর

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির খাদ্য

দেহের বৃদ্ধি, ভরণপোষণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দানা শস্য ও এদের উপজাতসমূহ গৃহপালিত পাখির (হাঁস-মুরগির) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় খাতে। নিম্নে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

১। দানাশস্য ও এদের উপজাতসমূহ তাজা ও মানসম্মত হতে হবে।
২। খাদ্যে পাখির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে।
৩। খাদ্য জীবাণু, ছত্রাক ও পরজীবী মুক্ত হতে হবে।
৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
৫। খাদ্য হজমযোগ্য ও সহজপাচ্য হবে।
৬। খাদ্য খুব সুস্বাদু হতে হবে।
৭। খাদ্যের উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।
৮। খাদ্যকে যে কোনো প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে।
৯। খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।

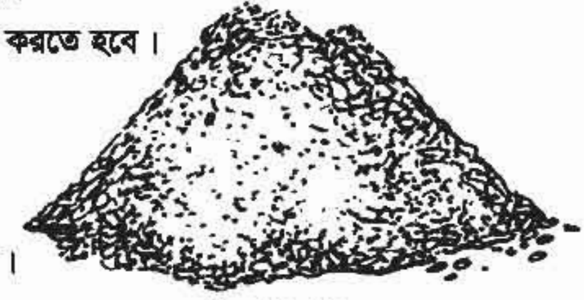

চিত্র : ফিস মিল

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে পাখির রেশন তৈরি করা হয়। রেশন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় কোনো পশু বা পাখি দ্বারা গৃহীত খাদ্য। রেশন অবশ্যই পুষ্টি উপাদানে সুষম হতে হবে। যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন উপস্থিত থাকে তাকে সুষম রেশন বলে। সুষম খাদ্য বা রেশনের কাজ নিম্নে দেওয়া হলো।

১। খাদ্য বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
২। খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়।
৩। খাদ্য দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৪। দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।
৫। দেহ কোষের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।
৬। দেহের পানির সমতা রক্ষা করে।
৭। দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।
৮। দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।
৯। ডিম ও মাংস উৎপাদনে সাহায্য করে।

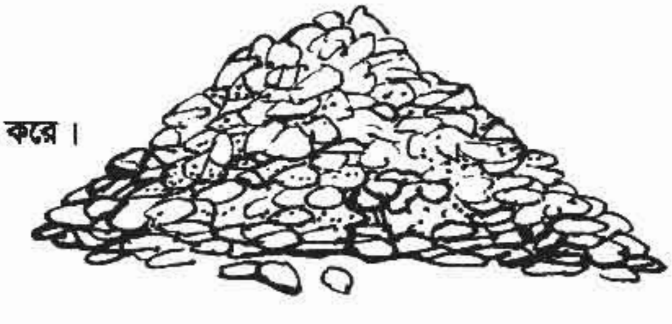

চিত্র : ঝিনুক/ শামুকের গুঁড়া

মুরগির খাদ্য

যেহেতু মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাই ডিমপাড়া মুরগি ও ব্রয়লার মুরগির জন্য পৃথক রেশন তৈরি করা হয়। ডিমপাড়া মুরগি বা লেয়ার মুরগির ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। লেয়ার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত
২। বাড়ন্ত মুরগির রেশন : ৯-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত
৩। ডিমপাড়া বা লেয়ার মুরগির রেশন: ২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত

ব্রয়লার মুরগিকে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়:
১। ব্রয়লার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন: ০-২ সপ্তাহ পর্যন্ত
২। ব্রয়লার গ্রোয়ার বা বাড়ন্ত বাচ্চার রেশন: ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত
৩। ব্রয়লার ফিনিশার রেশন: ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত

খাদ্য উপকরণ: মুরগির খাদ্য তৈরিতে প্রধানত দানাশস্য ও এদের উপজাত ব্যবহার করা হয়। রেশন তৈরির জন্য দানাশস্য হিসাবে প্রধানত গম, ভুট্টা ও ভুসি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বসতবাড়িতে পারিবারিক মুরগি পালনে যে কোনো শস্যদানা যেমন, ধান, চাল, খুদ, ডাল, সরিষা ইত্যাদি মুরগিকে খেতে দেওয়া হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও বাজারদর বিবেচনা করে রেশন তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে পুষ্টি উপাদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	**খাদ্য উপকরণ**
শর্করা	গম, ভুট্টা, ধান, চাল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি।
আমিষ	শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল, রক্তের গুঁড়া ইত্যাদি।
স্নেহ	বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল যেমনঃ পাম তৈল, তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, ঝিনুক খোসা চূর্ণ, হাড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুদ্ধ জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

মুরগির খাদ্য গ্রহণ: লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মুরগির জাত, বয়স, তাপমাত্রা, খাদ্যের মান, বাসস্থান, খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	**মুরগি (গ্রাম/দিন)**	**ব্রয়লার (গ্রাম/দিন)**
প্রথম সপ্তাহ	১০	২৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২০	৬৫
তৃতীয় সপ্তাহ	২৫	১০০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩০	১৩০
পঞ্চম সপ্তাহ	৩৫	১৬০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৩৭	১৬৫
সপ্তম সপ্তাহ	৪০	----
অষ্টম সপ্তাহ	৪৫	----
বাড়ন্ত	৭০	----
বয়স্ক	১১৫	----

কাজ : ১০০টি বাড়ন্ত লেয়ার মুরগি ৭ দিনে কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

গম বা ভুট্টাকে প্রথমে মেশিনে ভেঙে নিতে হবে। খৈলকেও ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। খাদ্য উপকরণ মাপার পাল্লা ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য তৈরির জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। প্রথমে গম বা ভুট্টা মেপে মেঝেতে ঢালতে হবে। তারপর চালের মিহিকুঁড়া ও গমের ভুসি, ভুসির উপর শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তার উপর খৈল ও সয়াবিন মিল ঢালতে হবে। এভাবে সবগুলো উপকরণ ঢালার পর খাদ্যের স্তূপটিকে একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার ঝিনুকের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া ও লবণ ঐ পিরামিডের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এবার আধা কেজি খাদ্য আলাদা করে নিয়ে তার মধ্যে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। এরপর মিশ্রিত ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পিরামিডের উপর সমস্ত খাদ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। সয়াবিন তৈল দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার খাদ্যের স্তূপটির ভিতরে বার বার হাত ঢুকিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালো ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রিত এ খাদ্য বাদামি রঙের দেখাবে।

মুরগির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাধুনিক ফিড মিলে তৈরি করা হয়। মুরগির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে বাজারে ম্যাশ (পাউডার), ক্র্যাম্বল (দানা) ও পিলেট (বড়ি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকার বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রণ-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
গম/ভুট্টা ভাঙা	৪৫-৫৫
গমের ভুসি	৮-১২
চালের মিহিকুঁড়া	১০-১৫
তিলের খৈল	১০-১৫
শুটকি মাছের গুঁড়া	১০-১২
ঝিনুক চূর্ণ ও হাড়ের গুঁড়া	১.৫-৭
লবণ	০.৫

বিশেষ দ্রষ্টাব্য

১। ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার মুরগির খাদ্য তালিকা

উপাদান	**প্রারম্ভিক রেশন (%)**	**বৃদ্ধি রেশন (%)**
গম/ভুট্টা ভাঙা	৫০	৫২
চালের মিহি কুঁড়া	১৪	১২
তিলের খৈল	১২	১০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৪	১২
সয়াবিন মিল	৮	৯
সয়াবিন তৈল	-	২
হাড়ের গুঁড়া	১.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০

কাজ :

শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০০টি ব্রয়লার মুরগির ১৪ দিনের প্রারম্ভিক রেশন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। **ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ :** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রা খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। **জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি :** পর্যাপ্ত পরিমাণ

নতুন শব্দ : ভরণপোষণ, স্টার্টার রেশন, গ্রোয়ার রেশন, ফিনিশার রেশন, লেয়ার রেশন, ম্যাশ, ক্র্যাম্বলও পিলেট খাদ্য

হাঁসের খাদ্য

হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। এরা খাল, বিল, পুকুর, হাওর ও নদীর ছোট জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। হাঁস তৃণলতা এবং খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ খেয়েও ভালো উৎপাদন দিতে পারে। হাঁসের খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। হাঁস শুষ্ক খাদ্যের চেয়ে ভেজা খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। তাই এদেরকে সবসময় গুঁড়া ও ভেজা খাদ্য দেওয়া উচিত। প্রথম ৮ সপ্তাহ হাঁসকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। হাঁসের বাচ্চাকে জন্মানোর পর প্রথম কয়েক দিন হাতে তুলে খাওয়াতে হয় যাতে করে বাচ্চারা খাবার খাওয়া শিখতে পারে।

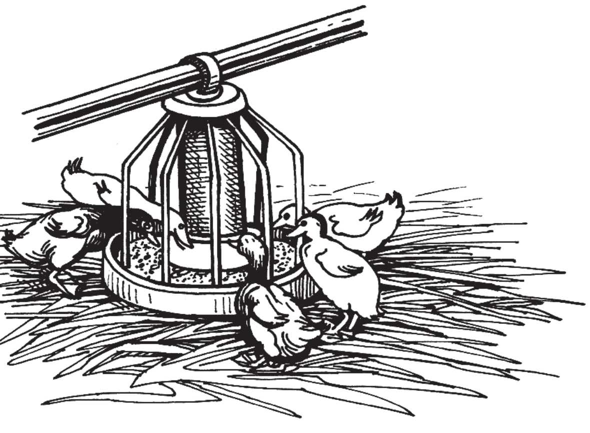

চিত্র : হাঁসের বাচ্চা খাদ্য খাচ্ছে

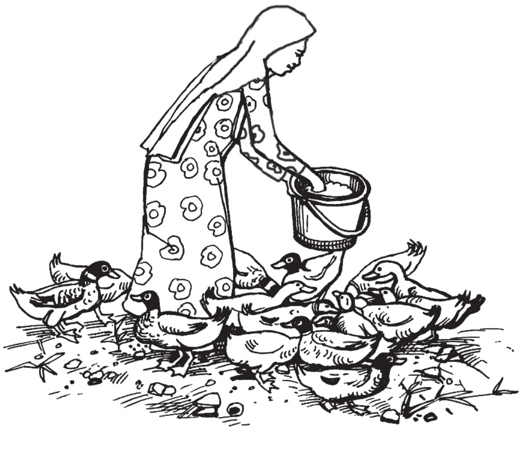

চিত্র : হাঁসকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসের রেশন তৈরি করা হয়। হাঁসের ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। হাঁসের বাচ্চার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত
২। বাড়ন্ত হাঁসের রেশন : ৫-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত
৩। ডিমপাড়া হাঁসের রেশন : ২০ সপ্তাহ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত

হাঁসের খাদ্য গ্রহণ : হাঁসকে বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান ও খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	হাঁস (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৫
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩৫
পঞ্চম সপ্তাহ	৪০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৪৫
সপ্তম সপ্তাহ	৫০
অষ্টম সপ্তাহ	৫৫
বাড়ন্ত	৮৫
বয়স্ক	১২৫

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রেশন

উপকরণের নাম	উপকরণের শতকরা হার (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪৫-৫০
ধানের কুঁড়া	১০-১৫
খৈল	১০-১৫
সয়াবিন মিল	৮-১০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮-১০
শামুকের খোসা চূর্ণ	১.৫-৬.৫
খাদ্য লবণ	০.৫

কাজ : একটি বয়স্ক হাঁস ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত মোট কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গবাদিপশুর খাদ্য

প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আবশ্যক। যা কিছু দেহে আহার্যরূপে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন- গম, ভুট্টা, ঘাস, খৈল, ভুসি ইত্যাদি।

প্রচলিতভাবে গবাদি পশুর খাদ্যকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আঁশ জাতীয় খাদ্য (Roughage feed)
২। দানাদার খাদ্য (Concentrate feed)

আঁশ জাতীয় খাদ্য

রাফেজ জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আঁশ (Fiber) এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। যেমন- যে কোনো খড়, প্রাকৃতিক বা চাষ করা সবুজ ঘাস, হে, সাইলেজ প্রভৃতি। রাফেজ জাতীয় ঘাস গবাদিপশু চারণভূমি থেকে পেয়ে থাকে বা ঘাস কেটে পশুকে সরবরাহ করা হয়। তুলনামূলক বিচারে লিগিউম জাতীয় ঘাস যেমন- আলফা-আলফা, কাউপি, খেসারি, মাসকলাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সাধারণ ঘাসের চেয়ে বেশি থাকে। সাধারণ ঘাসের মধ্যে ভুট্টা, নেপিয়ার, প্যারা, জার্মান প্রভৃতি প্রধান। এ জাতীয় ঘাসের সুবিধা হলো হেক্টর প্রতি এর ফলন অন্যান্য ঘাসের চেয়ে বেশি হয়।

দানাজাতীয় খাদ্য

যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাকে দানাদার খাদ্য বলা হয়। দুধাল বা মাংস উৎপাদনকারী গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শুধু আঁশজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

দানাজাতীয় খাদ্যকে নিম্নোক্ত উপায়ে ভাগ করা যায়-

ক) প্রাণিজ উৎস-ফিসমিল, ব্লাডমিল, ফেদার মিল প্রভৃতি।
খ) উদ্ভিজ্জ উৎস-গম, ভুট্টা, বার্লি, সরগাম, খুদ, খৈল, কুঁড়া, ভুসি প্রভৃতি।

এ ছাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যে খনিজ উপাদান হিসাবে কিছু ঝিনুকের গুঁড়া, ডিমের খোসার গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি, ভিটামিন হিসাবে পাতাজাতীয় সবজি, ভিটামিন- মিনারেল প্রিমিক্স এবং খাদ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু এন্টিবায়োটিক, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রাপ্যতা ঋতু ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সবুজ ঘাস বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় এবং এগুলো যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে সারা বছর সবুজ ঘাসের অপর্যাপ্ততা থাকবে না।

দুই পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ক। সাইলেজ

খ। হে

সাইলেজ

রসাল অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে। বাণিজ্যিকভাবে সাইলোপিটে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয়। ভুট্টা, সরগাম, আলফা আলফা থেকে প্রস্তুতকৃত সাইলেজে বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়।

সাইলেজ ব্যবহারের সুবিধা

১। দীর্ঘ দিন পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন থাকে।

২। সঠিক সময়ে ঘাস কেটে সেগুলো কার্যকরী খাবার হিসাবে গবাদিপশুকে সরবরাহ করা যায়।

৩। এতে হে-এর তুলনায় কম পুষ্টিমান অপচয় হয়।

৪। সাইলেজ তৈরির ফলে ঘাসের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।

৫। সাইলেজ ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়াতেও তৈরি করা যায়।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরি করা গেলেও ভুট্টা ও আলফা-আলফা দিয়ে তৈরি সাইলেজ অত্যন্ত উন্নত মানের হয়। ভুট্টার সাইলেজ গবাদি পশু বিশেষ করে দুধাল গাভীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভুট্টার সাইলেজে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকে।

ভুট্টার গাছের গোড়ায় কালো দাগ আসার সাথে সাথে সাইলেজ প্রস্তুতের জন্য ভুট্টা কাটার উপযোগী হয়। এ সময়ে ভুট্টা গাছের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৩০-৩৫% হয়। ভুট্টা গাছগুলোকে ভূমি থেকে ১০-১২ সেমি উঁচুতে কাটা হয়। এরপর এগুলোকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। টুকরা করা ঘাস গর্তে বায়ুরোধী অবস্থায় রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে গর্তের পরিবর্তে পলিথিন দিয়ে তৈরি বড় আকারের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। টুকরা করা গাছগুলো ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে বাতাস চলাচল করতে না পারে। এভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো পুষ্টি উপাদান না হারিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময়ে পশুকে সরবরাহ করা যায়।

সাইলেজ তৈরির সময় গাছ টুকরা করা ও বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্য—

১। গাঁজনের জন্য বেশি পরিমাণে গাছের সুগার অবমুক্ত হতে পারে।

২। বায়ুরোধী হলে সুষ্ঠুভাবে গাঁজন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়।

কোনো খাদ্য উপাদানের অপচয় ব্যতিরেকে ঘাস সংরক্ষণের জন্য এটা একটা কার্যকর ব্যবস্থা। সাইলেজ বায়ুরোধী পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অক্ষুণ্ন রেখে ক্ষতিকর ইস্ট, মোল্ড, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

হে

হে অতি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত খাদ্য যা সারা বছর গবাদিপশুকে সরবরাহ করা যায়। সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে এর আর্দ্রতা ২০% বা তার নিচে নামিয়ে এনে হে প্রস্তুত করা হয়। হে তৈরির জন্য এক বা একাধিক লিগিউম জাতীয় ঘাস চাষ করা যায়। লিগিউম ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে। লিগিউম গাছের মূলে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ধরে রাখে যা প্রোটিন গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে লিগিউম ছাড়াও সাধারণ ঘাস দিয়ে হে তৈরি করা যেতে পারে।

গুণগত মানের হে-এর বৈশিষ্ট্য

হে এর খাদ্যমান ঘাসের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। হে-এর গুণগতমান ঘাসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পাতার পরিমাণ, ঘাসের রং প্রভৃতি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

১। হে এর জন্য ব্যবহৃত ঘাস পাতা সমৃদ্ধ হতে হবে। হে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুষ্ক হতে হবে। পাতার পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে থাকে।

২। হে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ বিদ্যমান থাকে। বেশি আর্দ্রতা থাকার কারণে বা অত্যধিক তাপের কারণে হে বাদামি বর্ণের হতে পারে যেটা পুষ্টি উপাদান কমে যাওয়ার নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩। হে আগাছামুক্ত হতে হবে।

৪। হে মোল্ড ও ধুলা বালিমুক্ত হতে হবে।

৫। হে তে খাওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ থাকতে হবে।

হে তৈরির পদ্ধতি

গাছ কাটার সময় : হে তৈরির জন্য সঠিক পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়ে গাছ কাটতে হবে। যত কম বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত বেশি হবে। যত বেশি বয়সে গাছ কাটা হবে, হে এর গুণগতমান তত কমে যাবে। তবে ফুল আসার সময় কাটাই উত্তম।

সঠিকভাবে শুকানো : হে তৈরির সময় গাছকে সঠিকভাবে শুকাতে হবে যাতে করে মোল্ড মুক্ত ও অতিরিক্ত তাপমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। গাছগুলোকে দ্রুত শুকাতে হবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো পরিহার করতে হবে যাতে করে ভালো মানের হে এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা যায়। গাছ কেটে রোদে উলটপালট করে এমনভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে অতিমাত্রায় পাতা ঝরে না যায়। সবুজ ঘাসে সাধারণত

৭৫-৮০ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। যেখানে ভালো মানের হে তে সর্বোচ্চ ২০-২৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। রোদে শুকানোর সময় বৃষ্টির পানিতে ভেজানো যাবে না।

হে সংরক্ষণ : হে অবশ্যই শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজ : ১। শিক্ষার্থীরা আঁশজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে শুধু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে গবাদি পশু পালন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

২। শিক্ষার্থীরা সাইলেজ তৈরি করবে এবং এর ধাপগুলো লিখে জমা দিবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আলুর কোন রোগ ব্যাপক ক্ষতি করে ?

ক. আলুর মড়ক রোগ
খ. ঢলে পড়া রোগ
গ. কাণ্ডপচা রোগ
ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ

২. পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমপক্ষে কত ভাগ হওয়া প্রয়োজন ?

ক. ২ মি গ্রাম/লিটার
খ. ৩ মি গ্রাম/লিটার
গ. ৫ মি গ্রাম/লিটার
ঘ. ৭ মি গ্রাম/লিটার

৩. গোল আলুর মড়ক রোগ দেখা দেয় –

i. নিম্ন তাপমাত্রায়

ii. ঘন কুয়াশায়

iii. অতিরিক্ত বৃষ্টির সময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফরিদা বেগম তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের ১৫ শতকের একটি পুকুর মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তার পুকুরে উপযুক্ত মাত্রায় সার ও চুন প্রয়োগ করেন। পোনা ছাড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ পোনাই মারা গিয়েছে।

৪. ফরিদা বেগমের পুকুরে কত কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে?

ক. ২০ কেজি খ. ২৫ কেজি

গ. ৩০ কেজি ঘ. ৩৫ কেজি

৫. পুকুরের পোনা মারা যাওয়ার কারণ–

i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য

ii. ক্ষতিকারক পরজীবীর আক্রমণ

iii. অক্সিজেনের ভিন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কনক বড়ুয়া পশু পালনের জন্য চারণ ভূমি তৈরি করেছেন। বর্ষা মৌসুমে তার চারণ ভূমিতে ব্যাপক হারে ঘাস উৎপাদন হলেও শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের চাহিদা মেটাতে পারেন না। এজন্য তার পশুগুলোর সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য কাঁচা ঘাসের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। এরপর কনক বড়ুয়া তার প্রতিবেশী অনেককেই উক্ত পদ্ধতিতে গো-খাদ্য সংরক্ষণের উদ্বুদ্ধ করলেন।

ক. গো- খাদ্য কাকে বলে?

খ. দানাজাতীয় খাদ্য কীভাবে পশুর উৎপাদন বাড়ায় ব্যাখ্যা কর।

গ. কনক বড়ুয়ার গৃহীত পদ্ধতিটির তৈরি কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কনক বড়ুয়ার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর।

২. বেকার যুবক মহিবুল্লাহ বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৫০ শতাংশের পুকুর সংস্কার করে কার্প জাতীয় মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পর মাছের পোনা মজুদ করেন। মজুদ পরবর্তী সময়ে সেক্কিডিস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করেন। বর্তমানে সফল মৎস্য চাষি হিসাবে তিনি এলাকায় পরিচিত।

ক. মাছের চাষের জন্য পুকুরের পানিতে প্রতি লিটারে কী পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন?

খ. চুন পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করে ব্যাখ্যা কর।

গ. মহিবুল্লাহ তার পুকুর প্রস্তুতির সময় কতটুকু গোবর প্রয়োগ করেছিল হিসাব করে দেখাও।

ঘ. মহিবুল্লাহর পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি অর্থের অপচয় রোধ করে বেশি উৎপাদনে সহায়ক বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

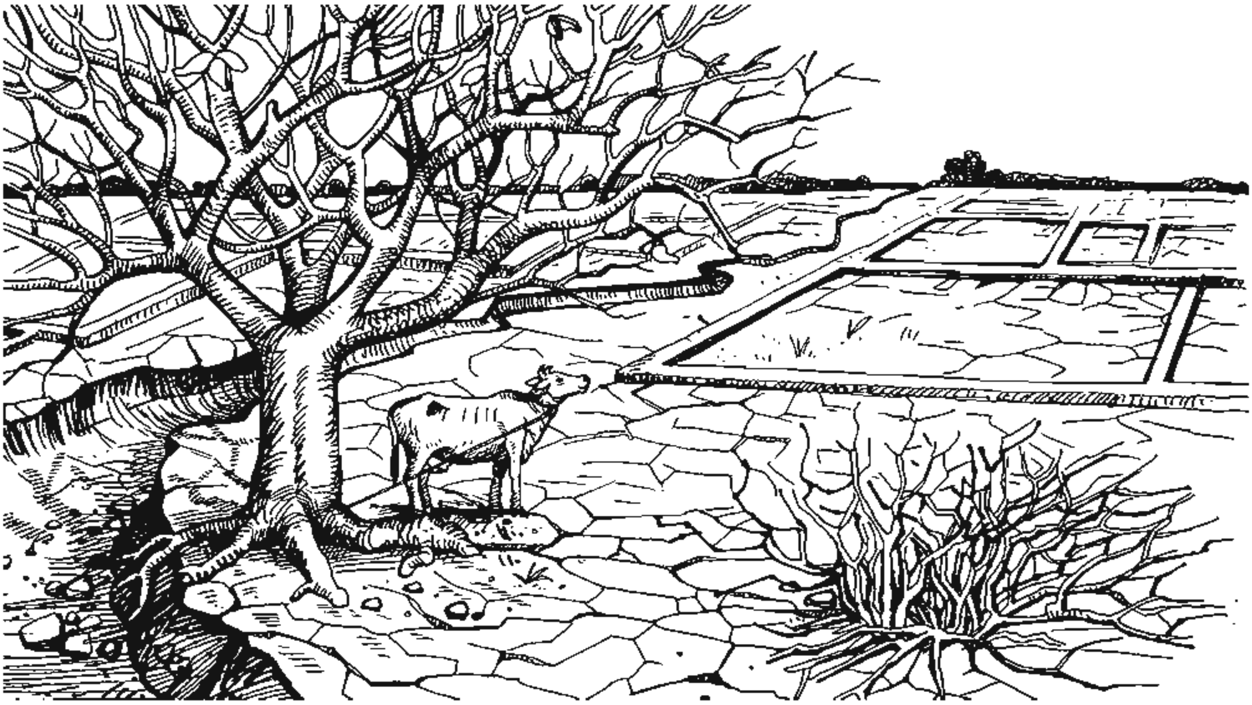

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রের (ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজনের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কে জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়া, গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলো বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া। পূর্বপ্রস্তুতি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হলো উপযোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন। বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত বের করেছেন এবং আরও জাত বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শৈত্য সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়লে এবং শৈত্যতা দীর্ঘস্থায়ী হলে শীতকালীন ফসল, যেমন–গোলআলু ও গমের ফলন ভালো হয়। তবে রোপা আমন ও বোরো ধানের পরাগায়ণ ও দানা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়লে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে চিটা হয়ে ফলন কমে যায়। এ সময় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে এবং কয়েকদিন এ অবস্থা স্থায়ী হলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ করতে হবে। ব্রি ধান ৩৬ ও ব্রি ধান ৫৫ এ দু'টি শৈত্য সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ১টি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ব্রি ধান ৫৫ : এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগাম ও উচ্চফলনশীল এ জাতের গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি। বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭ টন এবং আউশ মৌসুমে ৪.৫ টন। বোরো মৌসুমে জাতটি মাঝারি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। তাছাড়া জাতটি মাঝারি লবণাক্ততা এবং খরাও সহ্য করতে পারে। জাতটির জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১০০ দিন।

খরা সহিষ্ণু ফসল

আমরা জানি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে জমিতে পানির ঘাটতি দেখা যায়। ফলে উদ্ভিদ দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। প্রতিবছর দেশে রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় খরার সম্মুখীন হয়। এতে করে খরার তীব্রতা অনুযায়ী ১৫-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। খরা প্রবণ এলাকায় ফসল চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে আমরা অষ্টম

শ্রেণিতে বিস্তারিত জেনেছি। সেসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো খরা প্রবণ এলাকায় খরা সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত চাষ করা। সাধারণত খরা সহিষ্ণু ফসলের মূল খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং গভীরমূলী হয়। এ সব ফসলের পাতা ছোট, সরু, পুরু বা পেঁচানো হয়ে থাকে। খেজুর, কুল, অড়হর, তরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরা সহিষ্ণু ফসল। এখন আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি খরা সহিষ্ণু ফসলের জাত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খরা ও শৈত্য-সহিষ্ণু ফসলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে এবং খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খরা সহিষ্ণু ধানের জাত

ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রিধান ৫৭ দুইটি খরা সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ব্রি ধান ৫৭ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ব্রি ধান ৫৭ : এ জাতটিও রোপা আমন। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেক্টরপ্রতি ৩.০-৩.৫ টন এবং খরা না হলে ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম বলে এরা খরা সহ্যের পাশাপাশি খরা এড়াতেও পারে।

খরা সহিষ্ণু গমের জাত

বারি গম ২০ (গৌরব) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) দুইটি খরা সহিষ্ণু গমের জাত। এর মধ্যে বারি গম ২৪ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

বারি গম ২৪ (প্রদীপ) : এ জাতটি মধ্যম খাটো, উচ্চ ফলনশীল এবং খরা সহিষ্ণু। এ জাতের পাতা চওড়া, বাঁকানো ও হালকা সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১১০ দিন এবং ফলন ৪.৩-৫.১ টন/হেক্টর।

ঈশ্বরদী ৩৫ : এ জাতটির ফলন ৯৪ টন/হেক্টর। আখের অন্যান্য খরা সহিষ্ণু জাতের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ ইত্যাদি।

খরা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) : হালকা সবুজ রঙের এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০ সেমি বীজ ছোট, মসৃণ ও ধূসর বাদামি রঙের, জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিনের এবং ফলন ২.৪ টন/হেক্টর হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ জাতের ছোলা বপন করতে হয়। খরা সহিষ্ণু অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে বারি বার্লি-৬, বারি বেগুন-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, সবজি, মেস্তা ইত্যাদি।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল

লবণাক্ত মাটি থেকে ফসলের পানি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে ফসল জন্মাতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে।

নিচের ছকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও লবণাক্ততায় সংবেদনশীল কিছু ফসলের তালিকা দেওয়া হলো :

উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	মধ্যম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	লবণাক্ততা সংবেদনশীল
নারিকেল	মিষ্টি আলু	শিম
সুপারি	গোল আলু	লেবু
তাল	মরিচ	কমলা
বার্লি	বরবটি	গাজর
খেজুর	মুগ	পিঁয়াজ
সুগারবিট	খেসারি	স্ট্রবেরি
শালগম	মটর	মসুর
তুলা	যব	আম
ধৈঞ্চা	ভুট্টা	ডালিম
পালংশাক	টমেটো	
	আমড়া	
	পেয়ারা	

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ধান প্রধান ফসল। ধানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে- রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গরচা, গাবুরা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ধান বের করেছে। যেমন- ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান ৫৪ ও বিনা ধান ৮। এইসব জাতের মধ্যে ২টি প্রধান জাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

ব্রি ধান ৪৭ : ২০০৬ সালে এ জাতটি লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এ জাত চারা অবস্থায় বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটির গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি জীবনকাল ১৫২ দিন এবং লবণাক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৬ টন ফলন দিতে সক্ষম।

বিনা ধান ৮ : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ২০১০ সালে লবণাক্ততা সহনশীল এ জাতটি বের হয়। বোরো মৌসুমের এ জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। লবণাক্ত এলাকায় হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.৫ টন। জাতটির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চাষ উপযোগী লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

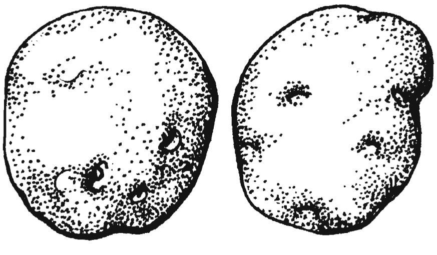

চিত্র : বারি আলু ২২

বারি আলু ২২ (সৈকত) : এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোল এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

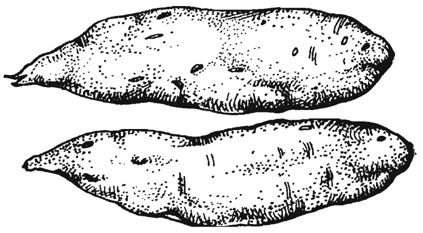

চিত্র : বারি মিষ্টি আলু ৬

বারি মিষ্টি আলু-৬ ও ৭ : এ জাত দুটোর আলুর খোসার রং গাঢ় কমলা রঙের, ভিতরটা হালকা কমলা রঙের। আলুতে মধ্যম মাত্রায় ক্যারোটিন এবং শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসল সংগ্রহ করতে ১২০-১৩৫ দিন সময় লাগে। জাত দুটি সাধারণ পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন এবং লবণাক্ত পরিবেশে ১৮-২০ টন ফলন দিতে পারে।

বারি সরিষা-১০ : এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এর মধ্যে ঈশ্বরদী ৪০ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ঈশ্বরদী ৪০ : ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের মতো এ জাতটিতেও উচ্চমাত্রায় চিনি পাওয়া যায়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণসম্পন্ন এবং অঞ্চল ভেদে ফলন ৮৫-৯৫ টন/হেক্টর। এ জাতটিও লবণাক্ততার পাশাপাশি বন্যা ও খরা সহ্য করতে পারে।

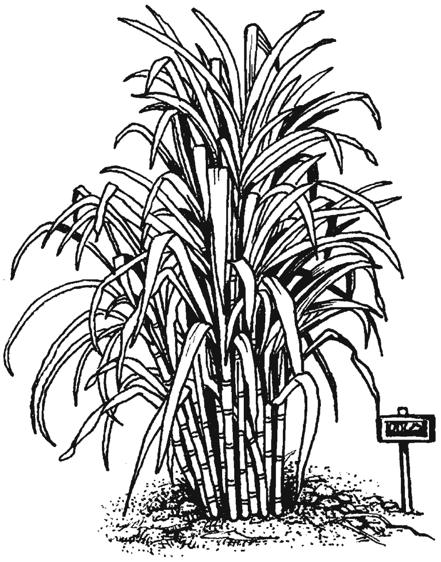

চিত্র : ঈশ্বরদী ৪০

বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কম-বেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন–খুলনা ও যশোর জেলার ভবদহ এলাকা। বন্যার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, জলজ উদ্ভিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে না।

দেশের বিস্তৃত বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানের মধ্যে রয়েছে– বাজাইল ও ফুলকুড়ি। বন্যার পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান গাছের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে। উঁচু জাতের আমন ধানের মধ্যে আছে ব্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৫০ সেমি উচ্চতার প্লাবন সহ্য করতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নাবী জাতের আমন ধান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। নাবী জাতের মধ্যে রয়েছে–বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারী)। কিরণ ও দিশারী জাত দুইটি দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ই আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। ফলে উঁচু জোয়ার থেকে ফসল বাঁচে। আমন মৌসুমে এ এলাকায় চাষাবাদের জন্য সম্প্রতি বের হওয়া জাত দুটি হলো– ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২।

ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ : ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১০ সালে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। এ জাত দুটির চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১০-১৪ দিন পানির নিচে ডুবে থাকলেও চারা মরে না বিধায় ফলন কমে না। বন্যামুক্ত পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যাকবলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফলন ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

জলাবদ্ধতা বা বন্যা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩২ : বন্যা বা জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এ জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ১০৪ টন।

ঈশ্বরদী ৩৮ : এ জাতের আখে উচ্চমাত্রায় চিনি থাকে। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণ সম্পন্ন। জাতটির ফলন ১১৩ টন/হেক্টর এবং উচ্চমাত্রায় বন্যা সহিষ্ণু। এ জাতগুলো ছাড়াও ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০ জাত উঁচু মাত্রায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

কেনাফের জাত

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কেনাফ পাটের মতো একধরনের আঁশ ফসল। এ জাতের কেনাফের পাতা অখণ্ড ও বট পাতার ন্যায় এবং ফলন ৩.৫ টন/হেক্টর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : শৈত্য সহিষ্ণু ফসল, বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস উপযোগী হয়ে উঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অত্যন্ত ধীর গতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিগত এক শতকে পৃথিবীর অনেক দেশে জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। নগরায়ন, যান্ত্রিক সভ্যতা, কলকারখানার প্রসার, জ্বালানি তেল ও কয়লার যথেচ্ছ ব্যবহার, বৃক্ষনিধন ইত্যাদির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (২০০৭-০৮) বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভৌগলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। IPCC (Inter Governmental Pannel on Climate Change) সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে–

১। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৯৮৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে মে মাসে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বাংলাদেশের ৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে।

৩। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে অর্থাৎ ভয়াবহ বন্যার সংখ্যা বেড়েছে।

৪। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে।

৫। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

দেশের পরিবেশ ও উৎপাদন প্রেক্ষাপটসমূহ বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন–

১। গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা
২। অনিয়মিত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত
৩। অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি এবং তার ফলে জলাবদ্ধতা ও ভূমিধস
৪। শুষ্ক মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত
৫। বন্যার ভয়াবহতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি
৬। আকস্মিক বন্যা ও খরার ফলে ফসলহানি
৭। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও গরম
৮। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয়
৯। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি
১০। কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে।

ফসল উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতকালে অত্যাধিক শীত পড়তে দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমে রোগের আক্রমণ বেড়ে যাবে। এখনকার চেয়ে দেশের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসল উৎপাদনে ধস নামবে। ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ধানগাছ সবচেয়ে বেশি কাতর। এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রার কারণে ধানগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধানগাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়।

ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে খরা অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ে গড় বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক হারে মাটি থেকে পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খরার প্রভাব দেখা দেয়। দেশে প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় কবলিত হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসলের ফলন নির্ভর করে খরার তীব্রতা, খরার স্থিতিকাল এবং ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের উপর। ফসলে ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন–

১। তীব্র খরা (৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
২। মাঝারি খরা (৪০-৭০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
৩। সাধারণ খরা (১৫-৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে খরাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– রবি খরা, খরিপ-১ খরা ও খরিপ-২ খরা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশে তীব্র খরা প্রবণ এলাকা। রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা। তবে বর্তমানে তিস্তা নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খরাতে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, কম পানি লাগে এমন ফসলের চাষ, জাবড়া প্রয়োগ ইত্যাদি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে। খরা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। খরার কারণে ধান লাগাতে বেশি দেরি হলে নাবি ও খরা সহিষ্ণু জাতের ধান চাষ করতে হবে। আমন ধান কাটার পর খরা সহনশীল ফসল যেমন– ছোলা চাষ, তেল ফসল হিসাবে তিলের চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততার প্রভাব

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব দেখা যায়। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল জোয়ারের ফলে সৃষ্ট বন্যায় সরাসরি লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ডুবে যাওয়ায় মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির নিচের লবণ উপরে উঠে আসে। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ১৯৭৩ সালে ৮.৩৩ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবনাক্ততায় আক্রান্ত ছিল। ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০.২০ লাখ হেক্টরে। বর্তমানে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ ১০.৫৬ লাখ হেক্টর। অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮৯ লাখ হেক্টর উপকূলীয় জমির ৬২.৫২% বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার মাত্রার উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১) খুব সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

২) সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

৩) মধ্যম লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

৪) তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি ও

৫) অতি তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি।

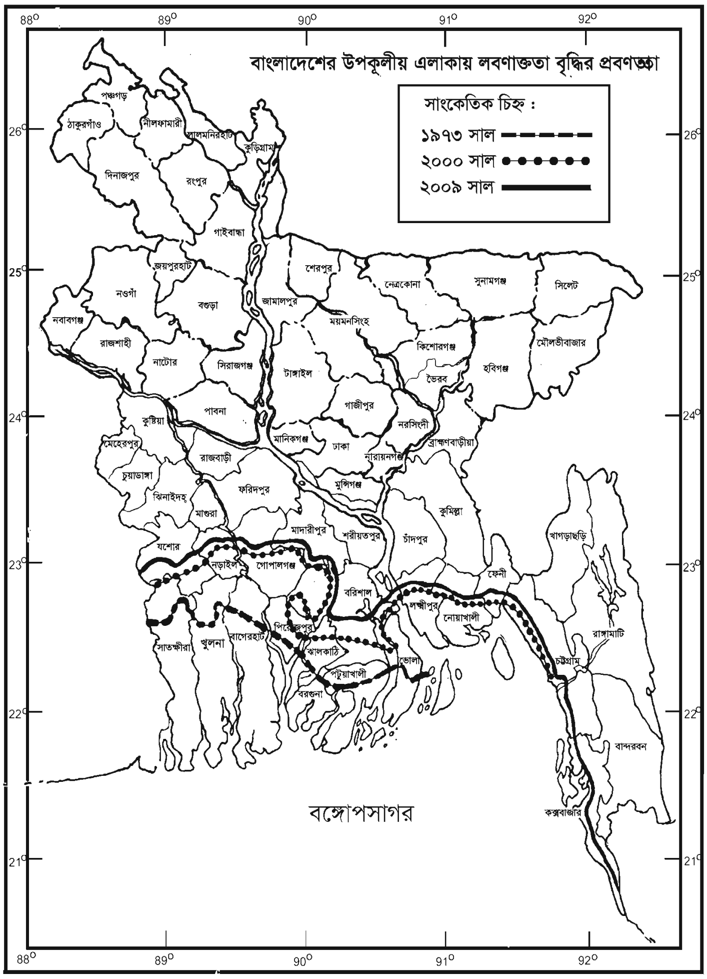
বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রবণতা
সাংকেতিক চিহ্ন :
১৯৭৩ সাল
২০০০ সাল
২০০৯ সাল
88°
89°
90°
91°
92°
26°
25°
24°
23°
22°
21°
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
জামালপুর
শেরপুর
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
টাঙ্গাইল
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
ভৈরব
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
পাবনা
গাজীপুর
নরসিংদী
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়নগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রাজবাড়ী
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
ফরিদপুর
মুন্সিগঞ্জ
মাগুরা
কুমিল্লা
মাদারীপুর
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
যশোর
নড়াইল
গোপালগঞ্জ
ফেনী
বরিশাল
লক্ষ্মীপুর
নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
সাতক্ষীরা
খুলনা
বাগেরহাট
পিরোজপুর
ঝালকাঠি
ভোলা
পটুয়াখালী
বরগুনা
চট্টগ্রাম
বান্দরবন
বঙ্গোপসাগর
কক্সবাজার

কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রবণতা মানচিত্রে প্রদর্শন করবে।

খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার অনেক এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এ সব এলাকায় কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ধারা আরও বাড়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে অনেক এলাকায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এমনিতেই উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫০% জমি বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হওয়ায় সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। তদুপরি উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল চাষ আরও হুমকির মুখে পড়বে।

এমতাবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল ফসল এবং ফসলের জাতের চাষ উপকূলীয় এলাকায় জনপ্রিয় করতে হবে। লবণাক্ত সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষিতাত্ত্বিক

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমন মৌসুমে বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১ এবং বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৪৭, বিনা ধান ৮ জাতের চাষ করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে জলাবদ্ধতা বা বন্যার প্রভাব

প্রতি বছর দেশের প্রায় ২৫% জমি বন্যার কারণে বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদিত দানা শস্যের ৬০ ভাগের বেশি এ সময় উৎপাদন হয়। ঘন ঘন বন্যার কারণে কৃষকেরা স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষে বাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ এসব জাত গভীর পানিতে জন্মাতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করে। জমিতে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে ফসল চাষের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, নীলফামারী ইত্যাদি জেলা ঢল বন্যার শিকার হয়। প্রায় প্রতিবছর এ সব অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির পাকা বোরো ধান কর্তনের আগেই ঢল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক হাজার চারশত বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের ঢল বন্যা প্রবণ।

বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও বেশি বাঁধ, স্লুইস গেট নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিবে। এগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। কোনো রকম ভুল হলে দীর্ঘদিন তার মাশুল দিতে হবে। যশোর ও খুলনা জেলার ভবদহ এলাকা জলাবদ্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচলিত ফসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফসল চাষ করতে হবে। ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৫ চাষ করলে ব্রি ধান ২৯ এর থেকে আগে পাকে। দেশের মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরবর্তী সময়ে নাবী জাতের ধান, যেমন– নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩ এবং ব্রি ধান ৪৬ চাষ করতে হবে। বন্যার কারণে বীজতলা তৈরির জমি না পেলে দাপোগ পদ্ধতির বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী সময় দ্রুত শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল চাষের জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : তীব্র খরা, সাধারণ খরা, রবি খরা, খরিপ-১ খরা, খরিপ-২ খরা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কলাকৌশল

ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

আমরা জানি প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় ও জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেয়। এ খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। ফসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা বা বন্যা ইত্যাদি প্রতিকূল বা বিরূপ পরিবেশে ফসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফসলের খরা অভিযোজন কৌশল

খরা সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। খরা অবস্থায় ফসলের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি থাকে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে, তাপমাত্রা বেশি ও সূর্যালোক প্রখর থাকে। এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

১। খরা এড়ানো

খরা অবস্থায় ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া ও খরা অবস্থা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জীবনচক্র শেষ করে খরা কবলিত না হওয়ার কৌশলকে খরা এড়ানো বলে।

আবাদকৃত ফসলের মধ্যে কিছু কিছু জাতের ফসল রয়েছে যাদের জীবনকাল স্বল্প। কোনো কোনো ফসলের আগাম জাত অল্প সময়ে পরিপক্বতার কারণে দুই-একটি খরা এড়াতে পারে। ফসলের ফুল, ফল ধারণ ও পরিপক্বতার কাল স্বল্প হলে খরা এড়াতে পারে। যেমন– ফেলনের ফুল ফোটা হতে দানা পরিপক্ব হতে ১৭-২০ দিন সময় লাগে। ফলে খরাপ্রবণ এলাকায় ফেলন চাষ করে খরা শুরু হওয়ার পূর্বেই ফসল তোলা সম্ভব।

২। খরা প্রতিরোধ

খরাকবলিত অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। ফসলের খরা প্রতিরোধ কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক) খরা সহ্যকরণও খ) খরা পরিহারকরণ। আমরা এখন খরা সহ্যকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

ক) ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল

ফসল খরায় পতিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরের স্বল্প পানি সাম্যতা নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। এ সব ফসল খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ করে। ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশলগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১। **কোষের পানিশূন্যতা রোধকরণ :** এ ধরনের ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাব জমিয়ে রাখে। ফলে কোষাভ্যন্তরে উচ্চতর অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে। কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যায় না এবং কোষ চুপসে যায় না। খরার সময় তুলা ফসলে এটা লক্ষ করা যায়।

২। **মোটা কোষ প্রাচীর :** অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতিয়ে পড়ে না।

৩। **উপোসকরণ :** কিছু কিছু উদ্ভিদ খরা কবলিত অবস্থায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় পাতার কোষ নেতিয়ে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশ্লেষণ বজায় রাখে। এভাবে খরাকালীন অবস্থায় উদ্ভিদ কোনো রকমে বেঁচে থাকে।

৪। **প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ :** খরার প্রভাবে উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। এ জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে যা এ বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহনশীল করে তোলে।

৫। **কোষ গহ্বর শূন্যতা :** উদ্ভিদের অঙ্গ ভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে কোনো কোষ গহ্বর থাকে না, সে সব অঙ্গ খরা সহনশীল হয়। যেমন– খরার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না। পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৬। **সুপ্তাবস্থা :** অনেক বহুবর্ষী উদ্ভিদের খরা অবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায় কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থায় বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।

খ) ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল

আমরা আগেই জেনেছি ফসলের খরা প্রতিরোধের কৌশল দুইটি, যথা– খরা সহ্যকরণ ও খরা পরিহারকরণ। নিচে ফসলের প্রধান প্রধান খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :

১। **পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরা অবস্থা মোকাবেলা করে। যেমন–যব ও লম্বা জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ রাখে। আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্ররন্ধ্রের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে। আবার অনেক ফসলের পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম থাকে, পত্ররন্ধ্র পাতার ছোট ছোট ভাঁজ বা গর্তের মধ্যে থাকে। ফলে প্রস্বেদন কম হয়, পানি সংরক্ষিত থাকে।

২। **প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিড জমা করে প্রস্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়; যেমন– সয়াবিন ফসল। আবার অনেক ফসল পাতার উপরে মোম বা ঘন রোমের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে প্রস্বেদন হ্রাস করে।

৩। **পাতার আকার হ্রাসকরণ :** অনেক ফসল খরাকবলিত অবস্থায় পাতার আকার হ্রাস করে প্রস্বেদন কমিয়ে দেয়; যেমন– ফেলন। পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

৪। **পাতা ঝরানো :** খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক ফসল নিচ থেকে পুরাতন পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও ফেলনের এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কাণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়। খরার ফলে ইথিলিন (এনজাইম) উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

৫। **সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ :** কিছু ফসল পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রস্বেদন কমালেও পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ফসলে এটা দেখা যায়।

৬। **দক্ষ মূলতন্ত্র :** কিছু কিছু উদ্ভিদ মূলের দৈর্ঘ্য, সংখ্যা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে অধিক পরিমাণ পানি আহরণের মাধ্যমে খরা অবস্থা মোকাবেলা করে; যেমন– ভুট্টা, তুলা ও গমের অনেক জাতে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। মূলের অধিক গভীরতা ও ঘনত্ব একই ফসলে বিরাজমান থাকলে সে ফসল অধিক খরা প্রতিরোধী হয়; যেমন– জোয়ার ও বাজরা। আবার ধইনচা, তুলা, অড়হর গভীরমূলী হওয়ায় খরা প্রতিরোধী হয়।

৭। **পাতা মোড়ানো ও পাতা কুঞ্চিতকরণ :** অনেক দানা ফসল; যেমন– জোয়ার, কাউন পাতার আকার হ্রাসকরণ ছাড়াও খরা পরিবেশে পাতা কুঞ্চিত করে। আবার অনেক ফসল পাতা মুড়িয়ে সূর্যালোক প্রাপ্তির আয়তন কমিয়ে দেয়। ফলে এদের প্রস্বেদন কমে যাওয়ার কারণে পানির অপচয় হ্রাস পায় এবং খরা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।

৮। **পাতার দিক পরিবর্তন :** অনেক উদ্ভিদে খরা অবস্থায় সূর্যালোকের সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। চিনাবাদাম, তুলা ও ফেলনসহ আরও অনেক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফসলের খরা অভিযোজন কৌশলগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা অভিযোজন কলাকৌশল

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা লবণাক্ত পরিবেশে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে জেনেছি। লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের উপর ভিত্তি করে ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ক) হ্যালোফাইটস– গোলপাতা, কেওড়া ও খ) গ্লাইকোফাইটস– সুগারবিট, শিম, তুলা। হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে সেখানেই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে যা গ্লাইকোফাইটস পারে না।

লবণাক্ত এলাকার মৃত্তিকা পানিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্যালসিয়াম ও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকায় পানির ঘনত্ব বেশি থাকে। এ পরিবেশে উদ্ভিদকে টিকে থাকতে হলে উদ্ভিদের কোষ রসের ঘনত্ব মৃত্তিকা পানির ঘনত্ব থেকে বেশি হতে হয়। বেশি না হলে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি বা খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে না, উল্টা পানি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উদ্ভিদ কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য মাটি হতে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (K^+, Na^+) আহরণ করে লবণাক্ততার এ বাধা অতিক্রম করে। এতে করে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে আয়নের আধিক্য ঘটে। কিন্তু লবণ সহ্যকারী উদ্ভিদ আয়নের আহরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো প্রজাতির পাতায় একধরনের লবণ জালিকা থাকে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন বের করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি পাতার আয়তন বাড়িয়ে শরীরে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে নেয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে পাতার কোষে অতিরিক্ত আয়ন জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত পরিবেশে আয়ন আহরণ না করে অন্য উপায় অবলম্বন করে। এসব উদ্ভিদের মূলের কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য কোষ গহ্বরে বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাব জমা করে রাখে। এ ধরনের উদ্ভিদের কোষ গহ্বরের আয়তন কোষের মোট আয়তনের ৯৫% হয়ে থাকে। কোষ গহ্বরে জমা করা জৈব দ্রব্যের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষণজাত দ্রব্যই বেশি থাকে।

জলাবদ্ধ অবস্থায় বা বন্যায় ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

জলজ উদ্ভিদ ছাড়া অধিকাংশ ফসল বন্যা বা জলাবদ্ধ বা মৃত্তিকা পানির সম্পৃক্ত অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থায় মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের মূল শ্বসনকাজ চালাতে পারে না। যত দ্রুত মাটি বা পানিস্থ দ্রবীভূত অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় এ সব উদ্ভিদ তত দ্রুত মারা যায়। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ। ধান গাছে এ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে। এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঠুরি থাকে। বায়ু কুঠুরিতে অক্সিজেন জমা থাকে। ফলে ধানগাছ ডুবে না গেলে বন্যা বা জলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং ভালো ফলন দেয়। তবে অনেক দিন ডুবে থাকলে মারা যায়। গভীর পানির আমন ধান বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে উচ্চতায় বাড়তে থাকে। এ সব জাতের ধানগাছের পর্ব মধ্যে এক ধরনের ভাজক কলা থাকে যা বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে দ্রুত বিভাজিত হয়ে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে বন্যা মোকাবেলা করে। আবার লম্বা জাতের ধান উচ্চতার কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

উচ্চ তাপমাত্রা অভিযোজন কৌশল

উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে। এ অবস্থায় ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায়, পানির অপচয় হয়। তাপ সহনশীল উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয়। তাপ সহনশীল উদ্ভিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : খরা এড়ানো, খরা প্রতিরোধ, খরা সহ্যকরণ, প্রোলিন, হ্যালোফাইটস, এ্যারেনকাইমা টিস্যু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান পঞ্চম। এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, পুকুর, দিঘি, প্লাবন ভূমি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের মোট পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর। সেই সাথে আরও রয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। দেশের এই সকল জলভাগ থেকে বর্তমানে যে মৎস্য উৎপাদন হয় তা এদের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ থেকে আরও অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশে ২০১১-১২ সালে যেখানে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। সেখানে সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও দেশে মাছের উৎপাদন বিগত

বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু এটি বেড়েছে মাছ চাষ বৃদ্ধির ফলে। অথচ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেমন-নদী, খাল, বিল, হাওর প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে কমে যাচ্ছে মাছের জীববৈচিত্র্যও। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনাবৃষ্টি বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা। এ সমস্ত কারণে মাছ চাষ, মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ব্যাহত হচ্ছে। নিচে মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

ক) মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

১) আমাদের দেশে মৌসুমি পুকুরগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির পানি জমলে চাষিরা মাছ ছাড়ে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অথবা বৃষ্টিপাত শুরু হতে দেরি হচ্ছে। এতে করে পোনা ছাড়তে দেরি হচ্ছে। আবার দেরিতে পোনা ছাড়ার পর পুকুর শুকিয়েও যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। ফলে চাষের সময় কমে যাচ্ছে এবং মাছ বড় হওয়ার আগেই ছোট মাছ বাজারজাত করতে হচ্ছে। এতে করে চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

২) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে হ্যাচারিতে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রজননের অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে হ্যাচারিতে মাছ কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দিচ্ছে না। পেটে ডিম আসলেও ডিম ছাড়ছে না। ডিম শরীরে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। আবার মাছ ডিম ছাড়লেও তা নিষিক্ত হচ্ছে না বা কম হচ্ছে। আবার নিষিক্ত হওয়া ডিম ফোটার হারও কম হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন ব্যাহত করছে।

৩) স্বল্প গভীর পুকুরে অধিক তাপমাত্রায় মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে ও চাষিদের আয় কমে যাচ্ছে।

৪) কম বৃষ্টির কারণে চাষের পুকুরে কম পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে পুকুরে বা খামারে পানি সরবরাহে চাষিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে।

৫) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মৎস্য সেক্টরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে চাষিদের দুর্ভোগ বাড়ছে। পুকুর থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে।

৬) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের পুকুরগুলো ডুবে যেতে পারে।

খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে প্রভাব

১) কম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে কম পানি হচ্ছে ফলে অল্প পানিতে সহজেই মাছ ধরা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে ছোট-বড়, প্রজননক্ষম সব মাছ ধরা পড়ছে। ফলে নদীতে মাছের জীববৈচিত্র্য ও স্থায়ী উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

২) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে ফলে লবণাক্ততা ঢুকে পড়ছে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে। এতে করে উপকূলীয় এলাকার স্বাদুপানির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। সে সাথে কমে যাচ্ছে উৎপাদনও।

৩) আমাদের দেশে বিল, বাঁওড়, প্লাবন ভূমিতে এপ্রিল-মে মাস হচ্ছে দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বা কম হওয়ার কারণে জুলাই মাস পর্যন্তও এসব জলাশয়ে পানি হচ্ছে না। ফলে এসব মাছের প্রজনন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র মৎস্য উৎপাদনে এবং যারা মাছ আহরণ করে তাদের পুষ্টি ও জীবীকার ক্ষেত্রে।

৪) আমাদের দেশে একমাত্র হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ ডিম ছাড়ে। বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরমের পর ভারী বৃষ্টি শুরু হলে এরা ডিম ছাড়ে। তখন নদী থেকে জেলেরা নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এবং এই ডিম ফুটিয়ে পোনা উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে রুইমাছের ডিমের পরিপক্বতা এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সাথে বৃষ্টিপাতের সময়ের অমিল হচ্ছে। ফলে ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রভাব

১) বায়ুমণ্ডলে দিন দিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে ফলে বেড়ে যাচ্ছে বাতাসের ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ফলে বাতাসের গতি প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ ও উৎপাদশীলতায় প্রভাব পড়ছে। ফলে সমুদ্রের কোনো অংশে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার মাছের নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র বলে খ্যাত কিছু এলাকা মাছশূন্য হয়ে যেতে পারে।

২) বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছ উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে। অনেক মাছ তার অভিপ্রায়ন (migration) পথ, প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলছে। ফলে জেলেরা সুদূর অতীত থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রের যে সব সামুদ্রিক এলাকায় মাছ আহরণ করতে যেত সেগুলোর পরিবর্তন হলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।

৩) কোরাল রীফ বা প্রবাল সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঢেউয়ের তারতম্য, সমুদ্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি, দূষণ, স্রোতের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র তথা মৎস্য বৈচিত্র্যের উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা কাটিয়ে উঠা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে অন্যদিকে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে-

১। জলবায়ু পরিবর্তনে যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে তাই লবণাক্ততা সহনশীল মাছের চাষ এবং পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-ভেটকি, বাটা, পারশে ইত্যাদি।

২। লবণাক্ততা বেড়ে চলছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ করা যেতে পারে।

৩। খরা প্রবণ এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলাপিয়া বেশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা অঞ্চলে কই ও দেশি মাগুরের চাষও করা যেতে পারে।

৪। বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে বা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে বা পুকুর ভেসে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

৫। বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঐ এলাকায় যে সময়ে বন্যা হয় না সে সময়ে ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করা যায়।

৬। বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার সময়টাতে খাঁচায় মাছ চাষ করা যেতে পারে।

৭। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়।

৮। দিন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা সহনশীল মাছ চাষ ও এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যেমন- মাগুর, রুই, শিং।

৯। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুকুরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তাতে টোপাপানা রাখা যেতে পারে। এতে করে মাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নিচে অবস্থান নিতে পারবে। একই উদ্দেশ্যে পুকুরের পাড়ে পানির উপর কিছু লতানো উদ্ভিদ জন্মানোর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু পানি সেচ দেওয়া যেতে পারে।

১০। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তা যেন জেলেদের মৎস্য আহরণে ও জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এ লক্ষ্যে নতুন বিচরণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। এ জন্য আধুনিক গবেষণা ও জরিপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির উপর প্রভাব

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও মানুষ কর্তৃক পরিবেশ ধ্বংসই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশ নিয়মিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশে দেশে প্রতি নিয়ত আঘাত করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা প্রভৃতি কারণে পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে খামার মালিক বা কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় না। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য দুর্যোগকালীন ও দুযোর্গ পরবর্তী সময়ে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তবতা মেনে নিয়েই সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমির শালবন, রাজশাহী অঞ্চলের পত্নীতলা ও নজীপুরের জঙ্গল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। যার ফলে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা হয়। এসব বনাঞ্চলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও উপকূলীয় বনায়ন পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলের বনায়ন সম্প্রসারণ, দেশের নদ-নদী খাল উদ্ধার ও পুনঃখনন এবং ছোট বড় পাহাড় রক্ষার পরিবেশ আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। দেশের সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণসহ ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে। এগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ব্যবস্থা। এসব বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ তথা পশুপাখি রক্ষা করা যাবে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির সমস্যা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

খরাজনিত সমস্যা : খরায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- কাঁচা ঘাসের অভাব হয়।
- পানি দূষিত হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
- মাঠ-ঘাটের ঘাস শুকিয়ে যায়।
- পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।
- অধিক তাপ পশুপাখির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে।
- গবাদিপশুর স্বাস্থ্যের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়।
- তাপপীড়নে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়।

বন্যাজনিত সমস্যা : বন্যা পরিস্থিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
- দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়।
- রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- গো-খাদ্য পাওয়া যায় না।
- পানি দূষিত হয়।
- পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
- ঘাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, অনেক পশুর মৃত্যু হয়।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা : জলোচ্ছ্বাসের সময় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকার পানি দূষিত হয়।
- জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিক মারা যায়।
- সৎকারের অভাবে মৃত পশুপাখি পরিবেশ দূষিত করে।
- পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।
- জীবিত গবাদিপশু উদরাময়, পেটের পীড়া ও পেটফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

কোনো প্রজাতি তার পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে পরিবেশ ও জীবের দেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবেলা করেই জীব তার অবস্থানে টিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হলে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পশুপাখি সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না। কারণ পশুপাখি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরে ধীরে হলে অনেক পশুপাখি পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম অনেক প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে। প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে পশুপাখির অভিযোজনের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে পশুপাখি অনেকাংশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

খরায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

১। কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল, বাবলাসহ বিভিন্ন গাছের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খরার সময় এসব গাছের পাতা পশুকে খাওয়াতে হবে।

২। খরার সময় পশুকে ভাতের মাড়, তরিতরকারির উচ্ছিষ্ট অংশ, কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের ভুসি, খৈল, ঝোলাগুড় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

৩। গবাদিপশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

৪। পশুকে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য (যেমন - সবুজ অ্যালজি) খাওয়াতে হবে।

৫। খরা মৌসুম আসার পূর্বেই ঘাস দ্বারা সাইলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে। যা খরা মৌসুমে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে।

৬। গবাদিপশুকে শুষ্ক খড় না খাইয়ে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা খড় ও ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। গবাদির পশুকে পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

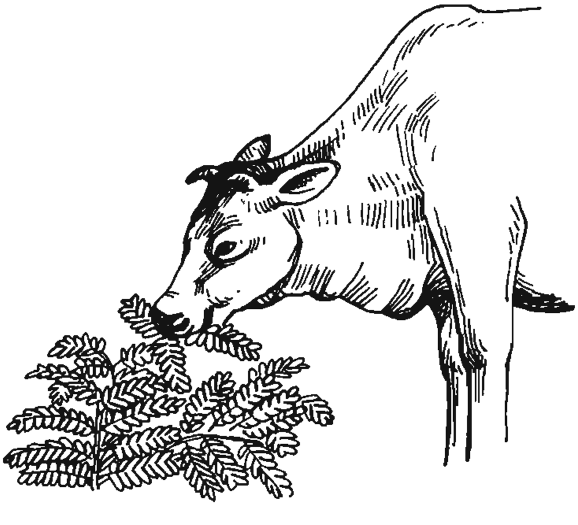

চিত্র : খরার সময় পশু ইপিল ইপিল পাতা খাচ্ছে

৮। পশুকে বেশি করে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।

৯। পশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

১০। পশুর শরীর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং পরজীবির জন্য চিকিৎসা করাতে হবে।

১১। পশুকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং প্রখর রোদে নেওয়া যাবে না।

১২। গবাদিপশু অসুস্থ হলে পশু ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।

বন্যাজনিত সমস্যায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

১। গবাদিপশুকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

২। গবাদিপশুকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে, বন্যার দূষিত পানি খাওয়ানো যাবে না।

৩। গবাদিপশুর মৃতদেহ গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

৪। বন্যার সময় গবাদিপশুকে খাদ্য হিসাবে খড়, চালের কুঁড়া, ভুসি ও খৈল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

৫। এ সময় কচুরিপানা, দলঘাস, লতাগুল্ম এমনকি কলাগাছও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

৬। কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসাবে হে ও সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮। গবাদিপশুকে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে।

৯। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক আক্রান্ত পশুকে চিকিৎসা করাতে হবে।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বছরের যে কোনো সময় জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। আমাদের দেশের বিস্তৃর্ণ সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলো জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। তাই জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

১। উঁচুস্থানে পশুপাখির বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

২। জলোচ্ছ্বাস বা ঝড়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে গবাদিপশুকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখা

৩। জলোচ্ছ্বাসের পর মৃত পশুকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া

৪। এ সময় পশুর জন্য ভাতের মাড় ও জাউ, শুকনো খড় এবং দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করা

৫। গবাদিপশুকে দানাদার খাদ্য যেমন-ভুসি, কুঁড়া, খৈল ও প্রয়োজনমতো লবণ খাওয়ানো

৬। গবাদিপশুকে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গাছ-পাতা খাওয়ানো

৭। জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় টিম গঠন করে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৮। গবাদিপশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া

৯। গবাদিপশু যাতে পচা দূষিত পানি খেয়ে রোগাক্রান্ত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিরূপ পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত কোনটি ?

ক. উপযোগী ফসল নির্বাচন। খ. সঠিক জমি নির্বাচন।

গ. যথাযথ পরিচর্যা করা। ঘ. অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ।

২. খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে রোপা আমনের জনপ্রিয় জাত কোনটি?

ক. বালাম খ. দিশারী

গ. চান্দিনা ঘ. মুক্তা

৩. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনে-

i. রোগবালাই বৃদ্ধি পাবে।

ii. জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

iii. ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ কোনটি?

ক. শিম খ. তুলা

গ. কেওড়া ঘ. বাইন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহের মিয়ার বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। আমন মৌসুমে ধানের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৫ দিন পানির নিচে থাকায় আশানুরূপ ফলন পান না। আবার পাহাড়ি ঢলে প্রায় সময়ই পাকা বোরো ধান তলিয়ে যায়।

৫. তাহের মিয়া আমন মৌসুমে কোন জাতের ধানের চাষ করলে আশানুরূপ ফলন পাবেন?

ক. কিরণ (বি আর ২২)
খ. ব্রি ধান ৫১
গ. ব্রি ধান ৪৫
ঘ. ব্রি ধান ৩৬

৬. বোরো মৌসুমে পাকা ধান নষ্ট না হওয়ার জন্য তাহের মিয়ার উচিত-

i. সঠিক সময়ে চারা রোপণ করা
ii. ব্রি ধান ২৮ ও ব্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার
iii. ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুজিত বাবুর বাড়ি সমুদ্র উপকূলবর্তী সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি আবাদি জমিতে স্থানীয় জাতের ধান চাষ করে উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এরপর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে বিনা ধান-৮ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য চিত্র দেখে সুজিত বাবু লবণাক্ততা সহায়ক বিভিন্ন ফসলের চাষ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পারলেন।

ক. লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?

খ. তাপমাত্রা কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুজিত বাবুর এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর।

২. চিত্রার বাবা নিয়মিত চট্টগ্রামে হালদা নদী থেকে মাছের ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু এ বছর চিত্রার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন নির্দিষ্ট সময়ে কার্প জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ফলে আয়- রোজগার কমে যাবে। তিনি এলাকায় মৎস্য সপ্তাহ চলাকালে শোভাযাত্রায় ও তথ্য চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়ার কারণ জানতে পারেন।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রার বাবার ডিম সংগ্রহ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শোভাযাত্রাটি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিরূপ প্রভাব ফেলবে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালন প্রভৃতির উৎপাদনকে বোঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশে পতিত ও অব্যবহৃত জায়গাতেও পরিকল্পিতভাবে ফুলফল ও শাকসবজি চাষ করা যায়। এছাড়া শস্যপর্যায় অবলম্বন করে দানা জাতীয় ফসলের পরে সরিষা বা মাসকলাই চাষ, আঁশ জাতীয় ফসলের পরে দানা জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে বাঁশ, বেত, পাটকাঠি, খড়, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কাজেই কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।

মাসকলাই

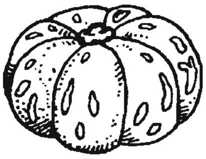

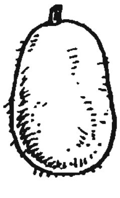

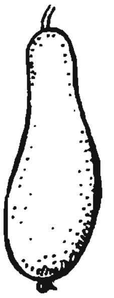

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- চাষ উপযোগী বিভিন্ন জাতের ফসলের নাম, উৎপাদন পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শাকসবজি চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ও দমন পদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ও দমন পদ্ধতি এবং ফুল-ফল চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছ পালন পদ্ধতি, মাছের রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুপাখির আবাসন ও পালন পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা এবং গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমন্বিত চাষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমন্বিত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সমন্বিত চাষ পদ্ধতির মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব এবং সমন্বিত চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পে ব্যবহৃত হয় এরূপ কৃষিজ দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং ঔষধি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল চাষ পদ্ধতি

আমরা অষ্টম শ্রেণিতে চাষ উপযোগী ফসলের মধ্যে কেবল গম ফসল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছি। এ পরিচ্ছেদে আমরা ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই এর জাত ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

ধান চাষ

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে ধানের চাষ ও উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ভাত। ধানের ফলন সব জমিতে ভালো হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন বেশি ভালো হয়। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এঁটেল ও পলি দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাতসমূহ : বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে। যথা :

ক) স্থানীয় জাত : টেপি, গিরবি, দুধসর, লতিশাইল

খ) স্থানীয় উন্নতজাত : কটকতারা, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজারশাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

গ) উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত : বাংলাদেশে অনেক জমিতে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। উফশী ধানের জাতগুলোর সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন :

- গাছ মজবুত এবং পাতা খাড়া।
- শীষের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
- গাছ খাটো ও হেলে পড়ে না।
- খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি।
- পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
- অধিক কুশি গজায়।
- সার গ্রহণক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি।

উফশী ধানে যখন প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাগুণ, যেমন- রোগবালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, চিকন চাল, খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি সংযোজিত হয়, তখন তাকে আধুনিক ধান বলে। তাই সকল উফশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উফশী গুণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এ পর্যন্ত ধানের উফশী ৭৮টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ধানের মৌসুম তিনটি। যথা- আউশ, আমন ও বোরো। ব্রি ধানের কতকগুলো অনুমোদিত

জাত আছে যেগুলো আউশ ও বোরো দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। যেমন– বিআর ১ (চান্দিনা), বি আর ২(মালা), বিআর ৯(সুফলা), বিআর ১৪(গাজী)। আবার বিআর ৩ (বিপ্লব) জাত সকল মৌসুমে চাষ করা যায়। নিম্নে তিন মৌসুমের অনুমোদিত জাতগুলোর সংখ্যা ও কিছু জাতের নাম উল্লেখ করা হলো :

ক) **আউশ মৌসুমের জাত :** শুধু আউশ মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ৮টি। এদের মধ্যে কয়টি বিআর ২০ (নিজামী), বিআর ২১ (নিয়ামত) ইত্যাদি। এ জাতগুলো আউশ মৌসুমে বপন ও রোপণ দুইভাবেই আবাদ করা যায়। এ মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ শে চৈত্র এবং চারা রোপণের জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।

খ) **আমন মৌসুমের জাত :** শুধু আমন মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ২৭টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ৫(দুলাভোগ), বিআর ১১(মুক্তা), বিআর ২২(কিরণ), ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭ ও ব্রি ধান ৬২ ইত্যাদি।

সবগুলো জাতই রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ২৫-৩০ দিন।

গ) **বোরো মৌসুমের জাত :** শুধু বোরো মৌসুমেই চাষ করা যায় এরূপ জাত হলো ১৬টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ১৮(শাহজালাল), ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৪৫, ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি), ব্রি হাইব্রিড ধান ১, ব্রি হাইব্রিড ধান ২ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ ইত্যাদি। রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ৩৫-৪৫ দিন।

এ ছাড়া ধান ফসলের আরও কিছু জাত আছে। যেমন : বৃষ্টিবহুল, খরা-সহিষ্ণু, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু, হাওর, ঠাণ্ডা-সহিষ্ণু জাত ইত্যাদি।

বীজ বাছাই : কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজায় এরূপ পরিষ্কার, সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বপনের জন্য বাছাই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বাছাই করা হয়।

প্রথমে দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে প্রাপ্ত দ্রবণে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট ও হালকা বীজগুলো পানির উপর ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে নিলেই পানির নিচ থেকে ভালো বীজ পাওয়া যাবে। এ বীজগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ধুয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া মেশানো পানি বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া : বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম কার্বক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) দ্বারাও শোধন করা যায়।

শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২-৩ স্তর শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের ব্যাগ রেখে পুনরায় ২-৩ স্তর শুকনো খড় দিয়ে বা কচুপাতা দিয়ে ঢেকে ভালোভাবে চেপে তার উপর কোনো ভারী জিনিস দিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং সেগুলো বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি : ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথা-

ক) শুকনো বীজতলা খ) ভেজা বীজতলা গ) ভাসমান বীজতলা ঘ) দাপোগ বীজতলা উঁচু ও দোআঁশ মাটিসম্পন্ন জমিতে শুকনো বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভেজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো বাতাস থাকে এবং বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে শুকনো ও ভেজা বীজতলা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক) শুকনো বীজতলা : বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি যদি অনুর্বর হয় জমিতে জৈব সার দিতে হবে। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজতলার মাপ : এক শতক জমিতে দুই খণ্ডের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০মিটার X ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নালা বাদ দিয়ে ৯.৫ মিটার X ১.৫ মিটার হবে। বীজ তলার চারদিকে ২৫সেমি জায়গা বাদ দিতে হবে এবং দুই খণ্ডের মাঝখানে ৫০ সেমি জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে। বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজ জাগ দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়কাল দরকার। যেমন- আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাণ বীজ উল্লিখিত নিয়মে জাগ দিয়ে অঙ্কুরিত করতে হবে। এরূপ অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।

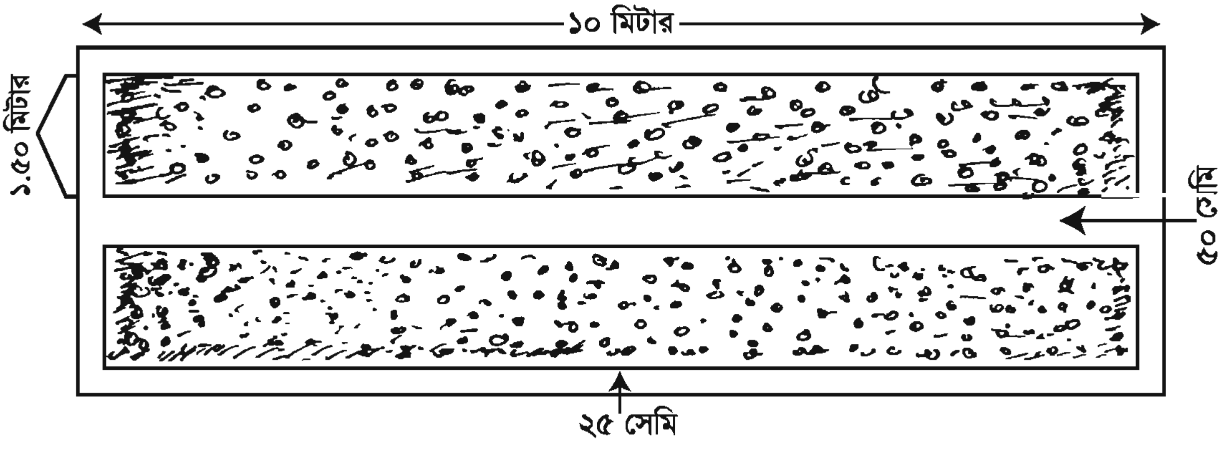

চিত্র: এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝের জায়গা থেকে মাটি উঠিয়ে দুই বেডে সমানভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। এতে বেডগুলো উঁচু হয়। এরপর প্রতি বর্গমিটার বেডে ৬০-৮০ গ্রাম বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুই বেডের মাঝে সৃষ্ট নালা সেচ, নিষ্কাশন ও সার বা ঔষধ প্রয়োগের জন্য খুবই দরকার হয়।

খ) ভেজা বীজতলা : এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর জমি আরও ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে বোনা ভালো। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনো বীজতলার মতোই।

বীজতলার পরিচর্যা : পাখি যাতে বীজতলার বীজ খেতে না পারে সেজন্য বপনের সময় থেকে ৪-৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেড যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য দুই বেডের মাঝের নালায় পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর নালা থেকে প্রয়োজনীয় পানি বেড়ে সেচ দিতে হয়। বীজ তলায় আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে তা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজ তলার চারাগুলো হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারাগুলো সবুজ না হলে গন্ধকের (সালফার) অভাব হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বীজতলায় চারাগুলো ক্ষতি হতে পারে। তাই রাতে পলিথিন দ্বারা চারাগুলো ঢেকে দিনের বেলায় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চারার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

চারা উঠানো

১। চারা তোলার পূর্বে বীজতলায় পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উত্তম। এতে বীজতলার মাটি নরম হয়। ফলে চারা তুলতে সুবিধা হয়।

২। ধানের চারা পোকায় আক্রান্ত থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৩। চারার গোড়া বা কাণ্ড যাতে না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

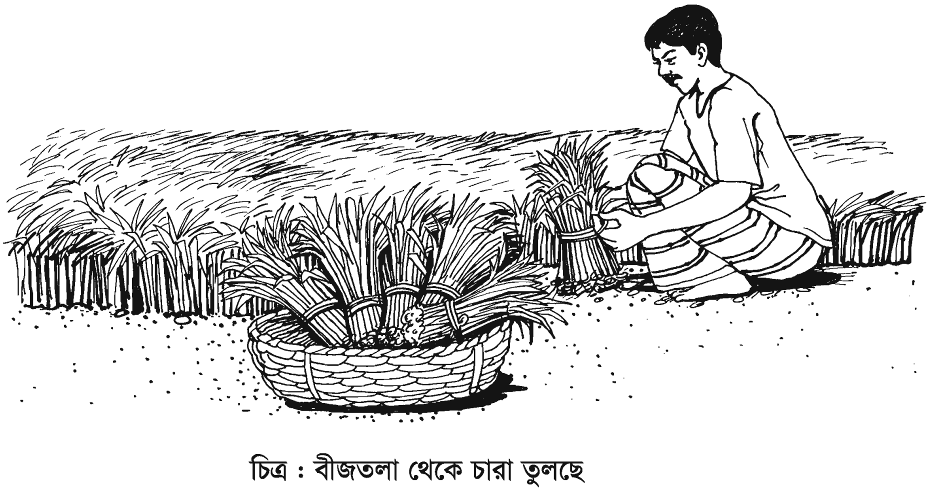

চিত্র : বীজতলা থেকে চারা তুলছে

চারা বহন ও সংরক্ষণ : সরাসরি রোপণের ক্ষেত্রে-

১। বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড মোড়ানো যাবে না।

২। ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করতে হয়।

৩। বস্তাবন্দী করে কখনো ধানের চারা বহন করা যাবে না।

৪। চারা সরাসরি রোপণ সম্ভব না হলে চারার আঁটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি : ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে জমির চারদিক ছেঁটে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণ করার পর ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর, ২য় কিস্তি ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ চারার গোছায় ৪-৫টি কুশি আসা অবস্থায় এবং শেষ কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।

নিচে শতক প্রতি জৈব সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারের পরিমাণ দেওয়া হলো :

সারের নাম	পরিমাপ
পচা গোবর বা কমপোষ্ট	২০ কেজি
ইউরিয়া	৩৬০-৮৪০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০-৫০০ গ্রাম
এমওপি	১৬০-২৮০ গ্রাম
জিপসাম	২৪০-২৮০ গ্রাম
দস্তা	৪০ গ্রাম

শতকপ্রতি ২০ কেজি পচা গোবর সার বা কমপোস্ট দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা : জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন: পাহাড়ের পাদভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমওপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।

১। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচপ্রকল্প এলাকার মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।

২। হাওর এলাকার মাটিতে প্রত্যেক সার কম পরিমাণে দিতে হবে।

৩। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ : সমান করা সমতল জমিতে জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। জমিতে ছিপছিপে পানি রেখে দড়ির সাহায্যে সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং সারিতে এক গোছা থেকে অন্য গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি হওয়া দরকার। প্রতি গোছায় ২-৩ টি চারা রোপণ করতে হবে। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

ক) সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে আলবাঁধা মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। বোরো ধান সম্পূর্ণভাবে সেচের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ৫-৭ সেমি এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সেমি এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সেমি সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সেমি এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি পরিমাণ পানি সেচ দেওয়া উত্তম। থোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আগাছা দমন : কমপক্ষে তিন বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়। যেমন :

- চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে
- প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে
- থোড় বের হওয়ার পূর্বে।

ধানক্ষেতে সাধারণত আরাইল, শুইচা, শ্যামা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়। এজন্য সরাসরি হাত/নিড়ানি যন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

গ) পোকা দমন : ধানক্ষেতে অনেক পোকার উপদ্রব হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সাধারণত ধান ফসলে মাজরা পোকা, পামরি পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, গল মাছি, শীষকাটা লেদা পোকা প্রভৃতি দেখা যায়।

নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

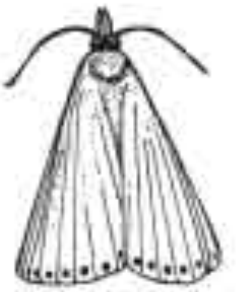

চিত্র: মাজরা পোকা মথ

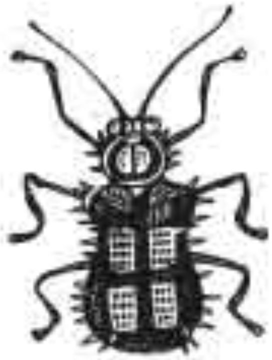

চিত্র : পামরি পোকা

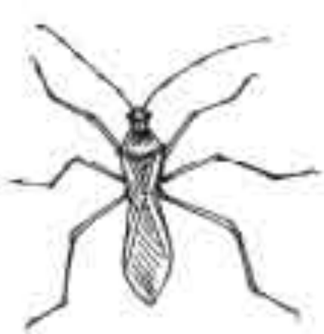

চিত্র : গান্ধি পোকা

নিম্নলিখিত তালিকায় পোকার আক্রমণের লক্ষণসমূহ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করা যায় ।

তালিকা ১

পোকার নাম	আক্রমনের লক্ষণসমূহ
১. মাজরা পোকা	১) ধান গাছের মাঝডগা ও শীষের ক্ষতি করে, ২) কুশি অবস্থায় আক্রমণ করলে মাঝ ডগা সাদা হয়ে যায়, ৩) ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীষে সাদা চিটা হয়, ৪) সব ঋতুতেই কমবেশি আক্রমণ করে ।
২. পামরি পোকা	১) পামরি পোকার কীড়া পাতার ভিতরে ছিদ্র করে সবুজ অংশ খায় । ২) পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ খুঁড়ে খুঁড়ে খায় বলে পাতা সাদা হয়ে যায় ।
৩. গলমাছি	১) গল মাছির কীড়া ধানগাছের বাড়ন্ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পিঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায় । ২) কুশিতে শীষ হয় না ।
৪. গান্ধি পোকা	১) গান্ধি পোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে । ২) বয়স্ক পোকার গা থেকে গন্ধ বের হয় ।
৫. বাদামি গাছ ফড়িং	১) ধানের গোড়ায় বসে রস চুষে খায়, ২) গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায়, একে হপার বার্ন বলে ।

তালিকা ২

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গান্ধি পোকা, পামরি পোকা, মাজরা পোকা, গলমাছি, ছাতরা পোকা, চুঙ্গী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা,	ক্লোরোপাইরিফস ৫০ বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ বা ফেনিট্রথিয়ন ৫৭ বা ডায়াজিনন ৬০
বাদামি গাছ ফড়িং	কার্বোফুরান ৩ জি/ ১০জি বা ডায়াজিনন ১৪
শীষকাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০

রোগ দমন : ধান গাছের অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ। নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণসমূহ	দমনপদ্ধতি
১. ব্লাস্ট রোগ	ছত্রাক	১) পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। ২) দাগের চারদিকে গাঢ় বাদামি এবং মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণের হয়। ৩) অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ পাতা মরে যায়।	১) নীরোগ বীজ ব্যবহার করা। ২) পটাশ জাতীয় সার উপরি প্রয়োগ করা। ৩) বীজ শোধন করে বোনা। ৪) জমিতে পানি ধরে রাখা। ৫) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা। ৬) রোগ প্রতিরোধ জাত বিআর ৩, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিআর ১৬, বিআর ২৪, ব্রি ধান ২৮ রোপণ করা।
২. টুংরো রোগ	ভাইরাস	১) চারা রোপণের এক মাসের মধ্যে টুংরো রোগ দেখা দিতে পারে। ২) আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ, পরে আস্তে আস্তে হলদে হয়ে যায়। ৩) গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। ৪) কুশি হয় না। ৫) প্রথমে দুই-একটি গোছায় এ রোগটি দেখা যায়, পরে ধীরে ধীরে আশেপাশের গোছায় ছড়িয়ে পড়ে।	১) পাতা ফড়িং এ রোগ ছাড়ায়, তাই পাতা ফড়িং দমন করতে হবে। ২) রোগ প্রতিরোধীজাত যেমন- চান্দিনা, দুলাভোগ, ব্রি শাইল, গাজী, বিআর ১৬, বিআর ২২, ব্রি ধান ৩৭, ব্রি ধান ৩৯, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৪২ চাষ করা। ৩) আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলা। ৪) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা। ৭) ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি স্প্রে করা।

এছাড়া ধান ফসলে পাতা পোড়া রোগ, উফরা রোগ, খোল পোড়া রোগ, বাকানি রোগ, বাদামি দাগ রোগ, খোলপচা রোগ, স্মাট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে ধান ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়, শীষকাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শীষের উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং নিচের অংশের ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা দরকার। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াইয়ের পর ধান ৩-৪ দিন পূর্ণ রোদে শুকাতে

হবে। এবার ভালোভাবে কুলাদিয়ে ঝেড়ে সংরক্ষণ করতে হবে। যে পাত্রে ধান রাখা হবে তা পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় নিম/নিশিন্দা/বিষকাটালীর পাতা (গুঁড়া) মিশিয়ে দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। তারপর পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না ঢুকে।

ফলন

আউশের চেয়ে আমনের, আবার আমনের চেয়ে বোরোর ফলন বেশি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি হয়ে থাকে। উফশী জাতের ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন এবং শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ২০-২৪ কেজি।

কাজ : শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধান ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

পাট চাষ

বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও পাট জন্মে। পাটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে উঠেছে।

জমি নির্বাচন : উর্বর দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বর্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশি পাট উঁচু ও নিচু দুই ধরনের জমিতেই চাষ করা যায়।

চাষ উপযোগী পাটের জাতসমূহ : প্রত্যেকটি ফসলের এমন অনেক জাত আছে যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পুষ্টিমান, খাদ্যগুণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গুণাবলি বিদ্যমান। তবে একই জাতে সব বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) ১৭টি দেশি, ১৬টি তোষা বা বগী পাট, ২টি কেনাফ এবং ১টি মেস্তা জাতের পাট উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে।

দেশি পাটের জাতসমূহ : সিভিএল-১ (সবুজপাট), সিভিই-৩ (আশু পাট), সি সি-৪৫ (জো পাট), ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮ ইত্যাদি দেশি পাটের জাত।

তোষা বা বগী পাটের জাতসমূহ : ও-4, ও-৯৮৯৭ (ফাল্গুনি তোষা), সিজি (চিন সুরা গ্রিন) ইত্যাদি তোষা বা বগী পাটের জাত।

কেনাফ জাতসমূহ : এইচ সি-২ (জলি কেনাফ), এইচ সি-৯৫

মেস্তাজাত : এইচ এস-২৪ (টানী মেস্তা)

জমিচাষ : ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দুইএক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। রবি ফসল তোলার পর পরই জমি চাষ করা উচিত। ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে

সমান করতে হবে। পাটের বীজ ছোট বলে মাটির দলা ভেঙে মিহি করতে হবে এবং আগাছা থাকলে বা পূর্ববর্তী ফসলের শিকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নতুবা বীজ আশানুরূপ গজাবে না।

সার প্রয়োগ : পাটের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাণমতো জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে পাটের ফলন সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। পাটের জমিতে সঠিক নিয়মে জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার পরিমাণে কম লাগবে। তবে মাটিতে দস্তা ও গন্ধকের অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পর সার প্রয়োগ : জমি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ও-৯৮৯৭ জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় শতক প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ও-৯৮৯৭ জাতের বেলায় শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কিছু পরিমাণ শুকনো মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে 'হো' বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন গাছের কচি পাতা ও ডগায় প্রয়োগকৃত সার না লাগে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে।

বীজ শোধন : বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেওয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে রিডোমিল বা ক্যাপটান ৭৫% বালাইনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া উচিত।

বীজ বপনের সময় : সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুনলে গাছে অসময়ে ফুল আসে এবং ফলন কম হয়, পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাতভেদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি ও বীজ হার : জমিতে পাট বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে এ দুই উপায়ে বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০ সেমি আবার ছিটানো পদ্ধতিতে বুনলে বীজ বেশি লাগবে। বীজ যেন মাটির খুব গভীরে বোনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে "জো" আসলে বীজ বুনতে হবে।

বীজ বপনের পর পরিচর্যা

চারা পাতলা করণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ঘন চারা থেকে দুর্বল চারাগুলো উঠিয়ে এবং সাথে সাথে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয় বার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে এবং শেষবার ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা : পাটের জমিতে খরা দেখা দিলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে তাকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড় দমন : পাট ক্ষেতে বিছা পোকা, উরচুঙ্গা, চেলে পোকা, ঘোড়া পোকা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি পোকার নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) বিছা পোকা

লক্ষণ : কচি ও বয়স্ক সব পাতাই খেয়ে ফেলে। স্ত্রী মথ পাটের পাতার উল্টা পিঠে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাচ্চাগুলো পাতার উল্টা দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে। পরে এরা সব গাছে ছড়িয়ে পড়ে। দলবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মতো করে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতাগুলো দূর থেকেই সহজে দৃশ্যমান হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি ডগাও খেয়ে ফেলে।

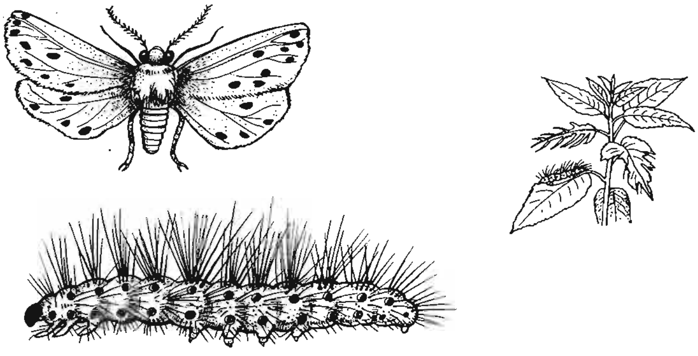

চিত্র : বিছা পোকা ও পাটগাছ।

দমন পদ্ধতি

- পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে গাদাসহ পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন ডিম থেকে বের হওয়া কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে, তখন পোকাসহ পাতাটি তুলে পায়ে পিষে, গর্তে চাপা দিয়ে অথবা অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।
- পাট কাটার পর শুকনো জমি চাষ করলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা পুত্তলিগুলো বের হয়ে আসে যা পোকাখাদক পাখি খেয়ে ফেলে।
- বিছা পোকা যাতে আক্রান্ত ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়াতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত ক্ষেতের চারদিকে প্রতিবন্ধক নালা তৈরি করে অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানি নালায় রাখতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) উরচুঙ্গা

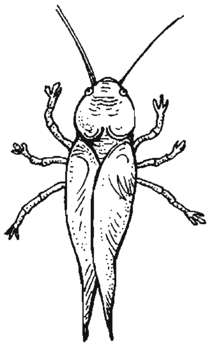

উরচুঙ্গা

লক্ষণ

জমিতে গর্ত করে দিনের বেলায় গর্তে বসবাস করে এবং সন্ধ্যা বেলায় গর্ত থেকে বের হয়ে চারা পাটগাছের গোড়া কেটে গর্তে নিয়ে যায়। এতে পাট ক্ষেত মাঝে মাঝে গাছশূন্য হয়ে যায়। অনাবৃষ্টির সময় আক্রমণ বেশি হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর আক্রমণ কমে যায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাট গাছের শিকড় ও কাণ্ডের গোড়ার অংশ খায়।

দমন পদ্ধতি

- প্রতিবছর যেসব জমিতে উরচুঙ্গার আক্রমণ দেখা যায় সেখানে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি করে বীজ বপন করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে চারা ৮-৯ সেমি হওয়ার পর ঘন গাছ বাছাই করে পাতলা করতে হবে।
- সম্ভব হলে নিকটস্থ জলাশয় থেকে আক্রান্ত জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমি চাষের সময় নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্তে কীটনাশক প্রয়োগ করে।
- কীটনাশক, বালাইনাশকের বিষটোপ প্রয়োগ করে।

গ) ঘোড়া পোকা

লক্ষণ

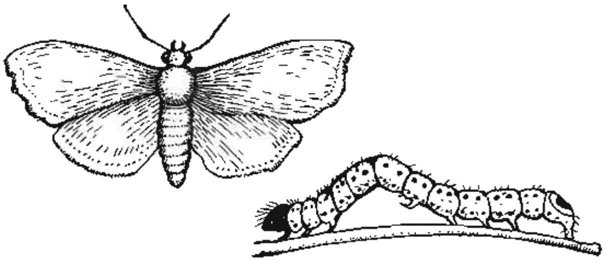

চিত্র : ঘোড়া পোকা

ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমণ করে। ফলে কচি ডগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। ফলে পাটের ফলন ও আঁশের মান কমে যায়।

দমন পদ্ধতি

- পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন ভেজা দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- শালিক বা ময়না পাখি ঘোড়া পোকা খেতে পছন্দ করে। তাই এসব পাখি বসার জন্য পাট ক্ষেতে বাঁশের কঞ্চি এবং গাছের ডাল পুঁতে দিতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

ঘ) চেলে পোকা

লক্ষণ

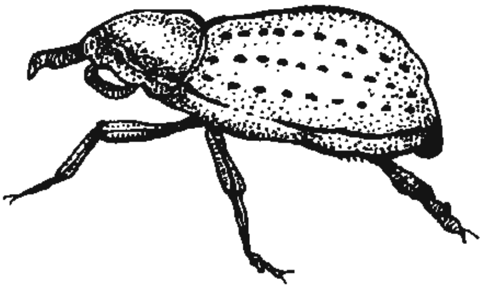

চিত্র : চেলে পোকা

স্ত্রী পোকা চারা গাছের ডগায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা গাছের ভিতরে চলে যায় এবং সেখানে বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মরে যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়। গাছ বড় হলে পাতার গোড়ায় কাণ্ডের উপর ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ফলে ঐ জায়গায় গিটের সৃষ্টি হয়। পাট পচানোর সময় ঐ গিটগুলো পচেনা। আঁশের উপর কালো দাগ থেকে যায়। এতে আঁশের মান ও দাম কমে যায়।

দমন পদ্ধতি

- বীজ বপনের আগে ও পাট কাটার পরে ক্ষেতের আশে পাশে যে সব আগাছা থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত পাট গাছগুলো তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- গাছের উচ্চতা ৫-৬ সেমি লম্বা হওয়ার পর নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) মাকড়

পাটক্ষেতে দুই ধরনের মাকড় দেখা যায়। যথা- হলদে ও লাল মাকড়।

লক্ষণ

হলদে মাকড় কচি পাতায় আক্রমণ করে পাতার রস চুষে খায়। এতে কচি পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং পাতার রং তামাটে হয়ে যায়। হলদে মাকড় ফুলের কুঁড়িকেও আক্রমণ করে। ফলে কুঁড়ি ফুটতে পারে না। ফুলের পাপড়ির রং হলদে থেকে কালচে রঙের হয়ে যায় ও ঝরে পড়ে। এতে বীজের ফলনও কমে যায়। একটানা খরা বা অনাবৃষ্টির সময় এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। লাল মাকড় একটু নিচের পাতা আক্রমণ করে।

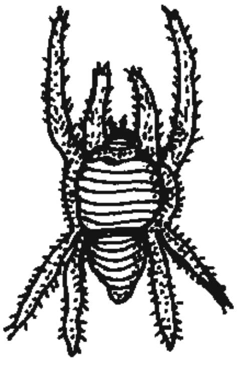

চিত্র : লাল মাকড়

দমন পদ্ধতি

- চুন ও গন্ধক ১ঃ২ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত পাট ক্ষেতে ছিটাতে হবে।
- কাঁচা নিমপাতার রস ২ঃ৫ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

রোগ দমন : পাটে কাণ্ড পচা, কালোপট্টি, গোড়া পচা, শুকনা ক্ষত, ঢলে পড়া, ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) **কাণ্ড পচা রোগ :** লক্ষণ : পাতা ও কাণ্ডে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোনো অংশে দেখা দিতে পারে। দাগগুলোতে অসংখ্য কালো বিন্দু দেখা যায়। এ কালো বিন্দুগুলোতে ছত্রাক জীবাণু থাকে। কখনো কখনো আক্রান্ত স্থানে গোটা গাছই ভেঙে পড়ে। কেনাফ ও মেস্তা পাটে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

খ) **কালো পট্টিরোগ :** এ রোগের লক্ষণ প্রায় কাণ্ড পচা রোগের মতোই। তবে এতে কাণ্ডে কালো রঙের বেষ্টনীর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থানে ঘষলে হাতে কালো গুঁড়ার মতো দাগ লাগে। এ রোগে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

গ) **শুকনা ক্ষত :** এ রোগটি শুধু দেশি জাতের পাটেই দেখা যায়। চারা অবস্থায় আক্রমণ করলে চারা মারা যায়। বড় গাছের কাণ্ডে কালচে দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় এবং ক্ষতস্থানে জীবাণু সৃষ্টি হয়। এ জীবাণুগুলো বাতাসে উড়ে ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফল কালো ও আকারে ছোট হয়। এ রোগে গাছ মরে না, তবে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়। তাই পাট পচানোর পরেও আক্রান্ত স্থানের ছাল পাট কাঠির সাথে লেগে থাকে। এর আঁশ নিম্নমানের হয়।

প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা : কাণ্ড পচা, কালোপট্টি ও শুকনা ক্ষত এ তিনটি রোগই বীজ, মাটি ও বায়ুবাহী। এদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও একই রকমের। যেমন :

- পাট কাটার পর জমির আগাছা, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত গাছের গোড়া উপড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হবে।
- নীরোগ পাট গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমি থেকে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

পাট-কাটা ও আঁটি বাঁধা

সঠিক সময়ে পাট না কাটলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তোষা পাট কাটতে হয়। গাছে ফুল আসলে বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। তাই পাট গাছ কাটার পরই এ সমস্ত গাছকে আলাদা করে প্রায় ১০ কেজি ওজনের আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার পর সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমিতেই স্তূপ করে রাখলে গাছের পাতাগুলো ঝরে যাবে। পাতাগুলো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাটের পাতা ভালো সার।

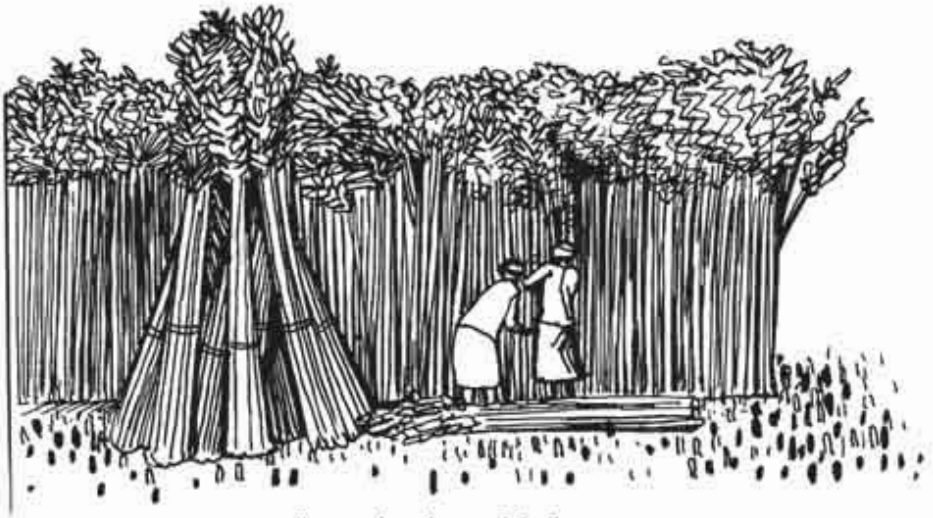

চিত্র : পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা।

পাট জাগ দেওয়া

প্রথমে ১০-১৫ টি আঁটি একদিকে গোড়া রেখে তারপর উল্টা দিকে গোড়া রেখে আরও আঁটি পানির উপর সাজাতে হবে একেই পাটের জাগ বলে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপর ৩০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০টি আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পচে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়। পাট জাগ দেওয়ার জন্য বিল, খাল বা নদীর মৃদু স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানি সর্বাপেক্ষা উত্তম।

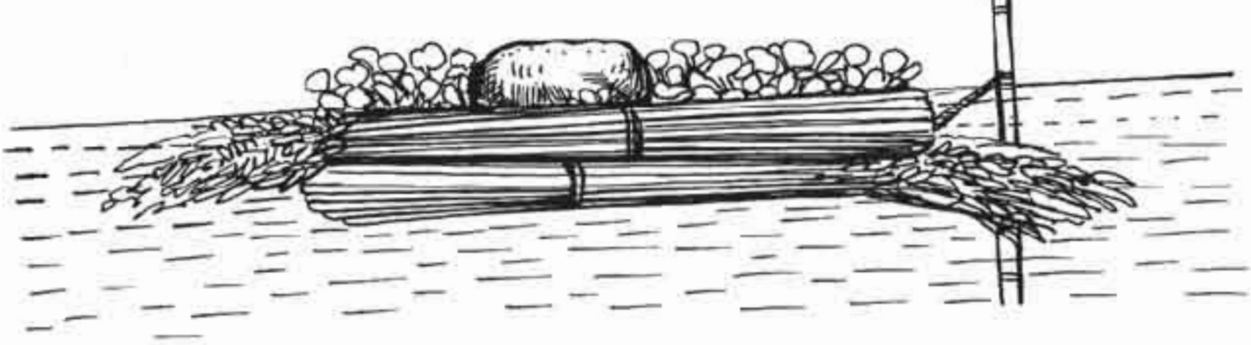

চিত্র : পাট জাগ দেওয়া।

জাগ ডুবানোর জন্য মাটির ঢেলা, কলাগাছ, আমগাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে আঁশের রং কালো হয়। বাঁশের খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে, কিংবা পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে জাগ ডুবানো যায়। জাগ ঢাকার জন্য কচুরিপানা, ধানের খড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাট পচনের সময় নির্ধারণ

পাট গাছের আঁটি পানিতে ডুবানোর ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে যদি সহজে ছাল তথা আঁশ পৃথক করা যায় তবে বুঝতে হবে পাট গাছের পচন শেষ হয়েছে। গরম আবহাওয়ায় ১২-১৪ দিন এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ২০-২৫ দিনের মধ্যেই পাট পচে যায়।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ

পচার পর গাছ থেকে দুইভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়। যথা-

১) পানি থেকে প্রতিটি আঁটি উঠিয়ে এবং শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি গাছ থেকে আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কতকগুলো পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে নেওয়া হয়।

২) হাটু বা কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুগুর দ্বারা পিটানো হয়। পরে গোড়ার অংশ হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে প্রখর সূর্যালোকে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেওয়ার পর সুন্দর করে আঁটি বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশি পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়।

বাংলাদেশের পাট ফসলের গুরুত্ব

পাট একটি আঁশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে সোনালি আঁশ বলে অভিহিত করা হয়। পাট ফসলটি যে সময়ে জন্মায় সে সময় বৃষ্টি থাকে। তাই সেচের দরকার হয় না। পাট ফসলটি খরা ও জলাবদ্ধতা দুটোই সহ্য করতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের যে সব এলাকায় সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং যেখানে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জমিতে পানি জমে থাকে, সেখানে ধানের চেয়ে পাট চাষ বেশি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার হেক্টর জমি আছে যেখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল চাষ সম্ভব নয়। খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে পাট অন্যান্য ফসলের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে দেশি ও তোষা এ দুই জাতের পাটের চাষ হয়। তবে দেশি জাতের তুলনায় তোষা জাতের পাটের চাষ বর্তমানে বেশি হচ্ছে। এর কারণ হলো পূর্বে যে সব এলাকায় দেশি পাটের চাষ হতো, তা ছিল নিচু এলাকা। বর্তমানে খাদ্য শস্যের চাহিদার জন্য ঐ সমস্ত এলাকা ধান চাষের আওতায় চলে গেছে। পাট চলে গেছে তুলনামূলকভাবে উঁচু ভূমি এলাকায় যেখানে বৃষ্টি নির্ভরতা বেশি। যাহোক পাট ফসল শুধু আঁশ হিসাবেই নয়, কৃষিজাত শিল্পে, ঔষধি শিল্পে, পরিবেশ সংরক্ষণে ও সবজি হিসাবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সরিষার চাষ

বাংলাদেশে তেল ফসল হিসাবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এ দেশের মানুষ সরিষাকেই প্রধান ভোজ্য তৈল বীজ ফসল হিসাবে বেশি চাষ করে থাকে।

নিম্নে সরিষা চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

জমি নির্বাচন

সরিষা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ অথবা পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতএব, সহজে পানি নিকাশ করা যায় এরূপ বেলে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচন

অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিম্নে সরিষার অনুমোদিত কতকগুলো জাতের নাম, যেমন- টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, সম্পদ, রাই সরিষা, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬।

বপনের সময়

বাংলাদেশে সরিষা শীতকালীন ফসল। বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির "জো" অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস (অক্টোবর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৬ এর বীজ আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

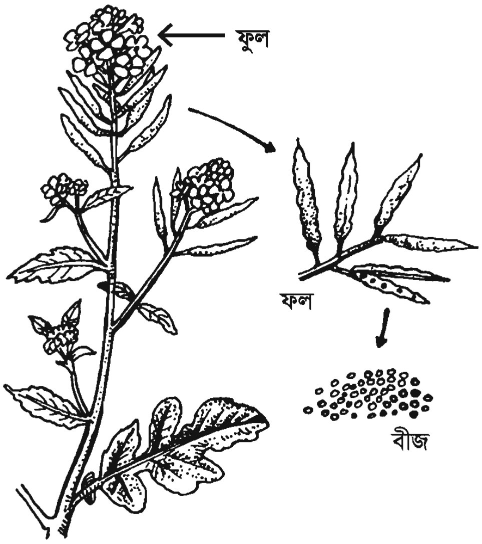

চিত্র : ফুল ও বীজসহ সরিষা গাছের ডাল।

জমি তৈরি

জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী মাটির 'জো' অবস্থায় ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিধায় ঢেলা ভেঙে মই দিয়ে মাটি সমান ও মিহি করতে হবে। জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রয়োজনে সেচ এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সরিষার জমিতে কমপোস্ট সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট, বোরাক্স/বোরিক এসিড ইত্যাদি সার সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হয়।

ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজের হার

সরিষার জাত টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর জন্য প্রতি শতকে ২৮-৩২ গ্রাম বীজ লাগে।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছোট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোনো একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ

ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোনো জায়গায় গাছ ঘন এবং কোনো জায়গায় পাতলা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সারি করে সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সেমি রাখা হয় ও প্রতি সারিতে ৪-৫ সেমি দূরত্বে এবং ২-৪ সেমি গভীরতায় বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ সরিষা ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং সরিষা ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা

সরিষার জমিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিচর্যা করা হয়।

১) **পানিসেচ :** মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত থাকলে সরিষার জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতা বুঝে ২-৩ টি সেচ দিলে বেশ ভালো ফলন হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ গাছে ফল হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের পূর্বে যদি মাটি শুষ্ক থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

২) **গাছ পাতলাকরণ :** চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। জমির কোথাও চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।

৩) **আগাছা দমন :** সরিষার জমিতে আগাছা দেখা মাত্র নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আগাছা দমন করা যায়। যে সব জমিতে অরোবাংকির আক্রমণ দেখা যায় সে সব জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাষ না করাই ভালো।

৪) **রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন :** সরিষা ফসলের প্রধান রোগ অল্টারনারিয়া ব্লাইট বা পাতায় দাগ পড়া রোগ অন্যতম। এ রোগ দেখা দিলে গাছের পাতায় প্রথমে বাদামি পরে গাঢ় রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে প্রতিরোধ হিসাবে সঠিক নিয়মে বপন করা দরকার।

৫) **পোকা মাকড় দমন :** সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা। বাচ্চা ও পরিণত জাব পোকা সরিষার কাণ্ড, পাতা, পুষ্পমঞ্জুরি, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফল কুঁচকে ছোট হয়ে যায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি মাসে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে সরিষার ক্ষেতে ছিটাতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ সরিষার ফল খড়ের রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা হলদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উত্তম। মূলসহ গাছ টেনে তুলে অথবা কাঁচির দ্বারা কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে টেনে তোলাই ভালো।

ফসল মাড়াই

ফসল সংগ্রহের পর ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। কিছু কিছু অপুষ্ট বীজ থাকতে পারে। অপুষ্ট বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

মাড়াই করার পর বীজ ঝেড়ে রোদে ভালোভাবে ৩-৪ দিন শুকিয়ে নেওয়ার পর শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়। রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিক পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে।

ফলন

বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি শতকে প্রায় ৩ থেকে ৩.৫ কেজি।

সরিষা ফসলের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ৩ প্রকার সরিষার চাষ হয়। যথা- টরি, শ্বেত ও রাই। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৪০% আমিষ এবং ৬৪% নাইট্রোজেন থাকে। সরিষার খৈল গরু, মহিষের জন্য খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট জৈব সার। এছাড়া রান্নার কাজে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদও বলা হয়। কাজেই অর্থনৈতিক, ঔষধশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সরিষা ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরিষা ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

মাসকলাই চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশে মোট উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকলাই একটি শক্ত ও খরা-সহিষ্ণু ফসল যা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ডাল হিসাবে ছাড়াও এটি কাঁচাগাছ অবস্থায় পশুখাদ্য ও সবুজ সার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কাজেই ডাল ফসল হিসাবে মাসকলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা মাসকলাই এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

জমি নির্বাচন

সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। উঁচু থেকে নিচু সব ধরনের জমিতে মাসকলাই চাষ করা যায় যদি পানি জমে থাকার আশঙ্কা না থাকে। মাসকলাই উষ্ণ ও শুকনো জলবায়ুর ফসল।

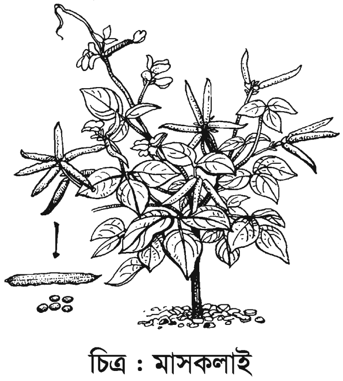

চিত্র : মাসকলাই

জাতসমূহ

বাংলাদেশে চাষকৃত মাসকলাইয়ের বেশ কিছু উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। নিচে মাসকলাই এর কয়েকটি জাতের নাম দেওয়া হলো :

ক) উফশী জাত : পান্থ, শরৎ, হেমন্ত, বিনা মাস-১, বিনা মাস-২
খ) স্থানীয় জাত : রাজশাহী, সাধুহাটি

জমি তৈরি

মাসকলাই চাষের জন্যে খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময়

মাসকলাই বীজ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

বীজ হার: নিচে মাসকলাই চাষের জন্য বীজ হার দেওয়া হলো :

উদ্দেশ্য	বপন পদ্ধতি	বীজ হার (গ্রাম/শতক)
বীজের জন্য	ছিটিয়ে	১৪০-১৬০
	সারিতে	১০০-১২০
পশুখাদ্য বা সবুজ সারের জন্য	ছিটিয়ে	২০০-২৪০

বীজ বপন পদ্ধতি

মাসকলাইয়ের বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করা যায়। তবে বীজের জন্য সারিতে বপন করা ভালো। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হয়। সারিতে বীজগুলো অবিরতভাবে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ বপন করা হয়। ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ শোধন

বীজ বাহিত রোগ দমনের জন্য বীজ শোধন করে বপন করা দরকার।

সার ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই চাষে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	১৬০-১৮০
টিএসপি	৩৪০-৩৮০
এমওপি	১২০-১৬০
অণুবীজ সার	১৬-২০

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে। জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের দরকার হয় না। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ সার প্রয়োগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ মাসকলাই ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং মাসকলাই ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

- চারা গজানোর পরে আগাছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বপনের পর জমিতে রসের পরিমাণ কম বা অভাব হলে হালকা সেচ দিতে হবে।
- সেচের পর 'জো' অবস্থায় মাটির উপরের শক্ত স্তর ভেঙে দিতে হবে।
- ফসলের জমিতে পোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক) মাসকলাইয়ের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

সারকোস্পোরা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। অধিক আর্দ্রতা ও উচ্চতাপে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের কোষসমূহ শুকিয়ে যায় এবং পাতা ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধী জাতের (পান্থ, শরৎ ও হেমন্ত) মাসকলাই চাষ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা যায়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

পাতার উপর পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। হাতে স্পর্শ করলে পাউডারের গুঁড়ার মতো লাগে।

প্রতিকার

বিকল্প পোষক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। টিল্ট বা থিওভিট প্রয়োগ করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ ও বিস্তার

মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

রোগের লক্ষণ

কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

প্রতিকার

রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকলাইয়ের চাষ করতে হবে।

পোকা ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই ফসলে বিছা পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ পোকা পাতা, অপরিপক্ব সবুজ ফলের রস খেয়ে ফেলে। পাতাসহ সমস্ত গাছ সাদা জালিকার মতো হয়ে যায়। ফলে ফলন কমে যায়। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে হাত দ্বারা সেগুলোকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে পরিমাণ মতো সাইপারমেথ্রিন ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া গুদামজাত মাসকলাই ডাল পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। গুদামজাত করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দানা শুকিয়ে দানার আদ্রর্তা ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টনপ্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ

খরিপ-১ মৌসুমে মে মাসের শেষ এবং খরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব হলে সকালের দিকে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একবার বা ২-৩ বার ফসল সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম দিকে পরিপক্ব ফল হাত দিয়ে এবং শেষবারের বেলায় কাঁচি দিয়ে গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হবে।

ফলন

জাত ভেদে মাসকলাইয়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই ফসলের পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

আমরা শাকসবজি প্রতিনিয়তই ফসলের জমিতে, বাগানে, হাটে বাজারে দেখতে পাই। আমরা এগুলো নিজের জমি থেকে বা বাজার থেকে সংগ্রহ করে শাকসবজির চাহিদা পূরণ করে থাকি। এবার আমরা এসব শাকসবজির চাষ সম্পর্কে জানব। তবে চাষ পদ্ধতি জানার আগে শাকসবজির গুরুত্ব ও শাকসবজি চাষের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

১) শাকসবজির গুরুত্ব

শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করে একদিকে পারিবারিকভাবে চাহিদা মেটানো যায় এবং অন্য দিকে উদ্বৃত্তগুলো বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করা যায়। কাজেই খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ ও অর্থকরী ফসল হিসাবে শাকসবজি চাষ করা খুবই জরুরি।

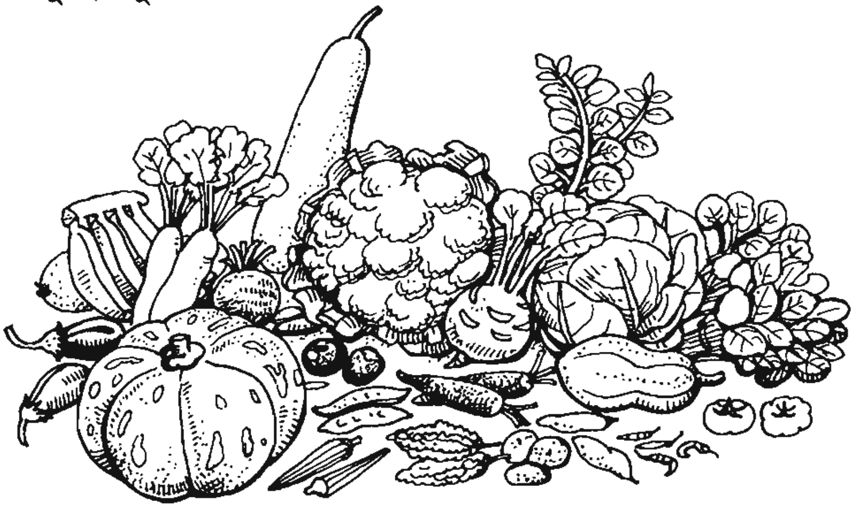

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি।

খাদ্য হিসাবে শাকসবজি

১.১. খাদ্য মান হিসাবে : শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি থাকে। এ ছাড়া আমিষ, ক্যালরি ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসাবেও শাকসবজির গুরুত্ব অনেক।

১.২. ভেষজ গুণাগুণ হিসাবে শাকসবজি : শাকসবজির ভেষজ গুণাগুণ হিসাবে অনেক অবদান রয়েছে। যেমন- শশা হজমে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার কাজ করে। রসুনে বাত রোগ সারে ইত্যাদি।

১.৩. অর্থনৈতিক দিক থেকে শাকসবজি : মানবদেহের জন্য শাকসবজি অত্যাবশ্যক। সুস্থ ও সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই শাকসবজি উৎপাদনে একদিকে পরিবারের চাহিদা মেটানো যায় অন্যদিকে এগুলো বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। শাকসবজি চাষ করে পতিত জমির ব্যবহার করা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে এবং মহিলা ও পারিবারিক শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

২. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজির চাষাবাদ হয়। উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে এসব শাকসবজিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) শীতকালীন শাকসবজি (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (৩) বারমাসি শাকসবজি। যেমন :

শীতকালীন সবজি : টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, গাজর ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন সবজি : করলা, ঝিঙা, পটল, ধুন্দুল, পুঁইশাক ইত্যাদি।

বারমাসি সবজি : বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে, কাঁচকলা ইত্যাদি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শীত, গ্রীষ্ম ও বারমাসি শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

শিম, টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। বর্তমানে দুই একটি জাত বের হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। গিমা কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং খিরা মিলিয়ে শসা জাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায়। তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

৩. শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন শাকসবজির নাম এবং কোনগুলো কোন মৌসুমে জন্মায় তা জেনেছি। এবার শাকসবজি উৎপাদনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে জেনে নেই।

কোনো ফসল তথা শাকসবজি চাষ বা উৎপাদন করার পূর্বে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভালো বীজ, বীজতলার জমি নির্বাচন ও তৈরি, বীজ বপন ও বীজতলার যত্ন, মূল জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন ও রোপণ, পানি সেচ ও নিকাশ, আগাছা দমন ও মালচিং, পোকামাকড় দমন, রোগ দমন ও সময়মতো ফসল সংগ্রহ।

৪. শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

শাকসবজি চাষাবাদের বেশ কিছু পদ্ধতি দেশে বিদেশে চালু আছে। এগুলোর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি হলো পর্যায় ক্রমিক চাষ পদ্ধতি, মিশ্র ফসল পদ্ধতি, রিলে ফসল পদ্ধতি, ফালি ফসল পদ্ধতি, সারিতে ফসল চাষ পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকটি শাকসবজির চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পালংশাক চাষ

পালংশাক বেশ জনপ্রিয়, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু পাতা সবজি। এ সবজি অধিক ভিটামিন সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

পালংশাকের জাত : পুষা জয়ন্তী, কপি পালং, গ্রিন, সবুজ বাংলা ও টকপালং। এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, পুষ্প জ্যোতি ইত্যাদি।

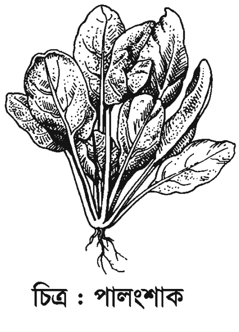

চিত্র : পালংশাক

মাটি

দোআঁশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী। এছাড়াও এঁটেল, বেলে-দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মিহি করে তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আইল নির্বাচন ও তৈরি

জমিতে আইল তৈরি করেও পালংশাক চাষ করা যায়। উঁচু আইল পালংশাকের জন্য নির্বাচন করা হয়। উঁচু আইলে কিছুটা আগাম পালংশাক বীজ বপন করা যায়। কোদাল দিয়ে আইলের মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পালংশাকের জমিতে নিয়ম অনুযায়ী গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের হার

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৩৫-৪০ গ্রাম	১১৭ গ্রাম	৯-১১ কেজি	২৫-৩০ কেজি

বীজ বপনের সময়

সেপ্টেম্বর- জানুয়ারি মাস।

বীজ বপনের দূরত্ব

১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়।

অঙ্কুরোদগমের সময়

বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : জমিতে আইলে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে সে চারা রোপণ করেও পালংশাক চাষ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং পালংশাক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা

আগাছা নিধন

জমিতে আগাছা দেখা দিলেই তা তুলে ফেলতে হবে।

সার উপরিপ্রয়োগ

সময় মতো নিয়মানুযায়ী সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

এ শাকের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপণের পর হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

শূন্যস্থান পূরণ

কোনো স্থানের চারা মরে গেলে অথবা বীজ না গজালে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপণ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ

গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বেশি দিন রস ধরে রাখা এবং মাটিতে যাতে সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবার পানি সেচের পর আইল/জমির উপরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলা করণ

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড়

পালংশাকে মাঝে মাঝে পিপীলিকা, উরচুঙ্গা, উইপোকা এবং পাতাছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

পালংশাকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে- ১) গোড়া পচা রোগ ২) পাতার দাগ রোগ ৩) পাতা ধ্বসা রোগ। এছাড়া পালংশাকে আরও দুইধরনের রোগ দেখা যায়। যেমন- ডাউনি মিলডিউ, পাতায় গোলাকৃতির দাগ।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের এক মাস পর থেকে পালংশাক সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং গাছে ফুল না আসা পর্যন্ত যে কোনো সময় সংগ্রহ করা যায়।

ফলন

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৮-১০ কেজি	২৮-৩৭ কেজি	২৮০০-৩৮০০ কেজি	৭-৯ টন

পুঁইশাক

পুঁইশাক বাংলাদেশের প্রধান গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুঁইশাক সাধারণত বসতবাড়ির আঙিনার বেড়ায় বা মাচায় জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

জাত : পুঁইশাকের দুইটি জাতের চাষ হয়ে থাকে। যথা- ক) লাল পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড লালচে। খ) সবুজ পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড সবুজ।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি জাত আছে। যেমন বারি-১, বারি-২।

জমি তৈরি

সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাস পুঁইশাক লাগানোর ভালো সময়। তবে সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্গুন মাস হতেই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপণের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা করে তৈরি করে নিতে হবে। এ সবজি চাষের জন্য উর্বর বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি উত্তম।

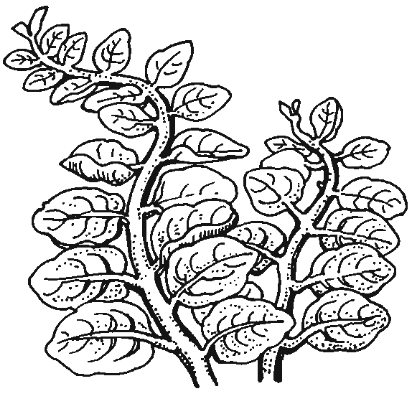

চিত্র : পুঁইশাক

সার প্রয়োগ

পুঁইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো। এতে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুঁইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণ

মার্চ-এপ্রিল মাসে পুঁইশাকের বীজ বপন করতে হয়। বীজ ও শাখা কলম দিয়ে পুঁইয়ের চাষ করা যায়। তবে বীজ দিয়ে চারা তৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুঁইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি দূরে দূরে সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। বর্ষার সময় পুঁইশাকের লতার কিছু অংশ কেটে মাটিতে রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা

নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পোকামাকড়

এ শাকের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে শুঁয়োপোকা উল্লেখযোগ্য। এ পোকা গাছের পাতা, কচি ডগা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুঁইশাকের ডগা লম্বা হতে শুরু করলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কয়েকবার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভালোভাবে চাষ করলে প্রতি শতকে ১৩০-১৫০ কেজি পুঁইশাকের ফলন পাওয়া যায়।

বেগুন চাষ

বেগুন অতি পরিচিত একটি সবজি। যা সারা বছর পাওয়া যায়। এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসহ অনেক দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

জাত

ইসলামপুরী, শিংনাথ, উত্তরা, নয়নকাজল, মুক্তকেশী, খটখটিয়া, তারাপুরী, নয়নতারা উল্লেখযোগ্য। বারমাসী কালো ও সাদা বর্ণের জাত (ডিম বেগুন) রয়েছে। বিদেশি জাতের মধ্যে ব্ল্যাক বিউটি, ফ্লোরিডা বিউটি, উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য চৈত্র মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বালি, কমপোস্ট ও মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়।

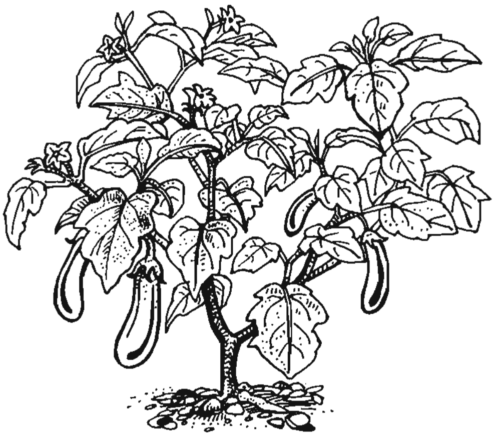

চিত্র : বেগুনসহ বেগুনগাছ

জমি নির্বাচন

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে পানি অপসারণের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এঁটেল ও দোআঁশ মাটিতেও বেগুনের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে তুলে নিতে হবে। চারাগাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর ৭৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং বেগুন চাষ পদ্ধতির উপর একটি দলীয় প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

পরিচর্যা

মাটিতে রসের অভাব হলে বা মাটি শুকিয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

বেগুনের বালাই ব্যবস্থাপনা

এ দেশে কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির পোকা এবং একটি প্রজাতির মাকড় বেগুন ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা। এই পোকা বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্র করে। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কীটনাশকের যে কোনো একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের বালাই দমন করা যায়-

ক) কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উইল্টরোগ দমন করা যায়।

খ) ফেরোমন ও মিষ্টিকুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।

গ) মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেগুন, টমেটো, শশা, বাঁধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।

ঘ) সঠিক সময়ে আগাছা দমন ও মালচিং করলে ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

ঙ) পোকা প্রতিরোধী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা দমন করা যায়। যেমন- বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারিবেগুন-৫ (নয়নতারা), বারিবেগুন-৬, বারিবেগুন-৭ ইত্যাদি পোকা প্রতিরোধী জাত।

চ) পোকার আক্রমণমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে।

ছ) সুষম সার ব্যবহার করে।

জ) শস্যপর্যায় অনুসরণ করে

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। বেগুনের ফল বীজ শক্ত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ১৪০ কেজি বেগুন উৎপন্ন হয়। উত্তরা বেগুন ২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

বিপণন

বেগুন ফসল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা ও খোলা জায়গায় কয়েক দিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বস্তায় বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না। এতে বেগুন তার স্বাভাবিক রং হারাতে পারে এবং পচে যেতে পারে।

কুমড়া চাষ

কুমড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সবজি। এ জাতীয় সবজির কিছু গ্রীষ্মকালীন ও কিছু শীতকালীন জাত আছে যা বাংলাদেশে জন্মায়। আবার কিছু জাত আছে সারা বছরই সংরক্ষণ করে সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়। কুমড়া জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ প্রধান। আমরা এখন মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ সবজিগুলো সম্পর্কে জানব।

ক) মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভূমিকা

মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়। মিষ্টিকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাঘী এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

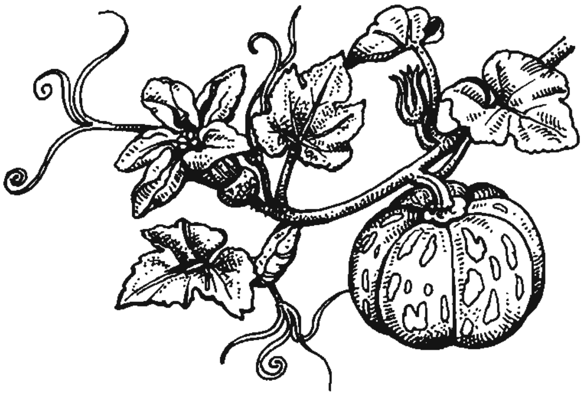

চিত্র : মিষ্টি কুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

চাষের সময়

বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ এবং মাঘী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ ঘন সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে গোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১৩০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও দস্তা সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাদার চারপাশে অগভীর একটি নালা কেটে সার নালার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন

মাদা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি বীজ মাদার মাঝখানে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে চারা গাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। গোড়ার কাছাকাছি কিছু খড় ১৫-২০ দিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। ফল ধরা শুরু করলে ফলের নিচেও খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া মাটিতে হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাপাতা বেশি হলে কিছু লতাপাতা ছেঁটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

কুমড়া জাতীয় গাছের বিভিন্ন পোকার মধ্যে লাল পোকা, কাঁটালে পোকা এবং ফলের মাছি উল্লেখযোগ্য। এ পোকা দমনের জন্য সেভিন ডায়াজিনন প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ জাতীয় সবজির রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিও, ডাউনি মিলডিও ও এনথ্রাকনোজ প্রধান। দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াথেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

মিষ্টিকুমড়া কচি অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কচি অবস্থা থেকেই ফসল সংগ্রহ শুরু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক প্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।

খ) চালকুমড়া চাষ

ভূমিকা

গ্রামবাংলায় ঘরের চালে এ সবজি গাছ উঠানো হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাচায় ফলন বেশি হয়। কচি ফল (জালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপক্ব ফল মোরব্বা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

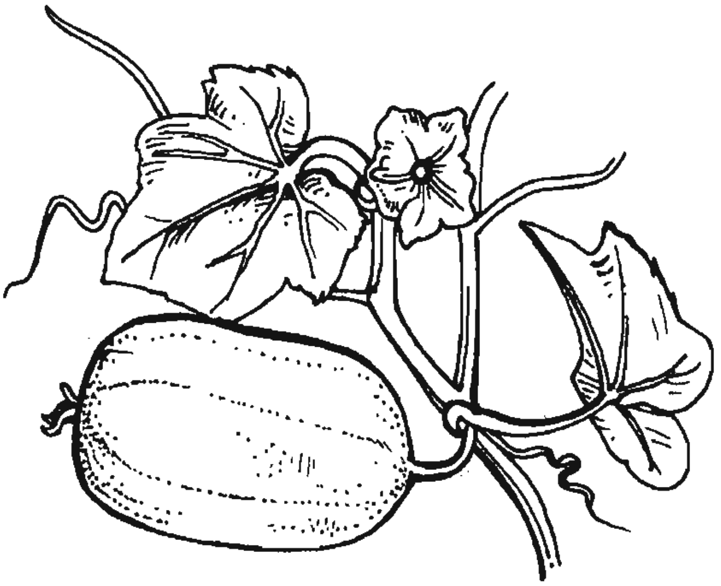

চিত্র : চালকুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

মাটি

দোআঁশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদা মাটি ছাড়া যে কোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময় : ফেব্রুয়ারি-মে

মাদা তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ করে মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। জমিতে মাদার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি, প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি মাদার মাঝখানে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে। পারিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় বোনার পর চারা গজালে তা মাচা, ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেওয়া হয়।

মাদায় সার প্রয়োগ

প্রতি মাদায় গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

মাদায় গর্ত তৈরি

মিষ্টিকুমড়া চাষের নিয়মের অনুরূপ।

মাদার গর্তে বীজবপন

প্রতি মাদায় সারিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা গজানোর কয়েকদিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি সবল গাছ রাখতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করে চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়ার চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে জমা দিবে।

পরিচর্যা

মাদা শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধির জন্য মাচা দিতে হবে। মাদার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলের মাছি পোকা, রেড পামকিন বিটল, ইপিল্যাকনা বিটল, লাল মাকড় প্রভৃতি পোকা ফলের ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাউডারি মিলডিও পাতার উপরে সাদা পাউডার এবং ডাউনি মিলডিউ পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রং প্রভৃতি রোগ পাতার ক্ষতি করে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। ছত্রাক নাশক বা বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

লাউ চাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশে লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউয়ের চেয়ে এর শাক বেশি পুষ্টিকর।

লাউয়ের জাত

বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চোখে পড়ে। ফলের আকার-আকৃতি এবং গাছের লতানোর পরিমাণ থেকেও জাতগুলো পাথর্ক্য করা যায়। যাহোক দেশীয় উন্নত এবং গবেষণালব্ধ কিছু জাতের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক) **দেশীয় জাত :** গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ

খ) **উন্নত জাত :** বারিলাউ ১, বারিলাউ ২

গ) **হাইব্রিড জাত :** গোলাকার বা লম্বা হালকা সবুজ

মাটি

প্রায় অনেক মাটিতেই লাউ ভালো উৎপাদিত হয়। তবে দোআঁশ মাটিতে লাউয়ের ফলন ভালো হয়। বেলে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে সহজে লাউ চাষ করা যায়।

বীজ বপনের সময়

আগস্ট-নভেম্বর

মাটি তৈরি, মাদা তৈরি, মাদায় সার প্রয়োগ ও মাদায় গর্ত তৈরি প্রভৃতি চালকুমড়া চাষের বর্ণনার অনুরূপ।

বীজ বপন

প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হবে।

বাউনি ও মাচা তৈরি

গাছ যখন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা কঞ্চিসহ মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

পরিচর্যা

চারা একটু বড় হলে প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে ঝুরঝুরা করতে হবে। প্রতিদিন লাউগাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিতে হবে।

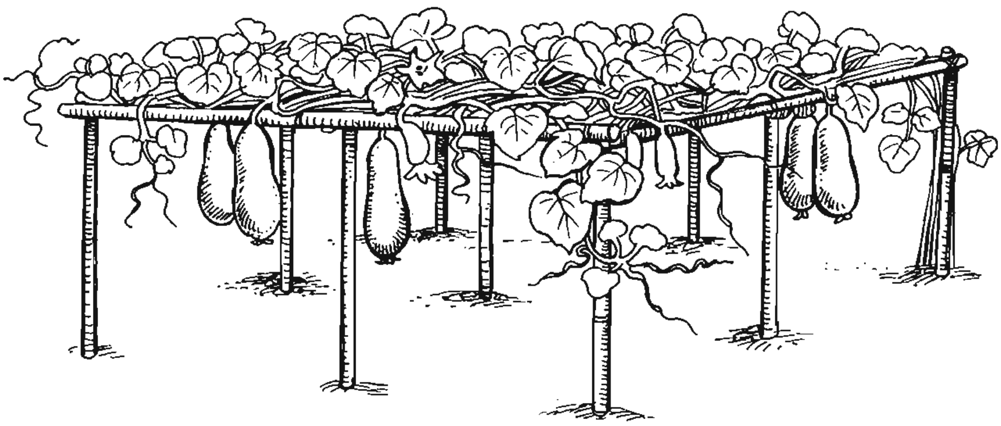

চিত্র : মাচায় লাউসহ লাউগাছ

বালাই ব্যবস্থাপনা

এ সবজিতে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া কিছু প্রজাতির ঘাসের মাধ্যমে লাউয়ের 'মোজাইক ভাইরাস' রোগ হতে পারে।

ফসল সংগ্রহ

ফল তোলা বা সংগ্রহ করার উপযুক্ত পর্যায় হবে যখন-

- ফলের গায়ে প্রচুর শুং এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ডেবে যাবে।
- পরাগায়ণের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

ফলন

বারি লাউ-১ এবং বারি লাউ-২ চাষ করলে যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি/শতক) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

শিম চাষ

শিম বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। এটি শীতকালীন সবজি।

মাটি

দোআঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। তবে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়।

জাত

বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪, ইপসা শিম, ঘৃত কাঞ্চন, কার্তিকা, নলডক, বাঘনখা, বারমাসি প্রভৃতি শিমের জনপ্রিয় জাত।

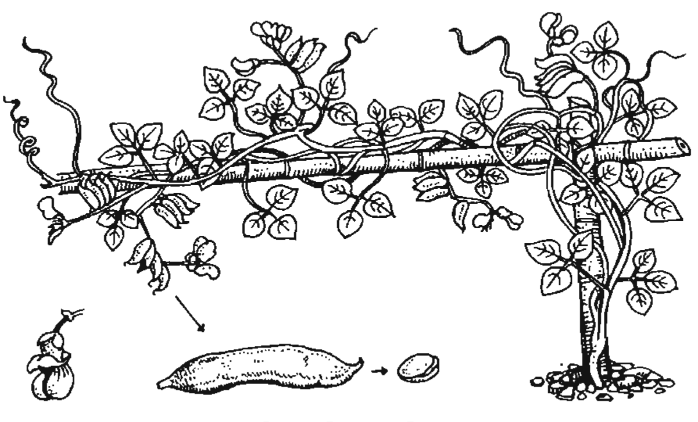

চিত্র : শিমসহ শিমগাছ

বীজ বপনের সময় : মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময় ।

জমি তৈরি

বেশি জমিতে আবাদ করলে জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। তবে বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে সাধারণত শিমের চাষ করা হয় ।

মাদা তৈরি

জমিতে মাদা (গর্ত) ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি আকারে তৈরি করতে হবে। এক মাদা থেকে আরেক মাদার দূরত্ব ২.৫-৩ মিটার ।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি মাদা পচা আবর্জনা সার দিয়ে পূরণ করতে হবে। তারপর প্রতিটি মাদায় খৈল গুঁড়া, ছাই, টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাদাটি এমনভাবে ভরতে হবে যেন মাটি থেকে ভরাটকৃত মাদার উচ্চতা ১০ সেমি হয়। শিম ফসলটিতে নাইট্রোজেন সারের দরকার হয় না। কারণ এটি লিগুম পরিবারের ফসল। এদের শিকড়ে নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে প্রচুর বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

বীজ বপন

সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পরিচর্যা

গাছ ঠিকমতো বাড়ার জন্য মাচা দিতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হলে নিড়ানি দিয়ে তা আলগা করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষায় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সে জন্য গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে ৬০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০ গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

শিম গাছে জাব পোকা, থ্রিপস, পড বোরার ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে। জাব পোকা নতুন ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। নিমের বীজের শাঁস পিসে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এদের দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

জাত ভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম উঠানো যায়। বীজ হিসাবে শিম সংগ্রহ করতে শিম যখন গাছে শুকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সংগ্রহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার ও শুষ্ক পাত্রে নিমের শুকনা পাতার গুঁড়াসহ সংরক্ষণ করতে হবে।

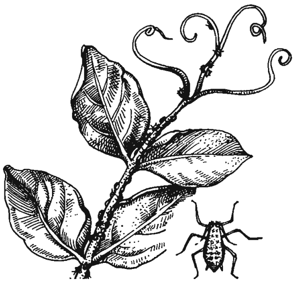

চিত্র : শিম গাছের জাবপোকা ।

ফলন

জাতভেদে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন- বারি শিম-১ জাতের শিমের বীজ হেক্টরপ্রতি ২-৩ টন (৮-১২ কেজি/শতক) উৎপাদিত হয়। সবজি হিসাবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে শিম ধরে। শিম গাছ ৪ মাসেরও বেশি সময় ধরে ফলন দেয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পালং, পুঁই, কুমড়া, শিম ও বেগুনের রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি

ফুলের চাষ

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ হয় না। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি রজনীগন্ধা, গোলাপ ও গ্লাডিওলাসের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বেলি, জুঁই, চামেলি, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, শেফালি, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানা ধরনের ফুল জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এসব ফুলের চাষ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। আমরা এবার শুধু গোলাপ ও বেলি ফুল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

গোলাপ চাষ

গোলাপকে ফুলের রানী বলা হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুজমিতে গোলাপের চাষ হচ্ছে এবং দিন দিন গোলাপের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোলাপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জাত সমূহ

পৃথিবীজুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপি এবং মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রানী এলিজাবেথ (গোলাপি), ব্ল্যাক প্রিন্স (কালো), ইরানি (গোলাপি), মিরিন্ডা (লাল), দুই রঙা ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়।

বংশবিস্তার

গোলাপের বংশ বিস্তারের জন্য অবস্থাভেদে শাখা কলম, দাবা কলম, গুটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ উৎপাদন করে তা থেকে চারা তৈরি করা হয়।

জমি নির্বাচন

গোলাপ চাষের জন্য উর্বর দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করা উত্তম। ছায়াবিহীন উঁচু জায়গা যেখানে জলাবদ্ধতা হয় না, এরূপ জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে।

জমি তৈরি

নির্বাচিত জমি ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল করতে হবে। এরপর মাটি কুপিয়ে ৫ সেমি উঁচু করে ৩ মি x ১ মি আকারের বেড বা কেয়ারি তৈরি করতে হবে। এভাবে কেয়ারি তৈরির পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ সেমি x ৬০ সেমি আকারের এবং ৪৫ সেমি গভীর গর্ত খনন করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন আগে গর্ত করে খোলা রাখতে হবে। এ সময়ে গর্তের জীবাণু ও পোকামাকড় মারা যায়।

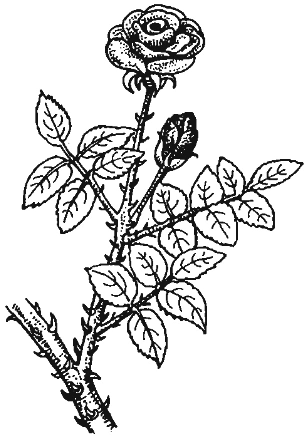

চিত্র : ফুলসহ গোলাপের ডাল

সার প্রয়োগ

প্রতি গর্তের উপরের মাটির সাথে ছকে প্রদত্ত সারগুলো মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর নিচের মাটির সাথে ৫ কেজি পচা গোবর, ৫ কেজি পাতা পচা সার ও ৫০০ গ্রাম ছাই ভালোভাবে মিশিয়ে গর্তের উপরের স্তরে দিতে হবে। এভাবে গর্ত সম্পূর্ণ ভরাট করার পর ১৫-২০ দিন ফেলে রাখলে সারগুলো পচবে ও গাছ লাগানোর উপযুক্ত হবে। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সে জন্য নালা তৈরি করতে হবে।

চারা বা কলম রোপণ

আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পৌষ মাস পর্যন্ত চারা লাগালে বেডের গর্তের মাঝখানে ক্ষুদ্রাকৃতির গর্ত খুঁড়ে চারা লাগাতে হয়। প্রথমে পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টব থেকে চারা বের করে দুর্বল শাখা, রোগাক্রান্ত শিকড় ইত্যাদি কেটে ফেলতে হয়। চারা লাগিয়ে গোড়ায় শক্তভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটি পুতে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগিয়ে গোড়ায় পানি দেওয়া উচিত। ২-৩ দিন ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পরিচর্যা

ক) **আগাছা দমন :** গোলাপের কেয়ারিতে অনেক আগাছা হয়। আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

খ) **পানি সেচ :** মাটির আর্দ্রতা যাচাই করে গাছের গোড়ায় এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন মাটিতে রসের ঘাটতি না হয়।

গ) **পানি নিকাশ :** গোলাপের কেয়ারিতে কোনো সময়ই পানি জমতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গোলাপ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ঘ) **ডাল-পালা ছাঁটাইকরণ (Prunning) :** গোলাপের নতুন ডালে বেশি ফুল হয়। তাই পুরাতন ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রতিবছর গোলাপ গাছের ডালপালা ছাঁটাই করলে গাছের গঠন কাঠামো সুন্দর ও সুদৃঢ় হয় এবং অধিক হারে বড় আকারের ফুল ফোটে।

ঙ) **ফুলের কুঁড়ি ছাঁটাই :** অনেক সময় ছাঁটাই করার পর মূলগাছের ডালে অনেক কুঁড়ি জন্মায়। সবগুলো কুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল তেমন বড় হয় না। তাই বড় ফুল ফোটার জন্য মাঝের কুঁড়ি রেখে পাশের কুঁড়িগুলো ধারালো চাকু দিয়ে কেটে দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ একটি ফুলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ পরিদর্শন শেষে গোলাপ ফুলের চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে যেসব পোকা দেখা যায় তন্মধ্যে রেড স্কেল ও বিটল প্রধান।

ক) **রেড স্কেল :** এ পোকা দেখতে অনেকটা মরা চামড়ার মতো। গরমের সময় বর্ষাকালে এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের বাকলের রস চুষে খায়। ফলে বাকলে ছোট ছোট কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার না করলে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। গাছের সংখ্যা কম হলে দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে ব্রাশ করলে পোকা পড়ে যায়। ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।

খ) **বিটল পোকা :** শীতকালের শেষে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ফুলের পাপড়ি ছিদ্র করে খায়। সাধারণত রাতের বেলা আক্রমণ করে। আলোর ফাঁদ পেতে এ পোকা দমন করা যায়। ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে অনেক রোগ হয়। তন্মধ্যে কালো দাগ পড়া রোগ, ডাইব্যাক ও পাউডারি মিলডিউ প্রধান।

ক) **কালো দাগ পড়া রোগ :** এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। রোগাক্রান্ত গাছের পাতায় গোলাকার কালো রঙের দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে গিয়ে গাছ পত্রশূন্য হয়ে যায়। চৈত্র থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ রোগের আক্রমণ ঘটে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য গাছে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সে দিকে খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

খ) **ডাইব্যাক :** ডাল ছাঁটাইয়ের কাটা স্থানে এ রোগ আক্রমণ করে। এ রোগ হলে গাছের ডাল বা কাণ্ড মাথা থেকে কালো হয়ে নিচের দিকে মরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত কাণ্ড বা ডালের বেশ নিচ থেকে কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের চাকু জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ডাল ছাঁটাই করা উচিত। কর্তিত স্থান স্পিরিট দিয়ে মুছে দিতে হবে।

গ) **পাউডারি মিলডিউ :** এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। শীতকালে কুয়াশার সময় এ রোগের বিস্তার ঘটে। এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতা, কচিফুল ও কলিতে সাদা পাউডার দেখা যায়। ফলে কুঁড়ি না ফুটে নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত ডগা বা পাতা তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া থিওভিট বা সালফার, ডাইথেন এম-৪৫ যে কোনো একটি পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফুল সংগ্রহ

ফুল ফোটার পূর্বেই গাছ হতে ফুল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের পর ফুলের ডাটার নিচের অংশ পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে ফুল ভালো থাকে। মাঝে মাঝে ফুলে পানির ছিটা দেওয়া ভালো।

বেলি ফুল চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুলের তোড়া, ফুলের মালাতে সুগন্ধীফুল হিসাবে বেলির কদর আছে। উৎসব ও অনুষ্ঠানে বেলিফুল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অর্থকরী ফুল।

জাত

তিন জাতের বেলি ফুল দেখা যায়। যথা : ১। সিঙ্গল ধরনের ও অধিক গন্ধযুক্ত। ২। মাঝারি আকার ও ডবল ধরনের। ৩। বৃহদাকার ডবল ধরনের

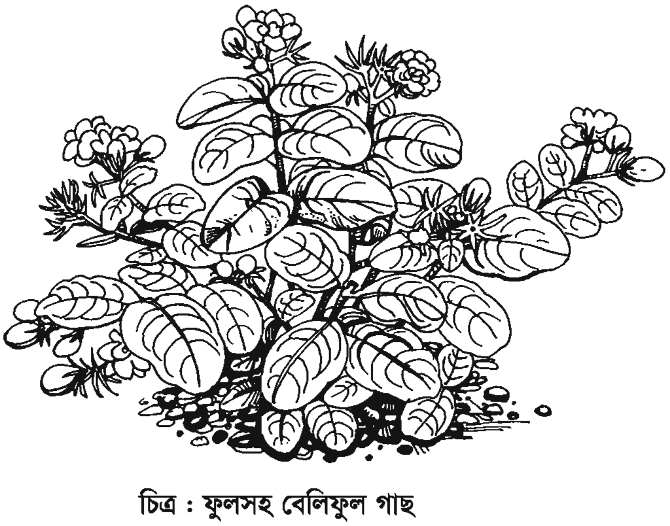

চিত্র : ফুলসহ বেলিফুল গাছ

বংশ বিস্তার : বেলি ফুলে গুটি কলম, দাবা কলম ও ডাল কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়।

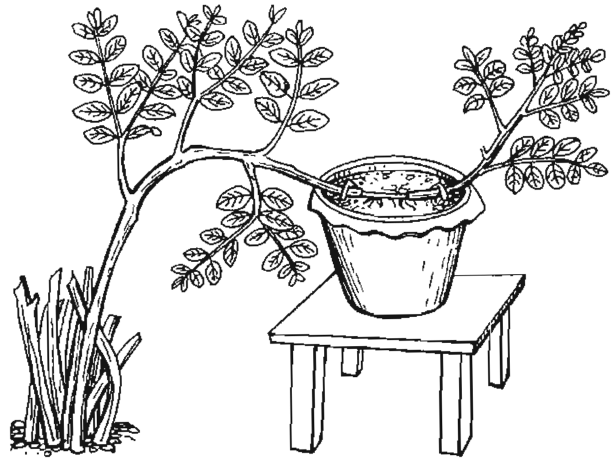

চিত্র : টবে দাবা কলম

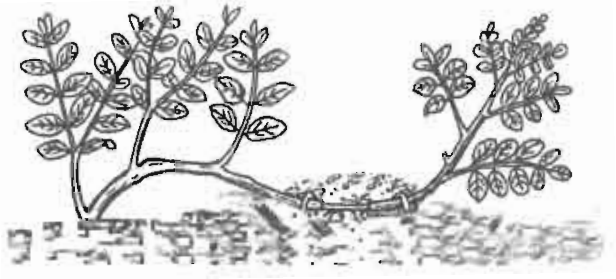

চিত্র : মাটিতে দাবা কলম

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ

বেলে মাটি ও ভারী এঁটেল মাটি ব্যতীত সব ধরনের মাটিতে বেলি ফুল চাষ করা যায়। জমিতে পানি সেচ ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকা ভালো। জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। জমি তৈরির সময় জৈব সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রায় ১ মিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগানোর পর ইউরিয়া প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হবে।

কলম বা চারা তৈরি

গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলি ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে। চারা লাগনোর জন্য গর্ত খুঁড়ে গর্তের মাটি রোদ লাগিয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম বসাতে হবে। বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায়।

টবে চারা লাগানো

জৈব পদার্থ যুক্ত দোআঁশ মাটিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার পরিমাণমতো মিশিয়ে টবে বেলি ফুলের চাষ করা যায়। টব ঘরের বারান্দা বা ঘরের ছাদে রেখে দেওয়া যায়।

পরিচর্যা

ক) **সেচ দেওয়া :** বেলি ফুলের চাষে জমিতে সবসময় রস থাকা দরকার। গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পর পর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর ও বর্ষাকালে বৃষ্টি সময়মতো না হলে জমির অবস্থা বুঝে ২-১ টি সেচ দেওয়া দরকার।

খ) **আগাছা দমন :** জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না।

গ) **অঙ্গ ছাঁটাইকরণ :** প্রতিবছরই বেলি ফুলের গাছের ডাল-পালা ছাঁটাই করা দরকার। শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করতে হবে। মাটির উপরের স্তর থেকে ৩০ সেমি উপরে বেলি ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে। অঙ্গ ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বেলি ফুল গাছে ক্ষতিকারক কীট তেমন দেখা যায় না। তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। এদের আক্রমণে পাতায় সাদা আস্তরণ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে যায়। গন্ধক গুঁড়া বা গন্ধক ঘটিত মাকড়নাশক যেমন- সালট্যাফ, কেলথেন ইত্যাদি পাতায় ছিটিয়ে মাকড় দমন করা যায়।

বেলি ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার ছত্রাক রোগ দেখা যায়। ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফলন

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। ফলন প্রতি বছর বাড়ে। লতানো বেলিতে ফলন আরও বেশি হয়। সাধারণত ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে ফেলে নতুন চারা লাগানো হয়।

কাজ : "গোলাপ ও বেলি ফুলের চাষ করে বেকারত্ব দূর করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব"-এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফলের চাষ

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফল জন্মায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা কলা ও আনারস চাষ সম্পর্কে জানব।

কলা চাষ

কলা বাংলাদেশের সব জেলায়ই কম বেশি জন্মে। তবে নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এসব জেলায় কলার ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে বছরে ছয় লক্ষাধিক টন কলা পাওয়া যায়। কলা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলায় ক্যালরির পরিমাণও বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কলার চাষ হয়ে থাকে। কলা কাঁচা অবস্থায় তরকারি হিসাবে এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে খাওয়া হয়। রোগীর পথ্য হিসাবে কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

কলার জাত

বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশে যেসব কলার জাত চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে অমৃতসাগর, সবরি, চাপা, মেহেরসাগর, কবরী ইত্যাদি। এ ছাড়াও কলার আরও অনেক জাত আছে যেমন : এঁটে কলা, বাঙলা কলা, জাহাজি কলা, কাচঁকলা বা আনাজি কলা ইত্যাদি। তবে বারি কলা-১, বারিকলা-২ ও বারিকলা-৩ নামে তিনটি উন্নত জাত চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বারিকলা-২ জাতটি কাঁচকলার।

কলার উৎপাদন প্রযুক্তি : কলার উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে মাটি ও জমি তৈরি, রোপণের সময় ও চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি।

মাটি ও জমি তৈরি

উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য ভালো। জমিতে প্রচুর সূর্যের আলো পড়বে এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। গভীরভাবে জমি চাষ করে দুই মিটার দূরে দূরে ৫০ সেমি × ৫০ সেমি × ৫০ সেমি আকারের গর্ত খুঁড়তে হবে। চারা রোপণের প্রায় একমাস আগে গর্ত করে গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

বছরে তিন মৌসুমে কলার চাষ করা হয় বা কলার চারা রোপণ করা হয় যথা :

১। আশ্বিন-কার্তিক ২। মাঘ-ফাল্গুন ৩। চৈত্র-বৈশাখ

কলার চারা নির্বাচন

কলার চারাকে তেউড় বলা হয় ।

দুই রকমের তেউড় দেখা যায় । যথা :

১। অসি তেউড় (Sword Sucker)

২। পানি তেউড় (Water Sucker)

১। অসি তেউড় : কলা চাষের জন্য অসি তেউড় উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো । গোড়ার দিকে মোটা এবং ক্রমশ উপরের দিকে সরু হতে থাকে ।

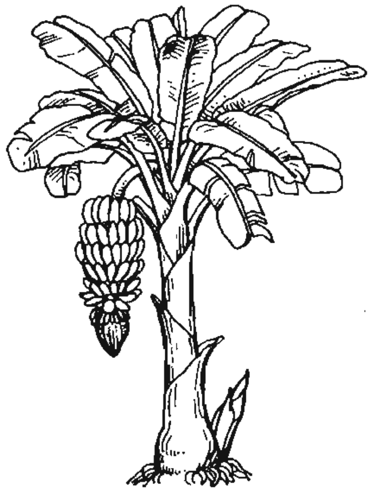

চিত্র : কাদিসহ কলাগাছ

২। পানি তেউড় : পানি তেউড় দুর্বল । এর আগা-গোড়া সমান থাকে । কলা চাষের জন্য এই চারা উপযুক্ত নয় । এ দুই ধরনের চারা ছাড়াও সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থি বা তার ক্ষুদ্র অংশ থেকেও কলা গাছের বংশবিস্তার সম্ভব । তবে এতে ফল আসতে কিছু বেশি সময় লাগে । ফলন্ত ও অফলন্ত দুই ধরনের গাছেরই মূলগ্রন্থি চারা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

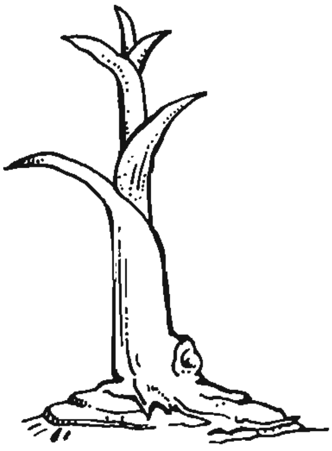

চিত্র : অসি চারা

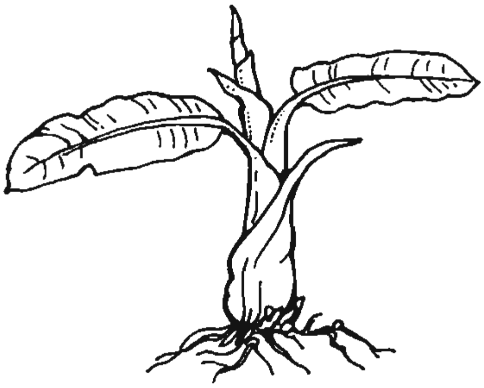

চিত্র : পানি চারা

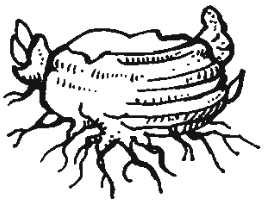

চিত্র : মূলগ্রন্থি

চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য প্রথমত অসি তেউড় বা তলোয়ার তেউড় নির্বাচন করতে হবে। খাটো জাতের ৩৫-৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট গর্তে যাতে প্রয়োজনীয় গোবর ও টিএসপি সার দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে সেখানে চারা লাগাতে হবে । লক্ষ রাখতে হবে যেন চারার কাণ্ড মাটির ভিতরে না ঢুকে ।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কলা গাছে ব্যবহৃত সারের নাম ও গাছ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

সারের নাম	গাছ প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগ করার সময়
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম	চারা রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্ত করে গোবর/ আবর্জনা সার ও ৫০% টিএসপি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ২ মাস পর বাকি ৫০% টিএসপি, ৫০% এমওপি ও ২৫% ইউরিয়া গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর ২ মাস পর বাকি ৫০% এমওপি ও ৫০% ইউরিয়া এবং ফুল আসার সময় বাকি ২৫% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৫০-৪০০ গ্রাম	
এমওপি	২৫০-৩০০ গ্রাম	
গোবর/আবর্জনা সার	১৫-২০ কেজি	

পরিচর্যা

সেচ ও নিকাশ

কলার জমিতে আর্দ্রতা না থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নালা কেটে দিতে হবে। কারণ কলাগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

অতিরিক্ত চারা কাটা

ফুল বা মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় যে তেউড় জন্মাবে তা কেটে ফেলতে হবে। মোচা আসার পর গাছ প্রতি ১টি তেউড় রাখা ভালো।

খুঁটি দেওয়া

কলাগাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

কলাগাছ ফল ও পাতার বিটল পোকা, রাইজম উইভিল, থ্রিপস এসব পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ডায়াজিনন ৬০ ইসি পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

কলা ফল চাষের সময় প্রধানত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যথা-

১। পানামা রোগ
২। সিগাটোগা
৩। গুচ্ছ মাথা রোগ।

১। পানামা রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতা বোঁটার কাছে ভেঙে ঝুলে যায় এবং কাণ্ড অনেক সময় ফেটে যায়। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মরে যায় অথবা ফুল-ফল ধরে না। রোগের প্রতিকার হিসাবে রোগমুক্ত গাছ লাগাতে হবে, রোগক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং প্রতিরোধী জাত রোপণ করতে হবে। এ ছাড়া টিল্ট-২৫০ ইসি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

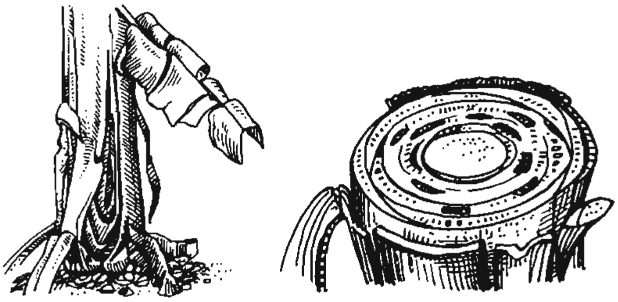

চিত্র : পানামা রোগক্রান্ত কলাগাছ

২। সিগাটোগা : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতা ঝলসে যায় ও সমস্ত পাতা আগুনে পোড়ার মতো দেখায়। ফলে ফল ছোট হয় এবং ফলন কম হয়। রোগের প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

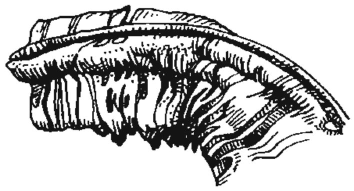

চিত্র : সিগাটোগা রোগাক্রান্ত কলাপাতা

৩। গুচ্ছ মাথা রোগ : এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। জাব পোকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। ম্যালাথিয়ন বা অন্য যে কোনো অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগে জাব পোকা দমন করে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

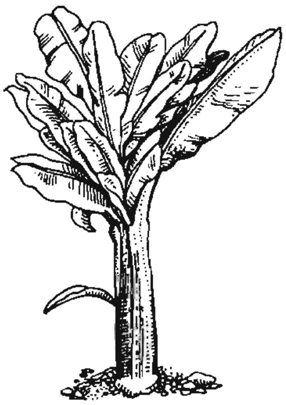

চিত্র : গুচ্ছ মাথা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

কাজ : শিক্ষার্থীরা কলার বিভিন্ন রোগের নাম, রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফসল সংগ্রহ

১। চারা রোপণের পর ১১-১৫ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

২। ধারালো দা দিয়ে কলার ছড়া কাটতে হবে।

ফলন

ভালোভাবে কলার চাষ করলে গাছ প্রতি প্রায় ২০ কেজি বা প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০-৪০ টন কলা উৎপাদিত হবে।

আনারস চাষ

বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে ব্যাপক আনারসের চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও প্রচুর আনারস জন্মে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার (জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি একটি অর্থকরী ফসল। আনারস রপ্তানিপণ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের জাত : বাংলাদেশে আনারসের তিনটি জাত দেখা যায়। যথা : হানিকুইন, জায়েন্ট কিউ ও ঘোড়াশাল।

আনারসের উৎপাদন প্রযুক্তি : আনারসের প্রযুক্তিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো

মাটি ও জমি তৈরি

দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি আনারস উৎপাদনের জন্য ভালো। জমি চাষ ও মই এমনভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল হয় এবং জমিতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে। চারা রোপণের জন্য চাষকৃত জমিতে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে আর এক বেডের দূরত্ব হবে ৫০-১০০ সেমি। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করার জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যা বেশি খাড়া নয়। পাহাড়ের ঢালু জমি কোনোক্রমেই চাষ বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করা যাবে না, শুধু আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে।

চারা নির্বাচন ও তৈরি

আনারস গাছের বংশবিস্তার অঙ্গজ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনারস গাছে সাধারণত চার ধরনের চারা উৎপন্ন হয় যাদেরকে সাকার বা তেউড় বলা হয়। সাকার বা তেউড়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

- ফলের মাথায় দুই ধরনের চারা উৎপন্ন হয়। ফলের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে। আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের হয় তাকে স্কন্ধ চারা বা মুকুট স্লিপ বলে।
- ফলের গোড়া বা বোঁটার উপর থেকে যে চারা বের হয় তাকে বোঁটা চারা বলে।
- বোঁটার নিচে কিন্তু মাটির উপরে কাণ্ড থেকে যে চারা বের হয় তাকে পার্শ্বচারা বা কাণ্ডের কেকড়ি বলে।
- গাছের গোড়া থেকে মাটি ভেদ করে যে চারা বের হয় তাকে গোড়ার কেকড়ি বা ভূঁয়ে চারা বলে। আনারস চাষের জন্য ভূঁয়ে চারা ও পার্শ্বচারা সবচেয়ে ভালো।

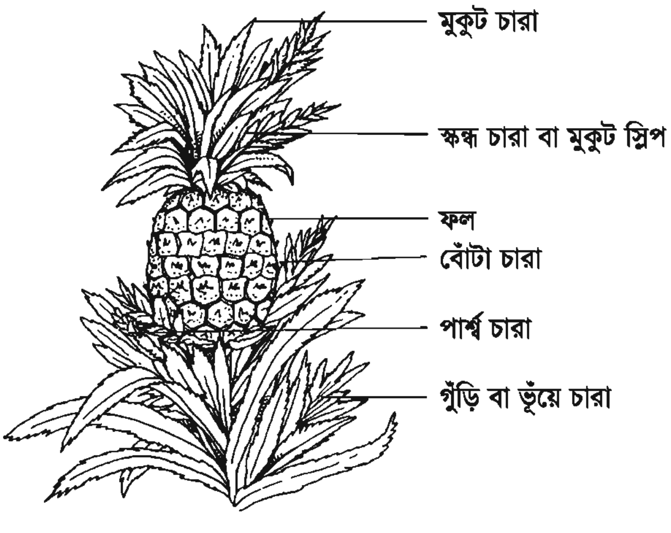

চিত্র : আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা

চারা রোপণ

মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এই এক মাস আনারসের চারা রোপণের সঠিক সময়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা রোপণের সময় আরও এক / দেড় মাস পিছানো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ১। সার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রথম কাজ হলো পরিমাণ নির্ধারণ। আনারসের জন্য গাছ প্রতি নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টিএসপি	১০-১৫
এমওপি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

২। (ক) গোবর, টিএসপি ও জিপসাম বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া ও এমওপি (পটাশ) চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য নালা কেটে দিতে হবে। চারা অতি লম্বা হলে ৩০ সেমি রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আনারস ফসলে তেমন কোনো ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ সহজে আক্রমণ করে না। তাই বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো না।

ফল সংগ্রহ

চারার বয়স ১৫/১৬ মাস হলে মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়ে আনারসের ফুল আসা শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে। গাছ থেকে আনারসের বোঁটা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টরে হানিকুইন ২০-২৫ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদরাসার নিকটস্থ একটি ফলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ পরিদর্শন শেষে আনারস চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছ চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাগুর, পাবদা ও টেংরা মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এরা আঁইশবিহীন ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ যাদের শরীরে আঁইশ নেই এবং মুখে বিড়ালের ন্যায় লম্বা গোঁফ বা শুঁড় আছে তাদেরকে ক্যাটফিশ বলে। প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ বিপর্যয় ও অত্যাধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আবার টেংরা ও পাবদার চাষ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের টেংরা মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গুলশা টেংরার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। নিচে শিং, মাগুর, পাবদা ও গুলশা টেংরার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) শিং ও মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাগুর মাছের পরিচিতি

শিং ও মাগুর মাছের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। এদের দেহ লম্বাটে, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চ্যাপ্টা ও আঁইশ বিহীন এবং মাথার উপর নিচ চ্যাপ্টা। মুখে চার জোড়া শুঁড় ও মাথার দুই পাশে দুইটি কাঁটা আছে। কিন্তু শিং মাছ মাগুর মাছের চেয়ে আকারে ছোট হয় এবং মাথা তুলনামূলক সরু হয়। শিং মাছের পার্শ্বিয় কাঁটা দুইটি বিষাক্ত হয়। এজন্য শিং মাছের কাঁটা খেলে আক্রান্ত স্থানে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব হয়। শিং মাছের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। অন্যদিকে মাগুরের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি খয়েরি ও বড় হলে ধূসর বাদামি হয়। শিং ও মাগুর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলকা ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে। ফলে এরা অল্প অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা পানি ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এজন্য শিং ও মাগুর মাছকে জিওল মাছ বলা হয়। শিং ও মাগুর মাছ সর্বভুক জাতীয় মাছ। এরা জলাশয়ের তলদেশে থাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও পচা জৈব আবর্জনা খায়। এরা বছরে ১ বার প্রজনন করে থাকে। এদের প্রজনন কাল হচ্ছে মে থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুন-জুলাই মাসে এদের সর্বোচ্চ প্রজনন হয়ে থাকে।

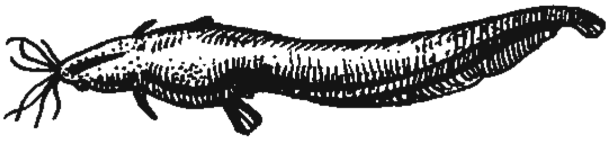

চিত্র: শিং মাছ

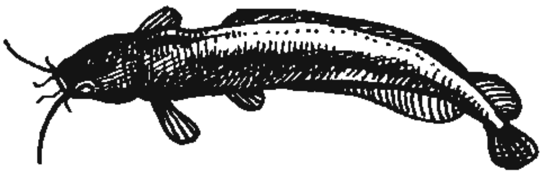

চিত্র: মাগুর মাছ

শিং ও মাগুর চাষের সুবিধা

বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এ মাছ চাষে অধিক মুনাফা লাভ করা যায়। চাষ পদ্ধতি সহজ। যে কোনো ধরনের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও খাঁচাতেও চাষ করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে যেমন-অক্সিজেন স্বল্পতা, পানির অত্যাধিক তাপমাত্রা, এমনকি পচা পানিতেও এরা বেঁচে থাকে। অল্প পানিতে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। রোগবালাই খুব কম হয় ও অধিক সহনশীল। অল্প পানিতে এমনকি পানি ছাড়াও এরা দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে বলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে অল্প সময়েই (৬-৮ মাস) বাজারজাত করার উপযোগী হয়। একক মাছ চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্প মাছ, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের সাথে পুকুরে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব

বড় অনেক প্রজাতির তুলনায় শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এসব মাছে শরীরের উপযোগী লৌহ অধিক পরিমাণে আছে। এসব মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি ও তেল কম থাকে। এজন্য সহজে হজম হয়। অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য পথ্য হিসাবে এসব মাছ সমাদৃত। শিং ও মাগুর মাছ রক্ত স্বল্পতা রোধে ও বল বর্ধনে সহায়তা করে।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

শিং ও মাগুর মাছ চাষের জন্য পুকুর ১-১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। পুকুরের আয়তন ১০ শতক থেকে ৩০ শতক হলে ভালো হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরটির পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুকুরে কচুরিপানা সহ অন্যান্য জলজ আগাছা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। পুকুরে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে, বার বার জাল টেনে বা পুকুরের পানিতে রোটেনন প্রয়োগ করে তা করা যায়। শীতকালে যখন পুকুরের পানি অনেক কমে যায় তখন পুকুর শুকিয়ে ফেলে পুকুর প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করলে ভালো হয়। পুকুর শুকানো হলে তলায় চুন, গোবর বা হাঁসমুরগির বিষ্ঠা, ইউরিয়া, টিএসপি সার প্রতি শতকে নির্ধারিত হারে যথাযথ নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে যদি পানি থাকে তাহলে পানিতেই চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

নেটের বেষ্টনী/বেড়া নির্মাণ

শিং ও মাগুর মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতির সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পুকুরের চারদিকে পাড়ের উপর অন্তত ৩০ সেমি উঁচু করে নেটের বেষ্টনী বা বেড়া নিমার্ণ করা। বেষ্টনী দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এতে করে বৃষ্টির সময় মাছ পুকুরের বাইরে চলে যেতে পারে না। বিশেষত মাগুর মাছকে সামান্য বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়ই "হেঁটে" (গড়িয়ে) পুকুর থেকে বাইরে যেতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেষ্টনী দেওয়ার ফলে মাছের শত্রু যেমন-সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। নাইলনের নেট খুঁটির সাথে বেঁধে পাড়ের চারদিকে ঘিরে দিতে হবে। নেটের নিচের দিক মাটির ভিতর কিছুটা ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে যেন মাটি ও নেটের মাঝে ফাঁক না থাকে। পুকুর শুকানো হলে শুকানোর পর পরই এ কাজ করতে হবে। কারণ শুকনো অবস্থায় পুকুরে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন-ব্যাঙ, সাপ না থাকে। পানি থাকা অবস্থায় পুকুরে এসব প্রাণী থাকে বিধায় তখন বেষ্টনী দিলে এরাও পুকুরে আটকা পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভিতরে সেগুলোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- কোচ দিয়ে বা বিষ টোপ দিয়ে।

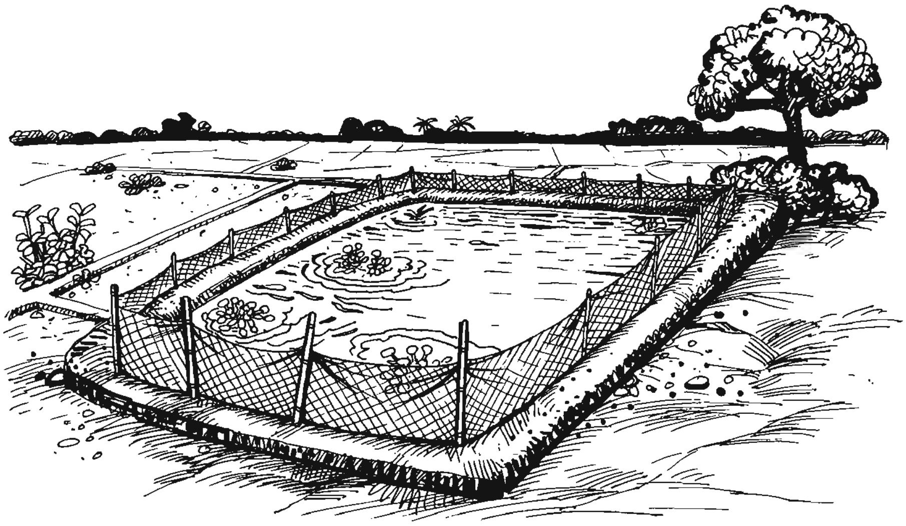

চিত্র: মাগুর মাছের পুকুরে নেটের বেষ্টনী

পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ টি মাগুর মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। শিং মাছ যেহেতু আকারে ছোট তাই এ মাছ কিছু বেশি যেমন- ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত মজুদ করা যেতে পারে। শতকে ৩-৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে যা পুকুরে উৎপাদিত অতিরিক্ত ফাইটোপ্লাংকটন খেয়ে পরিবেশ ভালো রাখবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকলে শতকে মাগুরের পোনা ২৫০-৩০০টি এবং শিং মাছের পোনা ৪০০-৫০০টি মজুদ করা যাবে। কার্প বা রুই জাতীয় মাছের সাথে শিং/মাগুর এর মিশ্রচাষ করতে চাইলে শতকে শিং/মাগুর এর পোনা ৫০টি এবং রুই জাতীয় মাছের পোনা ৪০টি মজুদ করা যায়। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় হচ্ছে সকাল বা বিকাল (ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়)। দুপুরে রোদে বা মেঘলা দিনে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে পোনা শোধন ও পুকুরের পানিতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ সম্পর্কে কৃষি উপকরণ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত জেনেছি।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাগুর ও শিং মাছ চাষে মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিচে মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এগুলোর মিশ্রণের হার দেওয়া হলো-

শিং ও মাগুরের সম্পুরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার

খাদ্য উপাদান	নমুনা মিশ্রণ হার (%)
ফিশমিল	২০
মুরগির নাড়ি ভুঁড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট ও বোন মিল)	
সরিষার খৈল	২০
চালের কুঁড়া	৩০
গমের ভুসি	১২
আটা/ চিটাগুড়	৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ গ্রাম/কেজি
সয়াবিন চূর্ণ	৮
ভুট্টা চূর্ণ	৫

শিং/মাগুর মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা নিচে দেওয়া হলো-

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	**দৈহিক খাদ্যের পরিমাণ (%)**
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৭
> ১০০	৩-৫

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগ করে দিনে ২ বার (সকাল ও বিকালে) দিতে হবে। খাবার অল্প পানিতে মিশিয়ে ছোট ছোট বল করে পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির নিচে স্থাপিত ট্রেতে দেওয়া যাবে। খাদ্য প্রস্তুতের ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই সরিষার খৈল পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা বাণিজ্যিক খাবারও মাছকে প্রদান করা যায়। এতে তৈরিকৃত খাদ্যের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি পড়তে পারে।

২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

চাষকালীন মাছ নিয়মিত বাড়ছে কিনা এবং মাছ রোগাক্রান্ত হচ্ছে কিনা জাল টেনে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে। শিং ও মাগুর মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে মাঝে মাঝে শীতকালে ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ এবং পেট ফোলা রোগ দেখা যায়। নিচে এদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেওয়া হলো:

ক্ষত রোগ: মূলত এ্যাফানোমাইসিস ইনভাডেন্স নামক একধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এতে মাংশপেশিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুকুরে ১-১.৫ মিটার পানির গভীরতায় শতকে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরুতে একই হারে পুকুরে চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে শীতকালে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

লেজ বা পাখনা পচা রোগ: এ্যারোমোনাডস ও মিক্সোব্যাকটার জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিনিট গোসল করাতে হবে। পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি শতক পুকুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেট ফোলা রোগ: এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগ হলে মাছের পেট ফুলে যায়। মাছ ভারসাম্যহীন ভাবে চলাচল করে ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের পেট হতে খালি সিরিঞ্জ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মি গ্রাম ক্লোরামফেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে। আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

মাছ আহরণ

সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ৭-১০ মাসে শিং ও মাগুর মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। উক্ত সময়ে শিং মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাগুর মাছ ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুকুরে জাল টেনে বেশির ভাগ মাছ ধরতে হবে। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হলে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে এক একর একটি পুকুরে শিং/মাগুর চাষের সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাতায় লিখে জমা দিবে।

খ) পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি

বিল, হাওর, নদী, পুকুর এবং দিঘিতে পাবদা ও গুলশা মাছ পাওয়া যায়। পাবদা ও গুলশা মাছ খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এ কারণে এদের চাহিদা ও বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। পাবদা মাছ ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ চ্যাপ্টা ও সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিক ক্রমাগত সরু। এ মাছের মুখ বেশ বড় ও বাঁকানো। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড়। মুখের সামনের দিকে দুই জোড়া লম্বা গোঁফ আছে। পৃষ্ঠ পাখনা ছোট। পায়ু পাখনা বেশ লম্বা ও লেজ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের রং সাধারণত উপরিভাগে ধূসর রূপালি ও পেটের দিক সাদা। ঘাড়ের কাছে কানকোর পিছনে কালো ফোঁটা আছে। শিরদাঁড়া রেখার উপরিভাগে হলুদাভ ডোরা দেখতে পাওয়া যায়। পাবদা মাছ মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন সম্পন্ন হয়।

গুলশা মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সেমি হয়ে থাকে। মাছের দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা। পিঠের অংশ বাঁকানো। মুখ বেশ ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়। মুখে ৪ জোড়া গোঁফ বা শুঁড় আছে। পৃষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা কাঁটা যুক্ত। শরীরের রং জলপাই ধূসর, নিচের দিক কিছুটা হাল্কা। শিরদাঁড়া রেখা বরাবর নীলাভ ডোরা দেখা যায়। এরা বছরে একবার ডিম দেয়। গুলশা মাছের প্রজননকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন করে থাকে।

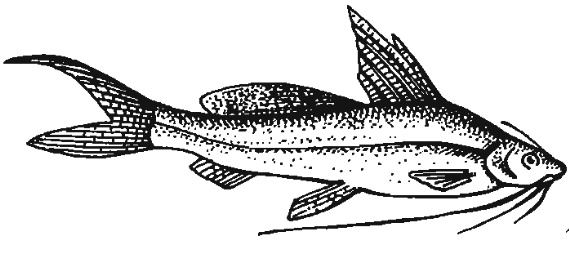

চিত্র : গুলশা

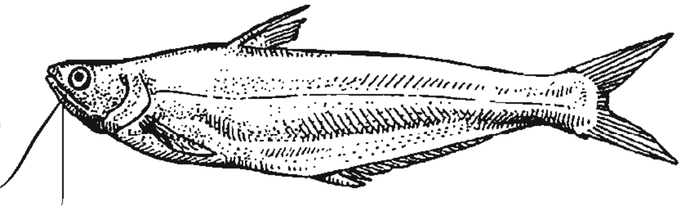

চিত্র : পাবদা

পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের গুরুত্ব

১. বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং মূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। তাই এদের চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি সম্ভব।

২. এদের দেহে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রেন্ট বিদ্যমান থাকে।

৩. খেতে খুবই সুস্বাদু।

৪. চাষ পদ্ধতি সহজ।

৫. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। ফলে সহজে পোনা পাওয়া সম্ভব।

৬. বার্ষিক পুকুর ছাড়াও মৌসুমি পুকুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়েও চাষ করা যায়।

৭. দ্রুত বর্ধনশীল, ৫-৬ মাসেই বিপণনযোগ্য হয়।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন

সাধারণত ১৫-২০ শতাংশের পুকুর যেখানে ৭-৮ মাস পানি থাকে এমন পুকুরে এ মাছ দুইবার চাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। থাকলে তা ছেঁটে দিতে হবে যেন পুকুরে পাতা ও ছায়া না পড়ে। পুকুরে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হারে গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৩-৫ গ্রাম ওজনের পোনা শতক প্রতি ২৫০ টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়া উচিত। পোনা আনার সাথে সাথে সেগুলো সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে শোধন করে নিতে হবে এবং পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কাজ : দলগতভাবে পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

খাদ্য প্রয়োগ

পাবদা ও গুলশা মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার:

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি
ফিশমিল	৩০	২-৩ টি ডুবন্ত ট্রেতে করে প্রতিদিন দেহ ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে দৈনিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) প্রয়োগ করতে হবে।
মিট ও বোন মিল	১০	
সরিষার খৈল	১৫	
সয়াবিন খৈল	২০	
চালের কুঁড়া	২০	
আটা	৪	
ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রণ	১	

সার প্রয়োগ

সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার জন্য ৭-১৫ দিন পর পর শতক প্রতি ৪-৫ কেজি হারে পচা গোবর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গুলিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। ট্রেতে খাবার দেওয়ার আগে পূর্ববর্তী দিনের খাবার সম্পূর্ণ খেয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্য থেকে যাবে তার সমপরিমাণ খাদ্য কম সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে ২ বার জাল টেনে দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সপ্তাহে একবার পুকুরে হররা টানতে হবে। পুকুরে পানি কমে গেলে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা (সেক্কিডিস্ক গভীরতা) ২৫ সেমি মধ্যে থাকলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

মাছ আহরণ

গুলশা মাছ ৬ মাসে ৪০-৪৫ গ্রাম এবং পাবদা মাছ ৭-৮ মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই আকারের পাবদা মাছ বেড় জাল দিয়ে ও গুলশা মাছ পুকুর শুকিয়ে আহরণ করা যায়।

নতুন শব্দ : জিওল মাছ, এ্যাফানোমাইসিস ইনভাডেন্স, মাইক্রোনিউট্রেন্ট

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. পুষ্টির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা গড়ে মাত্র ৬০ গ্রাম আমিষ খেয়ে থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই মাছ চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া মাছের তেল দেহের জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ যেমন- মলা, ঢেলা, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ' রাতকানা রোগ দূর করে। মাছের কাঁটায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায় যা দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।

২. কাজের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১% বা ১৬৫ লক্ষের অধিক লোক মৎস্য সেক্টর থেকে বিভিন্ন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি : মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। দেশে রপ্তানি আয়ের ২.৪৬% আসে মৎস্য খাত হতে। মাছ চাষ বৃদ্ধি করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুকুর, ডোবা ও নালা রয়েছে যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে গ্রামের গরিব ও স্বল্প আয়ের লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

সমন্বিত চাষের ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা হয়। আবার সেই সাথে অনেকের বাড়িতে রয়েছে পুকুর যেটি ধোয়ামোছা, রান্নাবান্না, গোসল ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। সনাতন পদ্ধতিতে এই সব পুকুরে মাছও লালন করা হয়। এসব হাঁস-মুরগি, মাছ পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখে। পুকুরের উপর ঘর করে যদি হাঁস-মুরগি রাখা যায় তবে এদের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হয় না। আবার গরুর গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে হাঁস-মুরগির উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুকুরে ফেলে দিলে তা মাছের সম্পূরক খাদ্যের যোগান দেয়। অব্যবহৃত পুকুরের পাড়ে ফল-মূল এবং শাকসবজির চাষও করা যায় যেখানে পুকুরের তলার অতিরিক্ত কাদা (পচা জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ) সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ফলমূল ও শাকসবজির ঝরাপাতা কমপোস্ট সার হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হয়। আবার কৃষকের ধানের জমিতে যে কয়েকমাস পানি থাকে সে সময়ে ধানের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মাছের বিষ্ঠা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই মাছ ধানের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফেলে এবং মাছের চলাচল জমিতে আগাছা জন্মাতে বাধা দেয়। এভাবে যখন একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে সমন্বিত চাষ বলে। সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য ফসলের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

সমন্বিত চাষের গুরুত্ব

একই জমিতে একই সময়ে অল্প খরচে একাধিক ফসল পাওয়া যায়। ফলে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হয়। একই ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। সার ব্যবহারের খরচ কমে। শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় (একটি ফসলের জন্য যে শ্রম প্রয়োজন, সেই একই শ্রমে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়)। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অপচয় রোধ হয়। ঝুঁকি কম থাকে অর্থাৎ কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হলে অন্য ফসল উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

নিচে আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি (সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ) সম্পর্কে জানব।

ক) সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষ

মাছ ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষের সুবিধা

১. পুকুরের উপর হাঁস/মুরগির ঘর তৈরি করা হয় বলে আলাদা জায়গার প্রয়োজন হয় না। ২. হাঁস/মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ চাষের জন্য উৎকৃষ্ট জৈব সার, এই পদ্ধতিতে পুকুরে বাইরে থেকে কোনো সার দেওয়ার দরকার নেই। ৩. হাঁস/মুরগির উচ্ছিষ্ট খাদ্য সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ফলে মাছের জন্য আলাদা কোনো সম্পূরক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ৪. হাঁস পুকুরের পোকামাকড় ও ব্যাঙাচি খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে। ৫. হাঁস পুকুরের পানিতে সাঁতার কাটে বলে বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে মেশে, ফলে পানিতে অক্সিজেনের সমস্যা হয় না। ৬. একই জায়গা থেকে মাছ, মাংস ও ডিম পাওয়া যায়, ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদন ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

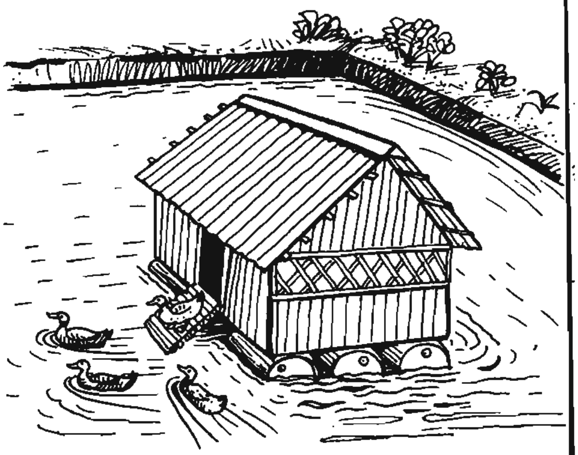

চিত্র : সমন্বিত মাছ ও হাঁস চাষ

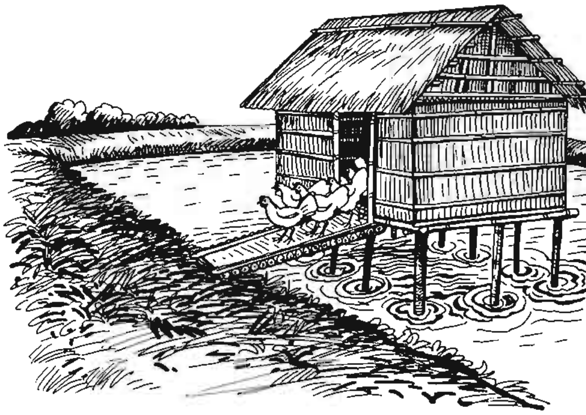

চিত্র : সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : খুব ছোট আকারের পুকুর সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষের জন্য তেমন উপযোগী নয়। পুকুরের আয়তন ন্যূনতম ৩৩ শতক হলে ভালো হয়। বছরে কমপক্ষে ৮-১০ মাস ১.২ থেকে ১.৮ মিটার (৪-৬ ফুট) পানি থাকে এমন পুকুর নির্বাচন করতে হবে। এরপর যথাযথ নিয়মে মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। তবে সমন্বিত হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতিকালীন সময়ে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। চুন দেওয়ার ৭দিন পর পুকুরের উপর বানানো ঘরে হাঁস/মুরগির বাচ্চা মজুদ করতে হবে। হাঁস/মুরগির বাচ্চা মজুদের ৭-১০ দিন পর পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

হাঁস-মুরগির ঘর নির্মাণ : খরচ কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে এক চালা বা দো-চালা ঘর তৈরি করা যায়। ঘরটি পাড় থেকে ১.২ থেকে ১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট) ভিতরে পানির উপর হবে যেন শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলেও বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ঠ খাদ্য মাটিতে না পড়ে পানিতে পড়ে। পানির উপরিভাগ থেকে ঘরের মেঝের দুরত্ব ০.৪৬-০.৬ মিটার (১.৫-২ফুট) এবং মেঝে থেকে ঘরের চালার উচ্চতা হবে ১.২-১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট)। ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য চালা ও ঘরের বেড়ার মাঝের জালের মতো বেড়া বা জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এক বাতা থেকে অন্য বাতার দূরত্ব হবে ১ সেমি। এতে করে মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ঠ সরাসরি পানিতে পড়বে কিন্তু মুরগির পা বাতার ফাকে ঢুকে আঘাত প্রাপ্ত হবে না। হাঁস/মুরগির ঘর অনেকসময় পুকুরের পাড়েও তৈরি করা হয়।

হাঁস-মুরগির জাত ও সংখ্যা নির্ধারণ : প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য উন্নতজাতের ২টি হাঁস বা মুরগি (ব্রয়লার বা লেয়ার) পালন করা যায়।

হাঁস-মুরগির খাদ্য : বাচ্চা অবস্থায় ৯০ দিন পর্যন্ত প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রতিদিন ৬০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২৫ গ্রাম সুষম খাদ্য দিতে হবে। হাঁসকে খাদ্য খাওয়ানোর সময় প্রয়োজনমতো পানি মিশিয়ে দিতে হবে। ব্রয়লার মুরগিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সব সময় খাবার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি লেয়ার মুরগির জন্য ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ৮০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২০ গ্রাম হারে দৈনিক খাবার প্রদান করতে হবে। খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর জন্য পৃথক পৃথক পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

হাঁস-মুরগির রোগবালাই দমন : হাঁস/মুরগির রোগ হতে পারে। রোগ হলে নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য হাঁস-মুরগির ঘর সবসময় শুকনো রাখতে হবে। ঘরের মেঝে

এবং খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টিকা ও ইনজেকশন দিতে হবে। অসুস্থ হাঁস-মুরগিকে যতদ্রুত সম্ভব ভালোগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব : পুকুরে ৮-১২ সেমি আকারের বিভিন্ন কার্পজাতীয় মাছের পোনা শতক প্রতি ৩৫-৪০টি নিম্নলিখিত অনুপাতে ছাড়া যায় তার মধ্যে শতক প্রতি কাতলা/বিগহেড ৪টি, সিলভার কার্প ৯টি, রুই ৮টি, মৃগেল ও কার্পিও ৪টি করে, গ্রাস কার্প ১টি এবং সরপুঁটি ৫-১০টি ছাড়তে হবে।

গ্রাসকার্প ঘাসজাতীয় খাদ্য খায়। তাই পুকুর পাড়ে জমানো ঘাস, নরম পাতা, কলা পাতা ইত্যাদি নিয়মিত পুকুরে দিতে হবে। অন্য জাতের মাছের জন্য বাইরে থেকে কোনো খাদ্য দেওয়ার দরকার নেই। পানিতে পড়া হাঁস/মুরগির উচ্ছিষ্ট খাদ্যই এরা গ্রহণ করবে।

মাছ মজুদোত্তর যত্ন : প্রতিমাসে একবার জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হলে নতুন পানি সরবরাহ বা বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের তলদেশে গ্যাস জমা হলে হররা টেনে পুকুর থেকে গ্যাস দূর করা যেতে পারে। ক্ষত রোগের আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শীতের শুরুতে শতক প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

উৎপাদন : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষ করা হলে পুকুরে কোনো সার বা খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াই শতক প্রতি ১৮ থেকে ২১ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়। খাকি ক্যাম্পবেল বা ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁস বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। একটি ব্রয়লার মুরগি ২ মাসে প্রায় ১.৫-২ কেজি ওজনের হয় এবং লেয়ার মুরগি বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

খ) ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ

ধান চাষের সময় অনেক জমিতেই দীর্ঘদিন পানি ধরে রাখার দরকার হয়। এসব ধানক্ষেত একটু পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করে নিলে একই জমিতে এক বছরে ধান এবং মাছ ও গলদা চিংড়িসহ একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি ধানক্ষেতে মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী যা এখনই ব্যবহার করা যায়। আরও ৩.০ লক্ষ হেক্টর ধানের জমি ভবিষ্যতে গলদা ও মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধা : একই জমিতে অতিরিক্ত ফসল হিসাবে মাছ ও গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয়। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। মাছ ধানের ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ও পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। তাই ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের দরকার হয় না। মাছ ও চিংড়ির চলাফেরার কারণে ক্ষেতে আগাছা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি হয়। মাছ ও চিংড়ির বিষ্ঠা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে ফলে সারের খরচ তুলনামূলক কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে এ পদ্ধতিতে ধানের ফলন গড়ে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জমি নির্বাচন : যেসব জমিতে কমপক্ষে ৪-৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব এবং চাষকালীন সময়ে ক্ষেতের সব অংশে কমপক্ষে ১২-১৫ সেমি পানি থাকে সেসব জমিতে ধান এবং মাছ ও গলদার সমন্বিত চাষ সম্ভব। যে সব জমি উঁচু অর্থাৎ পানি ধরে রাখতে পারে না, আবার যে সমস্ত জমি বেশি নিচু অর্থাৎ সহজে প্লাবিত হয় এদের কোনোটিই মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়।

মাছ ও গলদা চাষের জন্য ধানক্ষেত প্রস্তুতকরণ

জমির আইল তৈরি/ মেরামত : জমির আইল শক্ত, মজবুত করে তৈরি বা মেরামত করতে হবে। সাধারণ বন্যায় যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ৩০-৬০ সেমি উঁচু করে আইল তৈরি করা ভালো। আইল পর্যাপ্ত চওড়া হতে হবে। এতে আইল তাড়াতাড়ি ভাঙবে না ও আইলে কিছু শাকসবজিও চাষ করা যাবে।

ধানক্ষেতে ডোবা ও খাল/নালা খনন : মাছ ও চিংড়ির আশ্রয় ও চলাচলের সুবিধার জন্য ধান ক্ষেতের আইলের চারপাশে ভিতরের দিকে নালা খনন করা হয় অথবা আইলের এক বা দুইপাশে নালা বা ডোবা খনন করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের মাঝখানে বা কোনায় ডোবা খনন করা হয় । কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতে নালা ও ডোবা দুই-ই খনন করা হয় । সেক্ষেত্রে ডোবার সাথে নালার সংযোগ থাকে । মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা ডোবা ও নালা হলেই চলে । এদের গভীরতা ০.৫-০.৮ মিটার হলে ভালো হয় । জমির ঢালু বা নিচু অংশে ডোবা তৈরি করা হয় ।

ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির সুবিধা হচ্ছে- (১) ক্ষেতের পানি কমে গেলে বা খুব গরম হয়ে গেলে চিংড়ি ও মাছ গর্ত ও নালার অপেক্ষাকৃত গভীরে ঠাণ্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারে । (২) আগাছা পরিষ্কার বা মাছ ধরার প্রয়োজন হলে জমির পানি শুকিয়ে মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে তা সহজেই করা যায় ।

গলদা চিংড়ির আশ্রয়স্থল সৃষ্টি : চিংড়ির জন্য ডোবা বা খালে কৃত্রিম প্লাস্টিক বা শুকনো কঞ্চি দিয়ে গলদার আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে । চিংড়ি এখানে খোলস বদলের সময় নাজুক অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারবে ।

ধানের জমি তৈরি : জমিতে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে প্রচলিত নিয়মে সার,গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে ।

ধানের জাত নির্বাচন : ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য বি আর-৩ (বিপ্লব), বি আর-১১ (মুক্তা), বি আর -১৪ (গাজী), বি আর -২ (মালা) ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল ধান নির্বাচন করা উচিত ।

ধান রোপণ পদ্ধতি : ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হবে । সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি রাখতে হবে । পর পর ৫-৬ সারি লাগানোর পর ৩৫-৪০ সেমি ফাঁকা রাখতে হবে । এতে মাছ ও চিংড়ির চলাচলে সুবিধা হয় এবং পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়তে পারে ফলে দ্রুত মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে ।

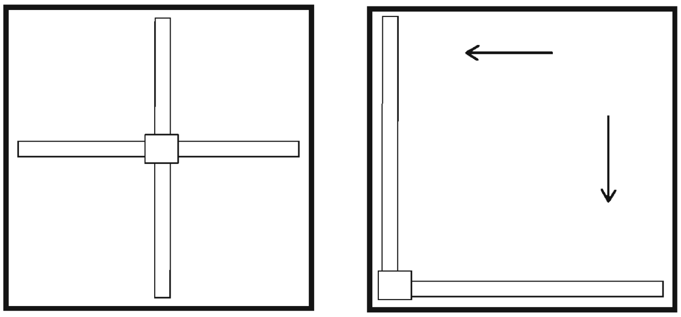

সমতল জমি দুই দিকে ঢালু জমি

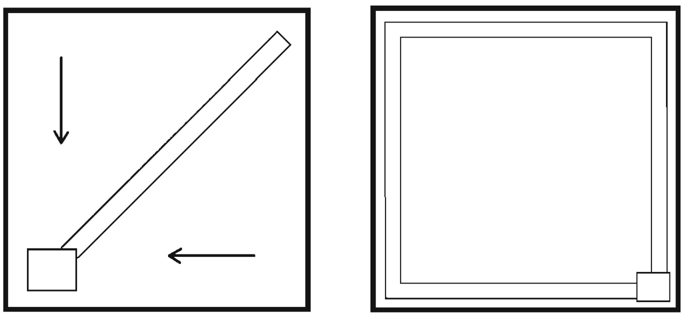

দুই দিকে ঢালু জমি সমতল জমি

চিত্র: ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির কয়েকটি নকশা

মাছের প্রজাতির নির্বাচন : যেহেতু ধানক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না তাই কম পানিতে ও কম অক্সিজেনে বাঁচতে পারে, উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং সেই সাথে ধান চাষকালীন সময়ের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয় এরূপ দ্রুত বর্ধনশীল মাছ নির্বাচন করতে হবে, যেমন- কার্পিও, সরপুঁটি, তেলাপিয়া। তবে এগুলোর সাথে অল্পসংখ্যক রুই, কাতলা দেওয়া যেতে পারে। আবার মাগুর মাছের পোনাও ছাড়া যায়। তবে গ্রাস কার্প ছাড়া যাবে না কারণ এরা ধান গাছ খেয়ে ফেলতে পারে।

পোনা মজুদ : ধান রোপণের ১০-১৫ দিন পর যখন ধান গাছ শক্তভাবে মাটিতে লেগে যাবে তখন চিংড়ি ও মাছ মজুদ করতে হবে। শতাংশ প্রতি মাছের পোনা ১৫-২০টি ও চিংড়ির পোনা ৪০-৫০টি মজুদ করা যেতে পারে।

সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ : চালের কুঁড়া, খৈল, ফিশমিল ১ঃ১ঃ১ অনুপাতে নিয়ে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আটা পানিতে ফুটিয়ে আঠালো করে উক্ত উপকরণগুলোর সাথে মিশিয়ে কাই করে ছোট ছোট বল বানিয়ে মাছ ও চিংড়িকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% খাবার তিন ভাগ করে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা : ধানের সাথে মাছ চাষ করলে কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়। তবে কীটনাশক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে মাছকে ডোবা/নালায় আটকিয়ে তা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের অন্তত ৫ দিন পর সেচ দিয়ে পুনরায় মাছকে সমস্ত জমিতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে। ক্ষেতের পানি কমে গেলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাছে রোগবালাই এর লক্ষণ দেখা দিলে মাছগুলোকে ডোবার মধ্যে নিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ধান, মাছ ও চিংড়ি আহরণ : ধান কাটার সময় হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে চিংড়ি ও মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে ধান কাটতে হবে। ধান কাটার পরও যদি ক্ষেতে পানি থাকে বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী ফসল শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত মাছ চাষ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশুপাখি পালন পদ্ধতি

গৃহপালিত পশুর আবাসন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুর আশ্রয় প্রদানকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলা হয়। পশুকে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাসস্থান বা গোয়াল ঘর বলে। পশুর বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। গোয়াল ঘরে সবসময় পশুকে আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে বাইরে ঘুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

আবাসনের উদ্দেশ্য

১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা
২। পশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেওয়া
৩। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা
৪। পোকা-মাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা
৫। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা
৬। পশুকে শান্ত করা
৭। গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চার সঠিক পরিচর্যা করা
৮। পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা
৯। দক্ষতার সাথে দুগ্ধ দোহন করা
১০। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা
১১। পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেওয়া
১২। সময়মতো চিকিৎসা সেবা দেওয়া
১৩। সহজে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা
১৪। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা
১৫। গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা
১৬। উৎপাদন খরচ কমানো ইত্যাদি।

পশুর আবাসনের স্থান নির্বাচন করা

পশুর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে খামার লাভজনক করা যায় না। পশুর আবাসন মূলধন ও পশুর সংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলোর জন্য গৃহপালিত পশুর আবাসন বা বাসস্থান তৈরি করতে হবে–

১। উঁচু, শুকনো ও বন্যামুক্ত এলাকা
২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে একটু দূরে
৩। দুধ ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা
৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা
৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা
৬। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন

৭। গোয়াল ঘরে যেন সূর্যালোক পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা
৮। গোয়াল ঘরের চার পাশ পরিষ্কার রাখা
৯। পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখা
১০। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকা ইত্যাদি।

গরুর আবাসন

গরুর আবাসনের জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো গোশালা বা গোয়াল ঘরে বেঁধে পশু পালন করা। গোয়াল ঘরের আকার পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পশুর সংখ্যা ১০ এর কম হলে ১ সারি বিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।

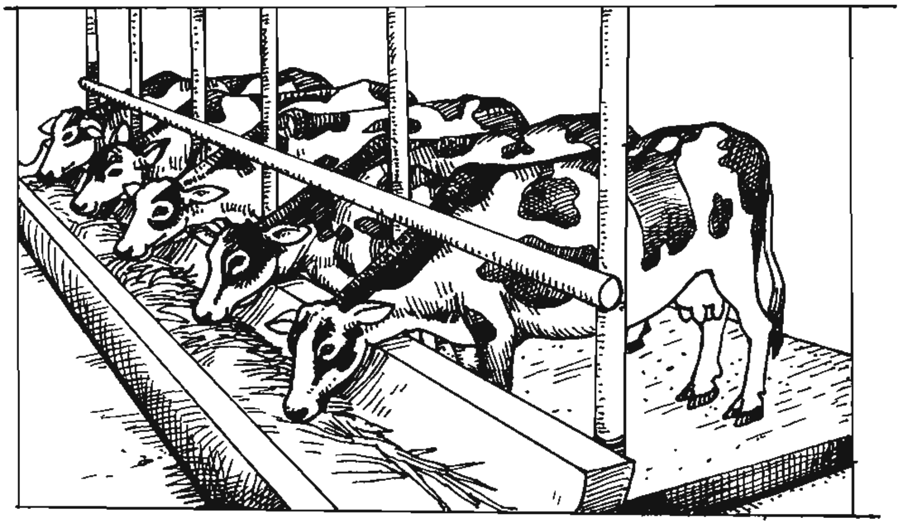

চিত্রঃ গরুর আবাসন

গাভী পালন

কৃষির অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে পশু ও গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। বলা হয়ে থাকে একটি জাতির মেধার বিকাশ নির্ভর করে মূলত ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর। আজকের বিশ্বে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে গাভীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাভী পালন একটি শিল্প হিসাবে গড়ে উঠছে। আমাদের দেশে পাঁচ ধরনের উন্নত জাতের গাভী দেখা যায় সেগুলো হলো-হলস্টেইন,ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি, রেড চিটাগাং প্রভৃতি। এই সমস্ত জাতের গাভীর দুধ উৎপাদনক্ষমতা মোটামুটি ভালো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন ও প্রজনন করালে এদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

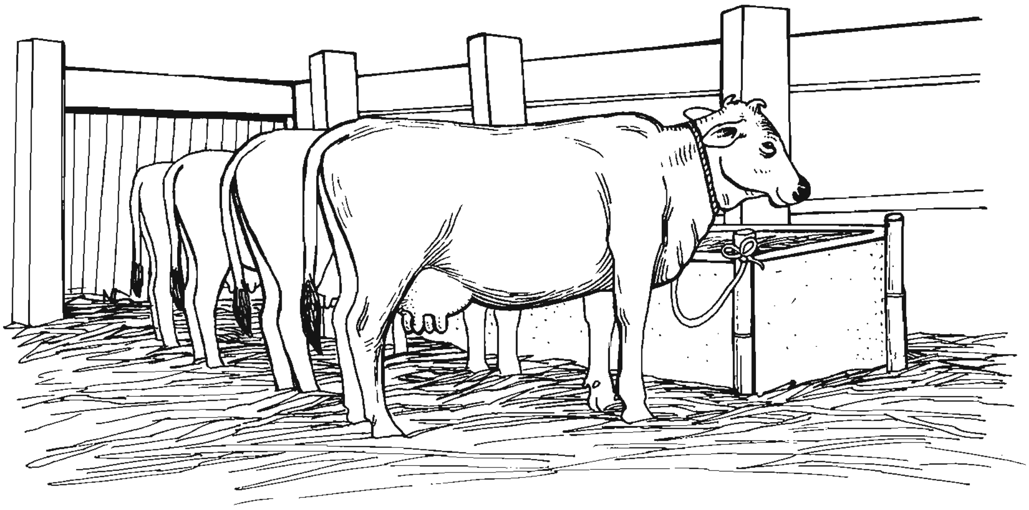

চিত্র : খামারের দুগ্ধবতী গাভী

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে অধিক কর্মক্ষম থাকে। গাভীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও দুগ্ধদোহন কালের পরিচর্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়ে। গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময়ে গাভীর ভিতরের বাচ্চা বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসবের কয়েক দিন আগে গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই গাভীকে সমতল জায়গায় রাখতে হবে। গর্ভধারণ ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। গর্ভকালীন অবহেলা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাছুরকে অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে, কারণ এই শাল দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাচ্চা প্রসবের পর ফুল পড়ে গেলে তা সাথে সাথে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয় এর পরে স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায়। দুধ দোহনের সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দ্রুততার সাথে দোহনের কাজ শেষ করতে হবে। গাভীর বাচ্চা প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হলে ডাক্তারি পরীক্ষা করে গরম করতে হবে। গাভী পরিচর্যার আরও একটি লক্ষ্য হচ্ছে, গাভীকে পোকামাকড় ও মশামাছি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

গাভীর খাদ্য

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ ও ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, স্নেহ পদার্থ সংরক্ষণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননের সক্ষমতা অর্জন, গর্ভাবস্থায় বাচ্চার বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত

খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতুলতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ গাভীর শারীরিক বিকাশের জন্য সব ধরনের খাদ্য উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব খাদ্য মিশ্রণে পশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে। গাভীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাই সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিউ অ্যাডিটিভস। আঁশযুক্ত খাদ্যের মধ্যে খড়বিচালি, কাঁচাঘাস, লতাপাতা, হে, সাইলেজ ইত্যাদি প্রধান। দানাদার খাদ্যের মধ্যে শস্যদানা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, খৈল ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া খনিজ ও ভিটামিন এর মধ্যে হাড়ের গুঁড়া, বিভিন্ন ভিটামিন - খনিজ প্রিমিক্স পদার্থ রয়েছে। এসব পশু খাদ্য প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করে গাভীকে পরিবেশন করতে হবে। গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা একধরনের থাম্বরুল পদ্ধতির মাধ্যমে নিরুপণ করা যায়। যেমন-

১। প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খড় ও সবুজ ঘাস খেতে পারে তা তাকে খেতে দিতে হবে।

২। গাভীর শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১.৫ কেজি দানাদার এবং প্রতি ১.০ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও সবুজ ঘাসের সাথে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

৩। গাভীকে ৪০-৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া ও ১০০ -১২০ গ্রাম খাদ্য লবণ সরবরাহ করতে হবে।

৪। তাছাড়া দুগ্ধবতী গাভীকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এ যাবতকাল পশুসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো-

- বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা
- পচা, বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা
- সর্বদা তাজা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা
- প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করা
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা
- অসুস্থ গাভীর পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা
- সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

গাভীকে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে অসুস্থ গাভী শনাক্ত করা যায়। গাভীর বিভিন্ন রোগবালাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। গাভী তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা রোগ, গলাফোলা, রিন্ডারপেস্ট, ম্যাস্টাইটিস, পরজীবী ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গাভীর যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাছুর পালন

গরু মহিষের শৈশবকালকে বাছুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু মহিষের বাচ্চাই বাছুর নামে পরিচিত। দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের দুধ উৎপাদনশীল গাভী, উন্নত মানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী গরু। তাই পশুপালন বিজ্ঞানে বাছুর পালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অল্প বয়সের এই গরু বা মহিষের বাচ্চা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। আমাদের দেশে যে সংখ্যক গবাদিপশু পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগেরও বেশি বাছুর। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন- গর্ভাবস্থায় গাভীর সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও নবজাত বাছুরের সঠিক যত্ন।

বাছুরের বাসস্থান

দেশীয় জাতের একটি বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন সাধারণত ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি হয়। একটি বাছুরের বাসস্থানের জায়গা কতটুকু হয় বাছুরের আকারের উপর তা মূলত নির্ভর করে। প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৩৫ বর্গফুট (৩.২৫ ব.মি.) জায়গার ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়।

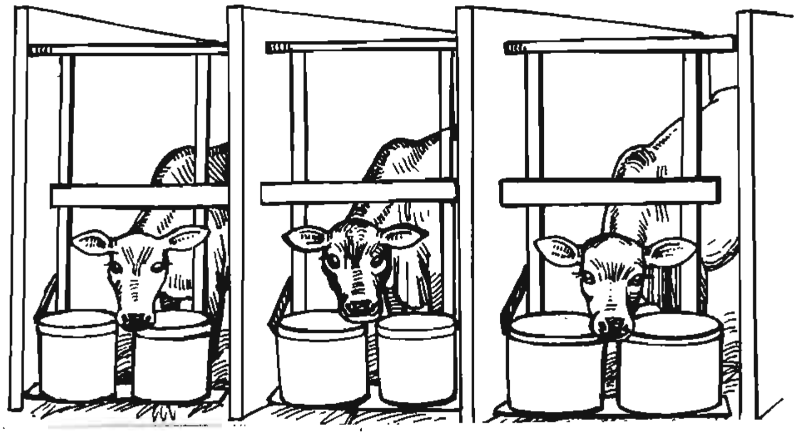

চিত্র : ঘরের ছোট খোপে বাছুর

বাছুরের বাসস্থানের জায়গা এমন হতে হবে যেন ঘরে প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাস প্রবেশ করে। বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা হতে পারে, তবে এতে মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি ছোট বাছুরের জন্য ১২ বর্গফুট (১.১১ ব.মি.) জায়গার প্রয়োজন। বাছুরের খোপে খড় বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। মেঝে পাকা হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও সেঁতসেঁতে না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদের খাদ্য পরিবেশন, রোগবালাই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বোঝায়। আমাদের দেশে বাছুরের আলাদা যত্ন নেওয়ার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাছুর জন্মের পর থেকে দৈহিক পরিপক্বতা অর্জন না করা পর্যন্ত এদের পালন করা বা এদের দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাছুর জন্মের পরবর্তী করণীয়

বাছুর জন্মের পর পরই বস্তার উপর রেখে নাক মুখ পরিস্কার করার পর শরীর পরিষ্কার করার জন্য গাভীর সামনে দিতে হবে। বাছুরের নাভী রজ্জু ঝরে না গেলে নাভী থেকে ৫ সেমি দূরে ব্লেড দিয়ে কেটে স্যাভলন বা টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে।

বাছুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো

জন্মের পর পরই বাছুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় অনেক বাছুর মায়ের বাট থেকে দুধ চুষে খেতে পারে না। তাই বাছুরের মুখের ভিতর বাঁট দিয়ে দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাতে হয়। গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে অনেক সময় অন্য গাভীর দুধ পান করানোর প্রয়োজন হতে পারে। শৈশবে বাছুরকে ৩৭.৫ সে. তাপমাত্রার দুধ পান করানো হয়। সাধারণত বোতলে বা বালতিতে করে বাছুরকে দুধ খাওয়ানো হয়। বিশুদ্ধ দুধ ও পানি ১ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উত্তম। দুধ খাওয়ানোর পর বোতল অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

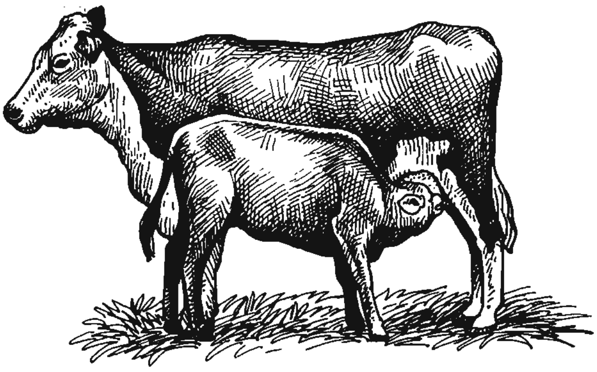

চিত্র : বাছুর মায়ের দুধ পান করছে

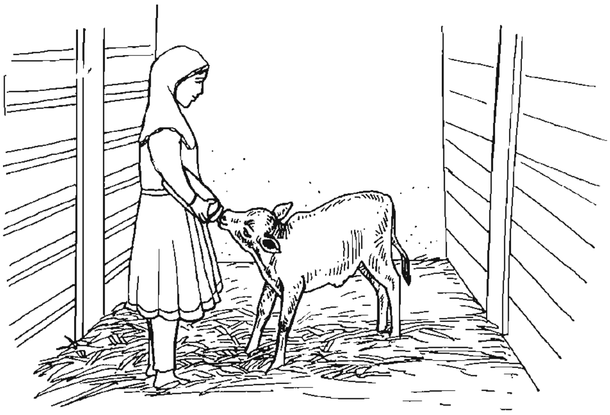

চিত্র : বাছুরকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে

খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো

এটি ছোট খামারের জন্য তেমন প্রয়োজন না হলেও বড় খামারের জন্য জরুরি। পশুর জাত উন্নয়ন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত কানে ট্যাগ নম্বর লাগিয়ে পশু চিহ্নিতকরণ করা হয়।

পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র ও বিছানা পরিষ্কার রাখা

বাছুরের সঠিকভাবে বৃদ্ধির জন্য পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত দৈহিক ওজন অনুসারে খাবার প্রদান করা হয়। বর্ধিত বাছুরের চাহিদা অনুসারে জন্ম থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিপালনের জন্য বাছুরের থাকার ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়মিত বাছুরের থাকার ঘরের বিছানা পরিষ্কার রাখতে হবে। বাছুরের শোয়ার ঘর যথেষ্ট শুকনো রাখতে হবে।

বাছুর সময়মতো ঘরে তোলা ও বের করা

বাছুরকে সময়মতো ঘরে তুলতে হয় এবং ঘর থেকে বের করতে হয়। বাছুরকে সারা দিন যেমন ঘরে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয় এবং তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় রাখাও ঠিক নয়। বৃষ্টিতে ভেজা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় থাকলে বাছুরের ফুসফুস প্রদাহ রোগ হতে পারে।

বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাধিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয়। এই সময়ে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি ভালোভাবে না হলে পরবর্তীতে ভালো উৎপাদনশীল গরু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বাছুরের বিভিন্ন রোগবালাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। বাছুরের স্কায়ার, নিউমোনিয়া, ছত্রাক, বাদলা রোগ, কৃমি ও আঁচিল রোগ দেখা যায়। বাছুরের যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভেড়া পালন

ভেড়া একটি নিরীহ প্রাণী। এরা চারণ ঘাস খেতে খুব পছন্দ করে এবং দলগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, ১৫ মাসে ২ বার বাচ্চা দেয়। তাই ভেড়া পালন শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে খামারের আকার বড় হয়ে উঠে এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায়। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কিছু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ভেড়া পশম (Wool) ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। এদেশে ভেড়ার তেমন কোনো ভালো জাত নেই। বাংলাদেশের ভেড়া মোটা পশম উৎপাদন করে। তাই এরা পশমের জন্য জনপ্রিয় নয়। এখানে ভেড়া মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার পশম খুব মূল্যবান ও জনপ্রিয়। ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল, শাল, সোয়েটার, জ্যাকেট তৈরি করা হয়। মোটা পশম কার্পেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার এত গুণাগুণ থাকলেও চারণভূমি ও উদ্যোগের অভাবে এদেশে এর পালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।

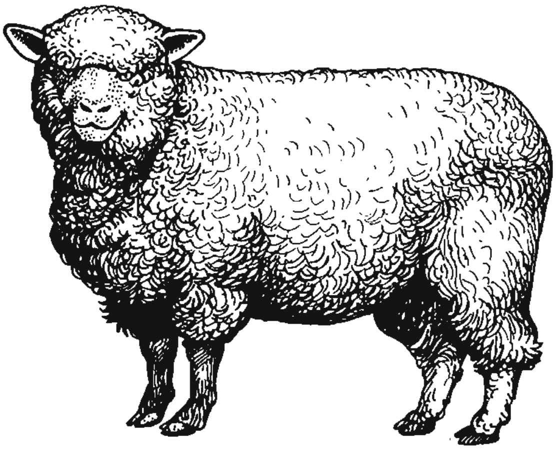

চিত্র : সূক্ষ্ম পশমের মেরিনো ভেড়া

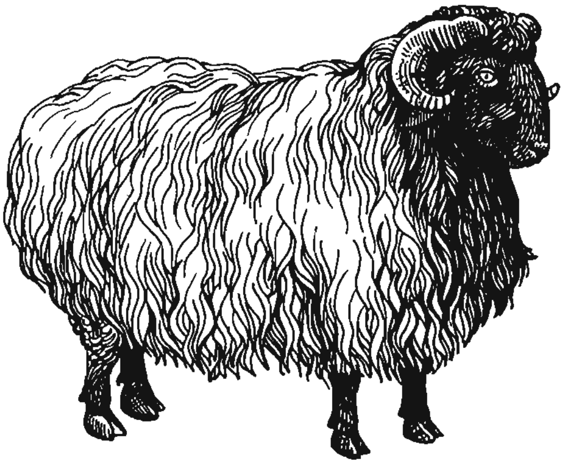

চিত্র : মোটা পশমের কারাকুল ভেড়া

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এরা খাবারের জন্য সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবুও নিম্ন লিখিত কারণে এদের বাসস্থান প্রয়োজন হয়

- রাতের বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য
- বন্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য
- ঝড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য
- বেশি উৎপাদনক্ষম ভেড়ার দুগ্ধ দোহন করার জন্য
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার পরিচর্যার জন্য
- ভেড়ার পশম কাটার জন্য
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য

ভেড়া পালনের জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যথা :

ক. উন্মুক্ত খ. আধা উন্মুক্ত ও গ. আবদ্ধ ঘর। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করে রাতে আশ্রয়ের জন্য ভেড়ার ঘর তৈরি করা হয়। ভেড়ার ঘরের মেঝে ভূমি সমতলে বা মাচার তৈরি হয়ে থাকে।

ক. উন্মুক্ত ঘরঃ যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে উন্মুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন চরে খাওয়ার পর রাতে ভেড়ার পাল এখানে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঝেতে খড় ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা উন্মুক্ত ঘরঃ উন্মুক্ত ঘরের নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ছাদসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আধা উন্মুক্ত ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় সেখানে আধা উন্মুক্ত ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।

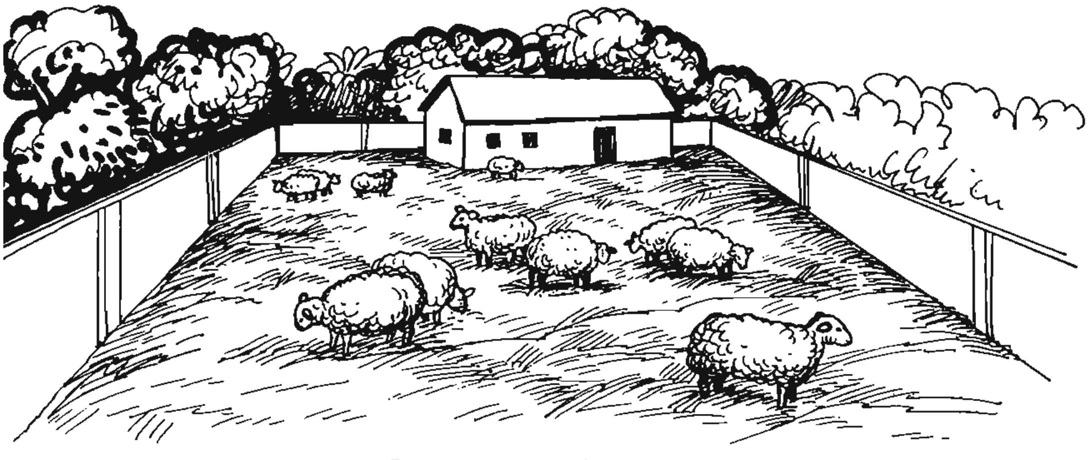

চিত্র : ভেড়ার আধা উন্মুক্ত ঘর

গ. আবদ্ধ ঘরঃ যেসব অঞ্চলে প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হয়, সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবদ্ধ ঘরের পুরো অংশেই ছাদ থাকে। ঘরের পাশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ ঘরের মেঝে পাকা ও আধা পাকা হয়ে থাকে।

বয়স্ক ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাপ-

মাচার মেঝে (বর্গমিটার)	ভূমিসমতলে খড়ের মেঝে (বর্গমিটার)
০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য এবং এদের থেকে বেশি উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে ভেড়ার পশম পরিষ্কার করতে হবে। এতে পশমের ময়লা বেরিয়ে আসবে। ভেড়ার দেহে মাঝে মধ্যে বহিঃপরজীবীনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ভেড়ার পশম কাটার পূর্বে গোসল করাতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য

ভেড়া যে কোনো ধরনের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এটি গরু, মহিষ ও ছাগলের মতোই জাবরকাটা প্রাণী। ভেড়ার খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস গরু ছাগলের মতোই। এদের রেশনে আঁশযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ দানাদার খাদ্যের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। গর্ভবতী ভেড়ির তুলনায় প্রসূতির খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে ভেড়ির খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করতে হয়। একটি বয়স্ক ভেড়ার দৈনিক ২.০-২.৫. কেজি সবুজ ঘাস এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার খাদ্য তালিকা-

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪০
চিটা গুড়	৫
গমের ভুসি	১০
খৈল	৯
শুকানো লিগিউম ঘাস	৩৬
মোট	১০০

কাজ
পাঁচটি মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার প্রতিদিন কী পরিমাণ আঁশ ও দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা হিসাব করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

গর্ভবতী ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪৫
খৈল	১০
চিটা গুড়	৫
ভুট্টার সাইলেজ	২০
শুকানো লিগিউম ঘাস	২০

প্রসূতি ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভালোমানের শুকানো লিগিউম ঘাস	৮০
ভুট্টার গুঁড়া	১৩
খৈল	৪
গমের ভুসি	৩

নবজাতকের যত্ন

নবজাত মেষ শাবককে জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।

ভেড়ার রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

ভেড়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ও সময়মতো টিকা প্রদান করতে হবে। ভেড়া বাদলা, তড়কা, ম্যাস্টাইটিস, খুরা রোগ, চর্মরোগ, কৃমি, বহিঃপরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত ভেড়াকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

হাঁস পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু হাঁস পালনের উপযোগী। এখানে অনেক খালবিল, ডোবানালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ও নদী রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোরসহ অনেক জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে। গ্রামের হাঁসের খামারিরা প্রচলিত পদ্ধতিতে হাঁস পালন করে থাকে। কিন্তু হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১। উন্মুক্ত পদ্ধতি
২। আবদ্ধ পদ্ধতি
৩। অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি
৪। ভাসমান পদ্ধতি

১। উন্মুক্ত পদ্ধতি

হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উন্মুক্ত পদ্ধতি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সকাল বেলায় হাঁসগুলোকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ থাকে। এখানে হাঁসকে সাধারণত কোনো খাবার দেওয়া হয় না। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন, ছোট মাছ, শামুক, জলজ উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দানাশস্য ও কীটপতঙ্গ নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। হাঁস সকাল বেলায় ডিম পাড়ে। তাই এই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সময় ডিমপাড়া হাঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। আমাদের দেশের যেসব অঞ্চলে পতিত জমি, হাওর-বাঁওড় ও নদী রয়েছে সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উত্তম ও লাভজনক। কিন্তু উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- শ্রমিক কম লাগে
- খাদ্য খরচ কম
- বাসস্থান তৈরিতে খরচ কম হয়
- পরিবেশের সাথে অভিযোজন ভালো হয়
- এদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ভালো হয়

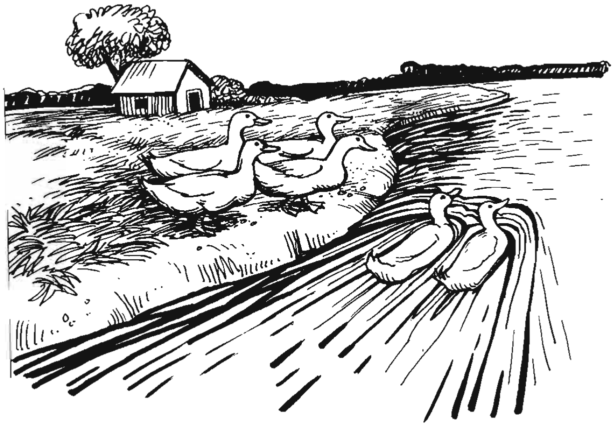

চিত্র : উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- অনেক পতিত জমি ও জলমহলের প্রয়োজন হয়
- বন্য পশুপাখি দ্বারা হাঁসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে
- অনেক সময় খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হয়ে থাকে
- সবসময় পর্যবেক্ষণ করা যায় না
- অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে থাকে

২। আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসকে সব সময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

i) মেঝে পদ্ধতি ii) খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি

i) মেঝে পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে বিছানা হিসাবে খড়ের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে বিছানা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

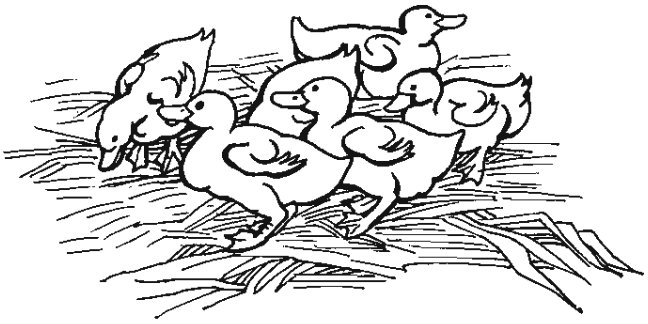

চিত্র : মেঝেতে হাঁসের বাচ্চা পালন

ii) ব্যাটারি বা খাঁচা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

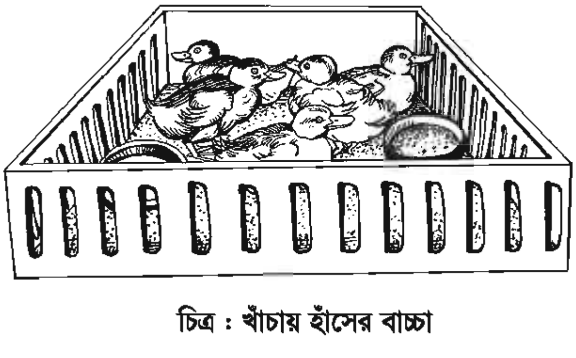

চিত্র : খাঁচায় হাঁসের বাচ্চা

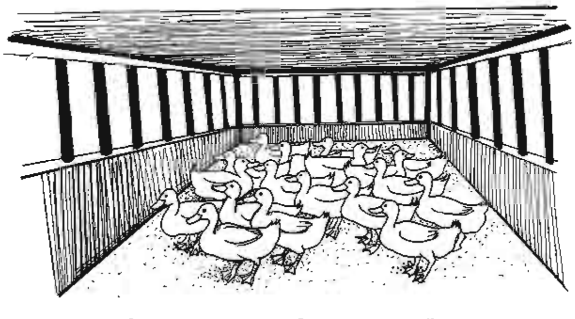

চিত্র : আবদ্ধ পদ্ধতিতে বয়স্ক হাঁস পালন

আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়
- সহজে রোগ প্রতিরোধ করা যায়
- শ্রমিক কম লাগে
- বন্য পশুপাখি হাঁসের ক্ষতি করতে পারে না
- প্রতিটি হাঁসের জায়গা কম লাগে

আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

- বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়
- ঘর নির্মাণ খরচ বেশি হয়
- হাঁসের মুক্ত আলোবাতাসের অভাব হয়
- নিবিড় যত্ন নিতে হয়
- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায় না

৩। অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁসকে রাতে ঘরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট জলাধার বা জায়গার মধ্যে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। জায়গাটি জলাধার না হলে হাঁসকে সাঁতার কাটার জন্য কৃত্রিম জলাধার, নালা বা চৌবাচ্চা তৈরি করে দিতে হয়। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে ও খাবার পানি খেতে পারে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায়।
- দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে।
- শ্রমিক কম লাগে।
- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- হাঁস পালন খরচ বেশি।
- নিবিড় যত্ন নিতে হয়।
- খাদ্য খরচ বেশি।
- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয় না।

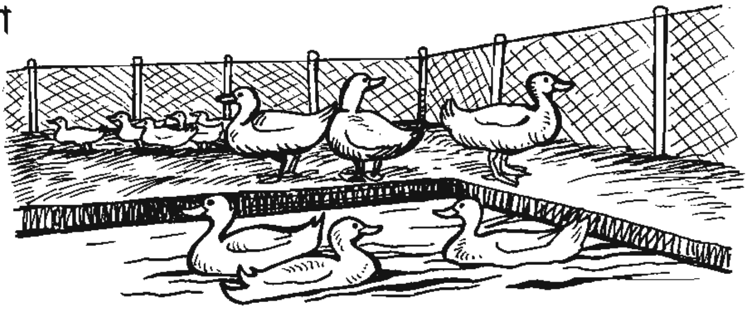

চিত্র : অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

৪। ভাসমান পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও বয়স্ক হাঁস পালনের উপযোগী। বড় পুকুর, দিঘি বা নদীর কিনারায় পানির উপর হাঁসের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে নির্মাণ খরচ একটু বেশি হলেও খাদ্য খরচ কম। ভাসমান ঘর তৈরির জন্য ড্রাম ব্যবহার করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে বন্যা বেশি হয়, সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন খুবই সুবিধাজনক।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

হাঁসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। হাঁসকে সময়মতো টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। হাঁস ডাক প্লেগ, কলেরা ও পরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত হাঁসকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

নতুন শব্দ : হাওর-বাঁওড়, ভাসমান পদ্ধতি, অভিযোজন, জলমহল, কৃত্রিম জলাধার, ডাক প্লেগ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিল্পের কাঁচামাল : কৃষিজ দ্রব্যাদি

কৃষি মানবজাতির বেঁচে থাকার একটি অনন্য নিয়ামত এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি শিল্পের কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। আবার গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল হিসাবে কাঠ, গুল্ম ও ঘাস জাতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। চা, কফি, চিনি, তুলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৃষিজ দ্রব্যাদি ছাড়াও বাঁশ, বেত, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, আম ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উত্থান হচ্ছে বাঁশ-বেতের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার বাঁশ-বেত দ্বারা কিসব জিনিস তৈরি হয়, নারিকেলের ছোবড়া কী উপকারে আসে- আর আম দ্বারা কী ধরনের খাদ্য পণ্য তৈরি হয়। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

আমজাত খাদ্যসামগ্রী ও ব্যবহার

আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে যত ফল আছে তন্মধ্যে স্বাদের দিক থেকে আমের অবস্থান প্রথম। আম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই আম উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদনের দিক থেকে ভারত প্রথম স্থান দখল করে আছে। আর বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই কমবেশি আম জন্মে। তবে বেশি আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো হচ্ছে- বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা। মোট আমের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় উৎপাদন হয়।

কাঁচা আম, পাকা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমের মোরব্বা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচুর, আমসত্ত্ব, পাকা আমের বোতলজাত জুস ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরি হচ্ছে।

নারিকেলজাত দ্রব্য ও ব্যবহার

নারিকেল একটি অর্থকারী ও তেলজাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরি হয়। নারিকেল গাছের পাতা দ্বারা ঝাঁটাও তৈরি হয়।

নারিকেলের কচি ফলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। রোগীর পথ্য হিসাবেও ডাবের পানির ব্যবহার হয়। উপকূল অঞ্চলের লোকেরা তরকারিতে নারিকেলের শ্বাস ব্যবহার করেন। আর ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরিতে বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হতে মাথায় দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয়। গ্লিসারিন,সাবান ও অন্যান্য কসমেটিকস তৈরিতেও নারিকেল ব্যবহার করা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া

বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল উৎপাদনের সাথে নারিকেলের ছোবড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে নানা গৃহস্থালি বস্তু তৈরি হয়।

যেমন– খাটের জাজিম, ওয়ালম্যাট, পাপোশ, রশি ইত্যাদি।

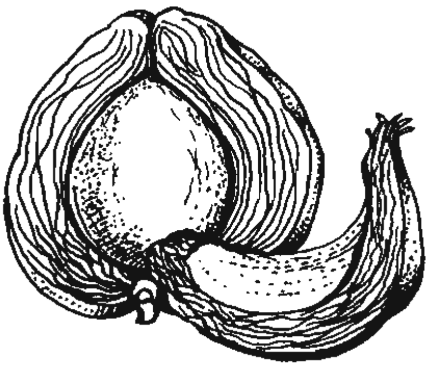

চিত্র : নারিকেলের ছোবড়া

শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষি দ্রব্যাদি ব্যবহারের গুরুত্ব

বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার

বাঁশ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গুরুত্বপূর্ণ অকাঠ বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাঁশকে পারিবারিক বা গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। গৃহনির্মাণ ও গৃহসামগ্রী থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাঁশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড, ঢেউটিন এমনকি প্যানেল পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশ পাতলা করে চেরাই করে চাটাই, ডোল, বীম, আড়, ঘরের খুঁটি, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, টুকরি, ঝুড়ি, কুলা, মাছ ধরার খাঁচা, পলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।

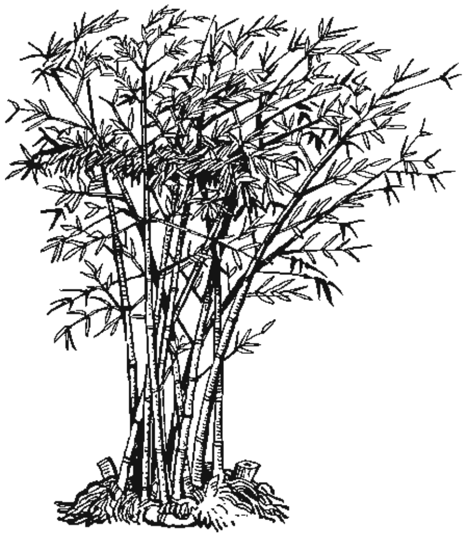

চিত্র : বাঁশ

আধুনিক বিশ্বে দেশে ও বিদেশে বাঁশের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বাঁশ থেকে স্বাস্থ্যকর লেমিনেটেড বাঁশের মেঝে ও দেয়ালকভার, মাদুর, কুশন, সিটকভার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব হচ্ছে।

বাঁশ শিল্পের শ্রেণি বিভাগ

বাঁশ শিল্পকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা :

১। কাগজশিল্প

২। নির্মাণশিল্প

৩। ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

কাগজ শিল্প

মূলিবাঁশ কাগজ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। মূলিবাঁশের তৈরি কাগজের মণ্ড দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপজাত হিসাবে রেয়নও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঁশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়াও বাঁশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড, ফ্লেকবোর্ড, বাঁশের ঢেউটিন, প্যানেল বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নির্মাণশিল্প

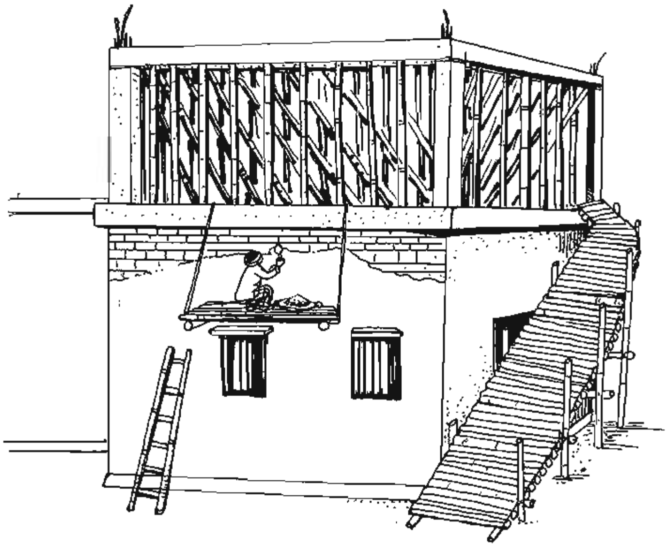

চিত্র : দালানকোঠা নির্মাণে বাঁশ

বিভিন্ন নির্মাণশিল্পেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণশিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজ যেমন খুঁটি দেওয়া, ঘরের বেড়া দেওয়া, বীম বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

আরও অনেক নির্মাণশিল্প যেখানে বাঁশ অতীতকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন গ্রামের খাল বা অপ্রশস্ত নদীতে সেতু বা সাঁকো তৈরিতে, নৌকার মাস্তুল, ছই, পাটাতন, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, জোয়াল, ঘানি ও মাড়াই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুঁটি, মাছ ধরার চাঁই, খাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জালের দণ্ড, সবজির গাছ বেয়ে উঠার জন্য মাচা, নৌকার হাল ও দাঁড়ের দণ্ড, বক্তৃতার মঞ্চ, তোরণ এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দ্বারা কূপ তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় আর্টেজীয় কূপ। এই কূপের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকায় জমি চাষ করা হয়।

ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

ক্ষুদ্র হস্তশিল্পেই অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের দ্রব্যজাত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকার বাঁশ বয়ন ক্ষুদ্র হস্তশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, ডোল, কুলা, ঝুড়ি, ঝাকা, চালনি, খাঁচা, খেলনা, কলম, টুপি, ফুলদানি, লাইট স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠি এমনকি দাঁত খিলান, বুকসেলফ ইত্যাদি।

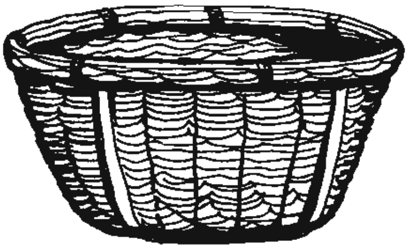

চিত্র : টুকরি

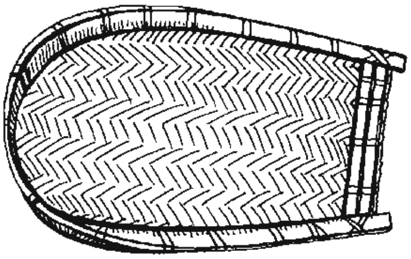

চিত্র : কুলা

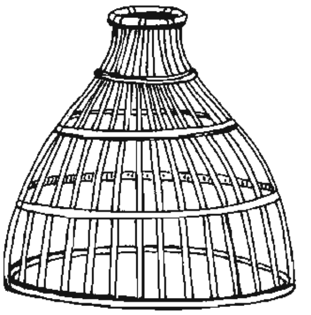

চিত্র : পলো

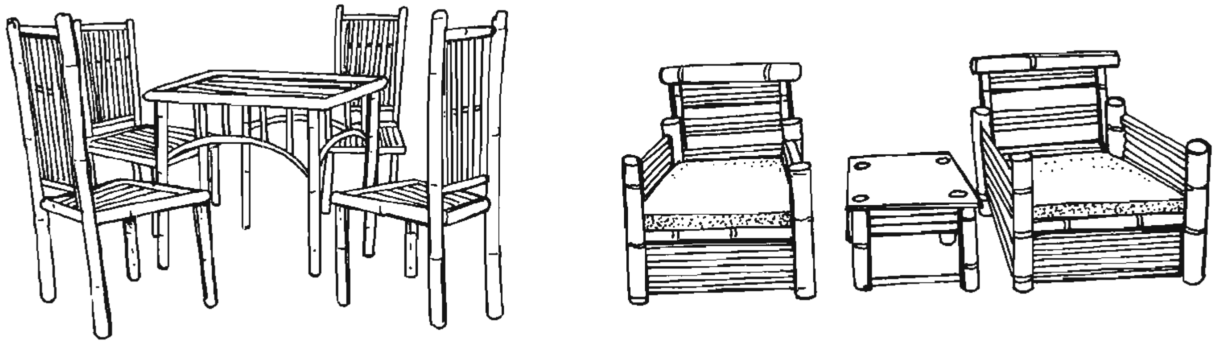

চিত্র : বাঁশের চেয়ার ও সোফা

ঔষধি বাঁশ

বাঁশ শুধু কাগজ তৈরি বা গৃহ সামগ্রী তৈরির কাজেই ব্যবহার হয় না। ঔষধ তৈরির কাজেও বাঁশ ব্যবহার হয়। বাঁশের অনেক জাত আছে। তন্মধ্যে সোনালি বাঁশ বিভিন্ন রোগের কাজে লাগে কাশি, শোথ রোগ, প্রস্রাবজনিত রোগ, ফোঁড়া পাকা ইত্যাদি মানুষের সাধারণ রোগ। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার মহৌষধ হচ্ছে এই সোনালি বাঁশ। ঔষধ হিসেবে বাঁশের শীষ, পাতা ও মূল ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই এগুলো কবিরাজের পরমর্শমতো ঔষধ তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা যেখানে ঝুড়ি তৈরি করা হয় এমন স্থান পরিদর্শন করবে এবং ঝুড়ি তৈরির ধাপগুলো লিখে আনবে। পরবর্তীতে হাতে কলমে নিজেরা করবে।

বেত ও বেতের ব্যবহার

বেত কাঠ ও বাঁশের মতো প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ। বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে অনেক ধরনের বেত পাওয়া যায়। বেত উৎপাদনের জন্য কৃষি ভূমি ব্যবহার করা হয় না। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর বেত উৎপন্ন হয়। বেত, তাল ও নারিকেল গোত্রীয় কিন্তু কাঁটাযুক্ত লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর ফল হয়। যা বেত ফল নামে পরিচিতি।

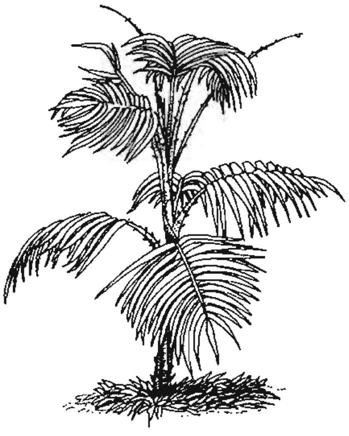

চিত্র : বেত গাছ

বেত শিল্প

বেতের শিল্পগুণের জন্যই বেত সবার নিকট সুপরিচিত। বেতের কাণ্ড বেত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেতের কাণ্ড শক্ত বটে কিন্তু নমনীয় ও চেরাইযোগ্য। এ থেকে আকর্ষণীয় ও আভিজাত্যবহনকারী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

বেতের ফার্নিচার তৈরি

বেতের তৈরি ফার্নিচার একেবারেই প্রাকৃতিক। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই। বেতকে সুতার মতো ব্যবহার করে কোনো শক্ত জিনিসের (রড, বাঁশ) উপর পেঁচিয়ে ফার্নিচার তৈরি করা যায়। আবার বেতের মোটা শাখা প্রশাখা শুকিয়ে শোধন করে শক্ত কাঠামো দাঁড় করিয়ে সোফা, চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, খাট, দোলনা, মোড়া, জুতা রাখার তাক, কর্নার সেলফ, ওয়ার্ডড্রোবস, রকিং চেয়ার, আরাম কেদারা ইত্যাদি ফার্নিচার বা আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

ফার্নিচার তৈরির আগে বেতগুলোকে সাইজ মতো কেটে শোধন করতে হবে। একটি চাড়িতে আনুমানিক হারে বরিক এসিড ও পানির দ্রবণ তৈরি করে এই দ্রবণে বেত এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে ঘুণ বা অন্যান্য পোকা-মাকড় আক্রমণ করবে না।

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই হচ্ছে গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১। হালকা নির্মাণশিল্প
২। বুননশিল্প
৩। ক্ষুদ্র হস্তশিল্প
৪। মিশ্রশিল্প

হালকা নির্মাণশিল্প

বেতের হালকা নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় মোটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা ভার বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণশিল্পের প্রধান উদাহরণ হচ্ছে- সোফাসেট, চেয়ার, খাট, পার্টিশন, শেলফ, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পে যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমাণে বেশি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প নৈপুণ্যের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণশিল্পের দ্রব্যাদির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত গোল্লাবেত, উদমবেত, কদমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

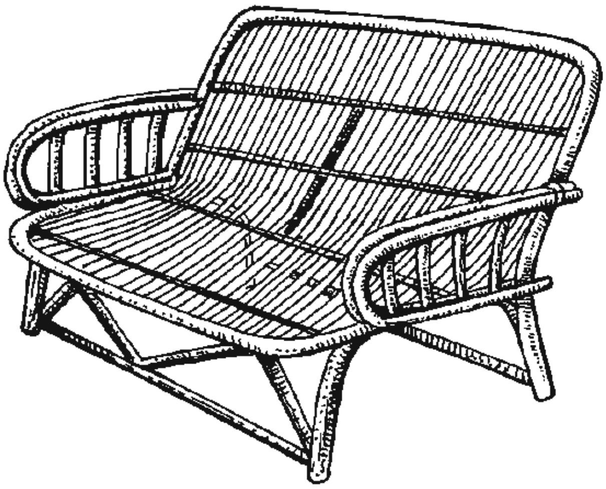

চিত্র : বেতের সোফা সেট

বুননশিল্প

বুননশিল্পে সরু ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেরাই করে আরও সরু ফালি পাওয়া যায়। এই সরু ফালিকে বেতি বলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেতি ব্যবহার করা হয়। বুননশিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণশিল্পকে কারুকার্যময় ও নান্দনিক করা হয়। বুননশিল্পের জন্য বান্দরিবেত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

বস্তুত বেতশিল্পের পুরোটাই হস্তশিল্প- ক্ষুদ্র হোক অথবা বড় হোক। নির্মাণশিল্প ও বুননশিল্পের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে সৌন্দর্যবর্ধক যেসব দ্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাকেই বলে বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্প। বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে খেলনা, ফুলের সাজি, কলমদানি, বেতের ধামা, জুতার র‍্যাক, মোড়া, ফুলদানি ইত্যাদি।

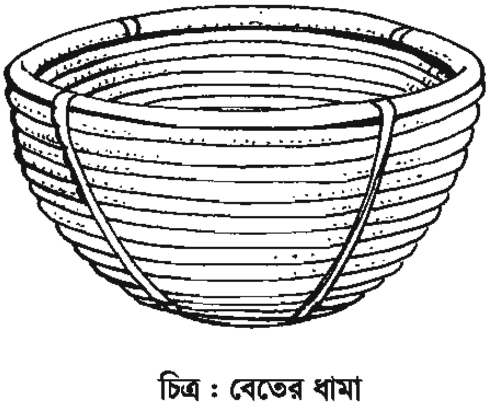

চিত্র : বেতের ধামা

মিশ্রশিল্প

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক, নাইলন, স্টিল ইত্যাদি মিশ্রণ করে যেসব দ্রবাদি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। মোটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্রশিল্প হিসাবে দোলনা, মোড়া, র‍্যাক, সেলফ, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার সরু বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্লাস্টিকের বেতি মোটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খাট, বাক্স, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

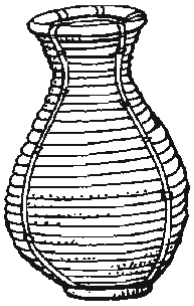

চিত্র : ফুলদানি

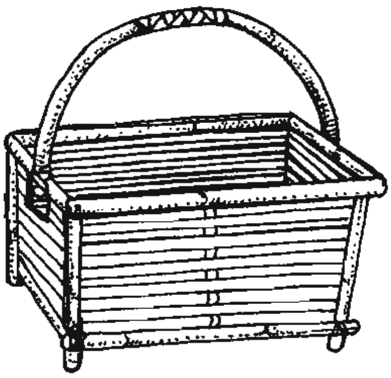

চিত্র : ফুলের সাজি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঔষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

ঔষধি উদ্ভিদ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে হরেক রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বহুবিধ উপায়ে এসব উদ্ভিদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের সকল চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা বিশাল উদ্ভিদরাজির উপর নির্ভরশীল। এসম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা দেখেছি বা শুনেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোটদের সর্দি কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এর ফলে তাদের সর্দি-কাশি উপশম হয় এবং তারা আরাম পায়। হঠাৎ করে কারও শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে গাঁদা ফুলের পাতা বা দূর্বাঘাস ভালো করে ধুয়ে শীলপাটায় বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে পরিবেশের যেসব উদ্ভিদ আমাদের রোগ ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ে ব্যবহার হয়, সেগুলোকেই ঔষধি উদ্ভিদ বলা হয়।

ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ

আমাদের দেশ এক সময় ঔষধি উদ্ভিদে সমৃদ্ধ ছিল। মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, বন-জঙ্গল সর্বত্র অসংখ্য ঔষধি উদ্ভিদে ভরপুর ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমির বহুবিধ ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া অজ্ঞতা, অবহেলা ও অযত্নের কারণে বর্তমানে এসব ঔষধি উদ্ভিদের প্রধান উৎপত্তিস্থল প্রাকৃতিক উৎস বনভূমি কমে যাওয়ায় ঐসব মূল্যবান বৃক্ষ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। এখনও আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে যথেষ্ট ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলো আমরা চিনি না। এমনকি সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। চারপাশের এসব ঔষধি উদ্ভিদসমূহ শনাক্ত করতে পারা এবং সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের রোগব্যাধি নিরাময়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারব।

ঔষধি উদ্ভিদ

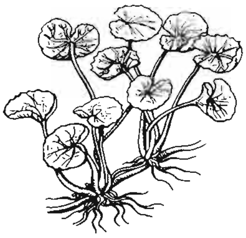
থানকুনি

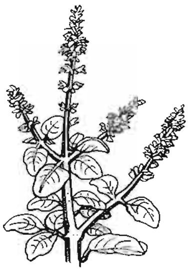
তুলসী

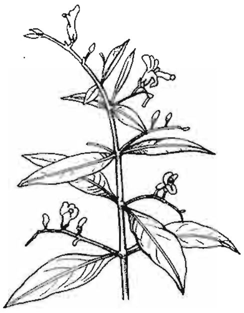
কালমেঘ

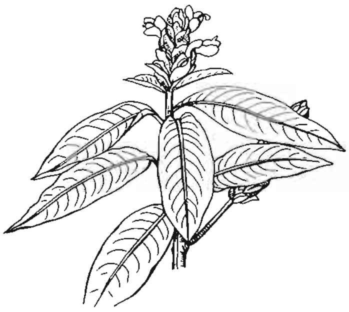
বাসক

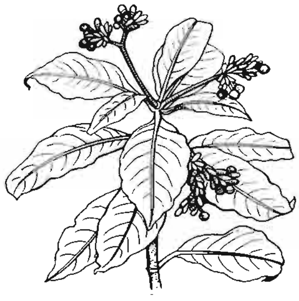
সর্পগন্ধা

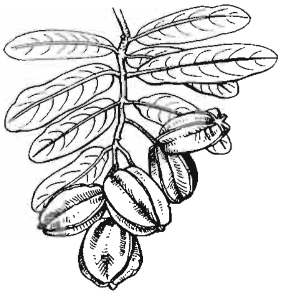
অর্জুন

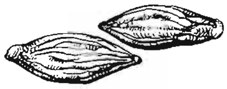
হরিতকী

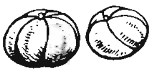
আমলকী

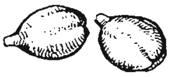
বহেড়া

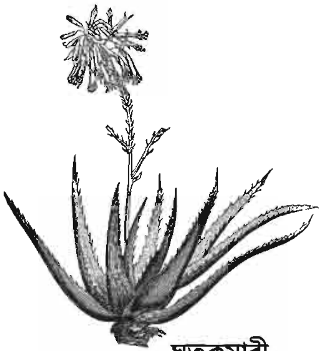
ঘৃতকুমারী

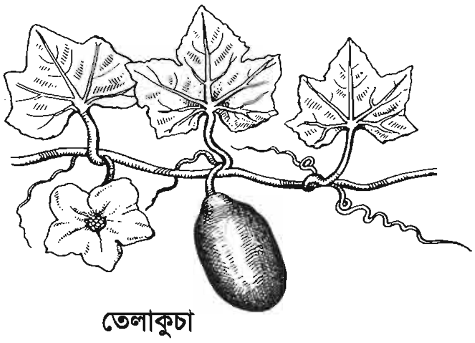
তেলাকুচা

কাজ : শিক্ষক নমুনা ঔষধি উদ্ভিদ শ্রেণিতে নিয়ে আসবেন, সেগুলো শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদের নামের তালিকা তৈরি করবে।

ঔষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে রোগব্যাধি উপশমে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব উদ্ভিদকে ঔষধি বা ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদের পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

১। **থানকুনি :** থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে মূল এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল বৃক্কের মতো, একান্তর।

ব্যবহার্য অংশ : সমস্ত উদ্ভিদ

ব্যবহার : ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময়ে থানকুনি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া থানকুনি আয়ুবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমরক্ত নাশক, চর্মরোগনাশক।

২। **তুলসী :** তুলসী অতিপরিচিত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি সাধারণত ৩০ সেমি হতে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ডিম্বাকার, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েদের তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

৩। **কালোমেঘ :** এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ২০ সেমি থেকে ১ মিটার উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিতা। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : সমস্ত গাছ, বিশেষ করে পাতা

ব্যবহার : ছোট ছেলে-মেয়েদের জ্বর, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এর রস একটি অত্যন্ত ভালো ঔষধ।

৪। **বাসক :** গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি।

ব্যবহার্য অংশ : পাতার নির্যাস

ব্যবহার : কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস খেলে কার্যকরী হয়।

৫। **সর্পগন্ধা :** সর্পগন্ধা একটি বহুবর্ষজীবী বিরুৎ। প্রতিপর্বে সাধারণত ৩টি পাতা থাকে। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহার্য অংশ : মূল বা ফলের রস

ব্যবহার : সর্পগন্ধার মূলের বা ফলের রস উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত হয়। পাগলের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

৬। **অর্জুন :** অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহদাকৃতির বৃক্ষ। কাণ্ড সরল উন্নত, মসৃণ এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ডিম্বাকৃতির। ফুল হলুদাভ ক্ষুদ্রাকৃতির, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ

ব্যবহার : কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভালোভাবে বেটে তার রস চিনি ও দুধের সাথে প্রত্যহ সকালে সেবনে যাবতীয় হৃদরোগ আরোগ্য হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। ছালের রস সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপশম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের চূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয়। অর্জুনের ছালের মিহি গুঁড়া মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেচতার দাগ মিলিয়ে যায়।

৭। **হরিতকী :** বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃন্তক। ফুল শ্বেতবর্ণ ও ছোট হয়। ফল লম্বাকার হালকা খাঁজযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ : ফল ও কাঠ

ব্যবহার : আয়ুর্বেদিক ঔষধ ত্রিফলার অন্যতম ফল হরিতকী। হরিতকী ফল চূর্ণ করে একটু লবণ মিশিয়ে সেবন করলে অর্শ্বরোগ নিরাময় হয়। হরিতকী চূর্ণ পাইপে ভরে ধূমপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। যে কোনো ক্ষতে হরিতকী পোড়া ছাইয়ের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়। চিনি ও পানির সাথে হরিতকী চূর্ণ ব্যবহার করলে চোখ উঠা ভালো হয়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাকাফল রক্তশূন্যতা, পিত্তরোগ, হৃদরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য। ফলচূর্ণ দন্তরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী বলবৃদ্ধিকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বার্ধক্য নিবারক।

৮। **আমলকী :** মাঝারি আকারের বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, উপপত্র বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ। ফল রসাল, মাংসল, সবুজ, গোলাকৃতি, মুখরোচক ও উপাদেয়। মার্চ থেকে মে মাসে ফুল আসে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল

ব্যবহার : আমলকী পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক এবং টনিক। ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃৎ , পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজম ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। আমলকীর ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, জন্ডিস, চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, চুল পড়া, প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

৯। **বহেড়া :** এটি একটি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বোঁটা লম্বা। ফুল সবুজাভ সাদা, ডিম্বাকৃতির। ফলে একটি করে বীজ থাকে। ফল গোলাকৃতির বা ঈষৎ লম্বাটে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল

ব্যবহার : ত্রিফলার অন্যতম ফল বহেড়া। বীজের শাঁস (বাদামের মতো) দুইএকটি করে দুঘণ্টা অন্তর এবং দিনে দুইটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেড়া চূর্ণ সকাল-বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। ফল পেটের পীড়া, অর্শ্ব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং চুল পড়া বন্ধ করে।

১০। **ঘৃত কুমারী :** বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লম্বা, কিনারা খাঁজ কাটা, রসাল।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস।

ব্যবহার : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসু ঔষধ। এটি ক্ষুধামন্দা, জন্ডিস, লিউকোমিয়া, অর্শ্বরোগ, কাটা-পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ অবদান রাখে। প্রসাধন দ্রব্যে এর মিশ্রণে প্রসাধনের মান উন্নত হয়।

১১। **তেলাকুচা :** এটি লতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বন বাদাড়ে আপনা-আপনি এ গাছ, জন্মাতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাণ্ড ও পাতা

ব্যবহার : এ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার নির্যাস ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এর নির্যাস সর্দি, জ্বর, হাপানি ও মূর্ছারোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এর পাতা বাটার প্রলেপ বেশ উপকারী।

কাজ : ঔষধি উদ্ভিদের নাম ও ব্যবহার নিয়ে দলীয় আলোচনা উপস্থাপন কর।

ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোগ নিরাময় উপশমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির পিছনে ঔষধি উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের নিকট ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময় খুবই জনপ্রিয়। কারণ ঔষধি উদ্ভিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা এবং তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এ কারণে বর্তমানে ঔষধি গুণসম্পন্ন আয়ুর্বেদী ও ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থাও আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষ চরমে পৌঁছালেও মানুষ আবার সেই প্রাচীন ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। পৃথিবীর বহুদেশ ভেষজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষধশিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

কাজ : 'রোগ নিরাময়ে ঔষধি গাছপালা' এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পোকা ধানের দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে ?

ক. মাজরা পোকা
খ. পামরি পোকা
গ. গান্ধি পোকা
ঘ. চুঙ্গী পোকা

২. গাজী ধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. গাছ খাটো হয়।
ii. পাতা হেলানো থাকে
ii. ফলন বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. কোনটি পাটের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ?

ক. কাণ্ডে কালো বেষ্টনীর মতো দাগ থাকে।
খ. কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ হয়।
গ. আক্রান্ত স্থান ফেটে যায়।
ঘ. কাণ্ডে কালচে দাগ হয়।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি মিয়া একজন পাট চাষি। তিনি এ বছর তার দুই খণ্ড জমিতে সিসি-৪৫ ও চিন সুরা গ্রিন জাতের পাটের চাষ করেন। তিনি সিসি-৪৫ জাতের পাট আষাঢ় মাসে ও চিন সুরা গ্রিন জাতের পাট ভাদ্র মাসে কাটেন। তিনি প্রতি খণ্ড থেকে ১৫০০ টি করে আঁটি পান। পাট জাগ দেওয়ার সময় তিনি ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন।

৪. তাসফি মিয়া দুই খণ্ড জমির পাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাটার কারণ-

i. ফসলের পরিপক্বতা ভিন্নতা হওয়ায়

ii. জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য

iii. ফসলের জাতের ভিন্নতা থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. তাসফি মিয়ার পাট পচানোর জন্য কত কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন?

ক. ১৫ কেজি খ. ২০ কেজি

গ. ২৫ কেজি ঘ. ৩০ কেজি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আয়শা বেগম বিল অঞ্চলে উঁচু ভিটে বাড়িতে বসবাস করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ৫ শতক জমিতে পালংশাক চাষ করে সফলতা লাভ করলেন। এ সফলতার পর তিনি বিলে অবস্থিত তার জমিগুলোর উঁচু আইলেও পালংশাক চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

ক. পালংশাকের একটি জাতের নাম লেখ।

খ. পালংশাক চাষে 'ইউরিয়া সার' উপরি প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আয়শা বেগম জমিতে কী পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করেছিলেন নির্ণয় কর।

ঘ. আয়শা বেগমের পরিকল্পনা তাঁর কৃষি কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ কর।

২.

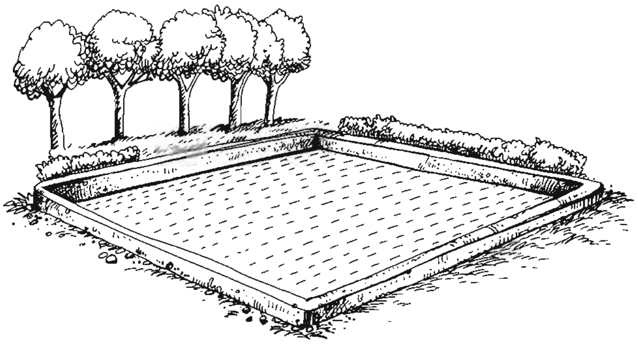

চিত্র - ক

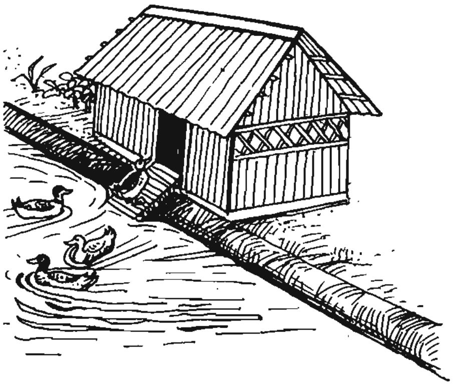

চিত্র - খ

ক. সমন্বিত চাষ কাকে বলে ?

খ. সমন্বিত চাষে ভূমির ব্যবহার দ্বিগুণ হয় কীভাবে ? ব্যাখ্যা কর ।

গ. চিত্র ক ও খ-এ উল্লিখিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটির উৎপাদন খরচ কম কারণ ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. পরিবারের আয় ও পুষ্টি বৃদ্ধিতে চিত্রে উল্লিখিত কোন পদ্ধতিটি উত্তম–যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর ।

৩. মেঘনার তীরের বাসিন্দা কৃষক তোরাব তার দুই একর জমিতে পাট চাষ করলেন । কিছুদিন পর তার পাটের জমিতে শুঁয়োযুক্ত এক ধরনের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হলো । তোরাব বিচলিত না হয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকা দমন করলেন । ফলে তার জমিতে পাটের আশাতীত উৎপাদন হওয়ায় পরবর্তী বছর এলাকার অন্যান্য কৃষকরা তাদের জমিতেও পাট চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ।

ক. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?

খ. স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও পাটের বীজ বেশি বোনার কারণ ব্যাখ্যা কর ।

গ. কৃষক তোরাব আলীর জমিতে পোকা দমন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. কৃষকদের সিদ্ধান্ত ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু সুফল বয়ে আনবে তা মূল্যায়ন কর ।

পঞ্চম অধ্যায়

বনায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছলাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বলা হয় বনায়ন। বনায়নের ফলে বনভূমি হতে সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বসতবাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধের ধার, পাহাড়ি অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সৃজিত বনায়নকে বলা হয় সামাজিক বনায়ন।

বাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি ও তা সংরক্ষণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। কোনো দেশের বা অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে বড় বড় বৃক্ষরাজি ও লতা-গুল্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বনকেই বনভূমি বলা হয়। এসব বনভূমি কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় ও গড়ে উঠে। আবার কখনো মানুষ তার প্রয়োজনে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শুধুমাত্র ১০ ভাগ। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি, ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব। এছাড়াও বন সংরক্ষণ বিধি, বন নার্সারি, বন নার্সারির বীজ, বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ এবং উপকূলীয় বনায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

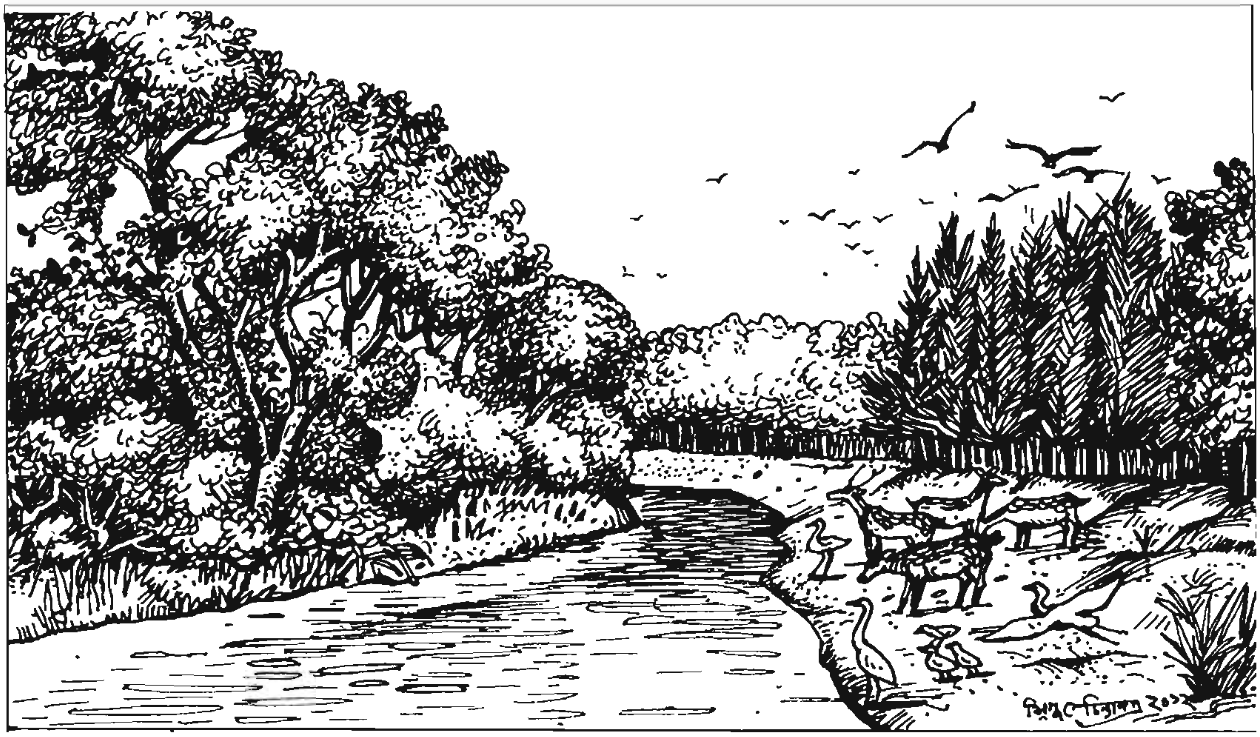

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারব ।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ।
- বন সংরক্ষণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বন নার্সারি ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বন নার্সারির বীজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ।
- বন নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- তক্তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ।
- গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- উপকূলীয় বনায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ।
- উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ । আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর । বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ । এই বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয় । অধিকাংশ বনভূমি দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত । দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম ।

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন

বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন ২। সমতলভূমির বন ৩। ম্যানগ্রোভ বন ৪। সামাজিক বন ৫। কৃষি বন

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ দেখানো হলো–

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চল (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সৃজিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

পাহাড়ি বন

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বন অবস্থিত। বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে এ বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পাহাড়ি গাছ হচ্ছে- গর্জন, রাজকড়ই, চাপালিশ, তেলসুর, কড়ই, গামার, চম্পা, জারুল, সেগুন, বন্য আম প্রভৃতি। পাহাড়ি বন এলাকায় নানা ধরনের বাঁশও জন্মে থাকে। এসব বাঁশের মধ্যে বরাক, মূলী, উরা, মরাল, তল্লা, কেইট্টা, নালা প্রভৃতি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে হাতি, বানর, শুকর, ভালুক, বনমুরগি, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিভিন্ন রকমের পাখি ও কীট পতঙ্গ পাহাড়ি বনাঞ্চলে দেখা যায়। বড় বড় গাছপালা ছাড়াও লতা-গুল্মসহ অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাহাড়ি বনাঞ্চলে জন্মে থাকে। দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পাহাড়ি বনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ বনের পরিমাণ ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।

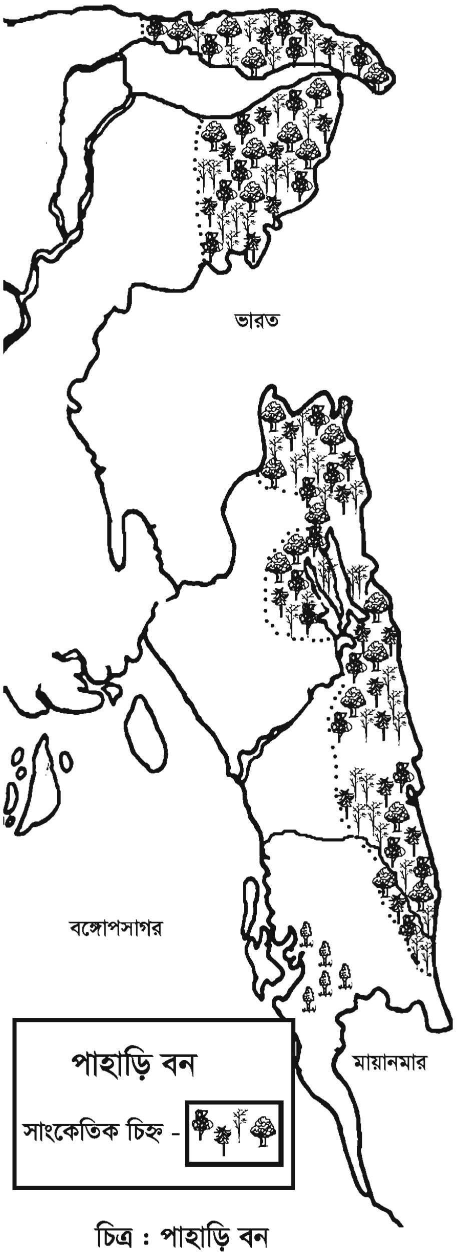

চিত্র : পাহাড়ি বন

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি, এছাড়া কড়ই, রেইনট্রি, জারুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান বনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনগনের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল ও শালিক দেখা যায়। এ বনের মোট পরিমাণ ১.২৩ লক্ষ হেক্টর।

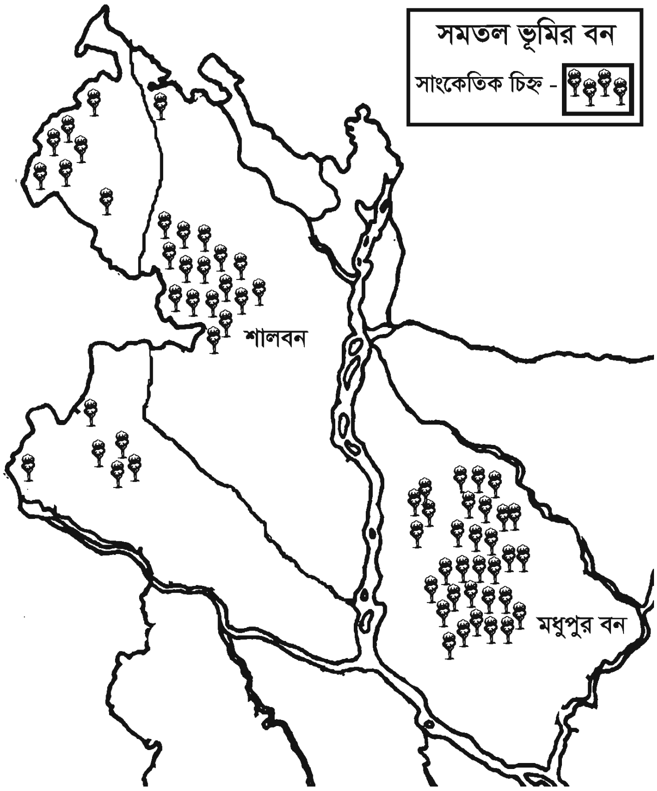

চিত্র : সমতলভূমির বন

ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যহ সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে লোনা পানির বনও বলা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা ম্যানগ্রোভ বলে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। সুন্দরি বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের উর্ধ্বমুখী বায়বীয় মূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। এ বনের গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ হলো- গেওয়া, গরান, পশুর, কেওয়া, বাইন, কাকড়া, গোলপাতা ও মোটা বেত। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগর, বিচিত্র

রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কুমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দরবন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও সম্পদশালী ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। এ বনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের ৩টি জায়গায় ম্যানগ্রোভ বনভূমি রয়েছে। যথা- ১। চকোরিয়া সুন্দরবন ২। টেকনাফ উপকূল ৩। বৃহত্তর খুলনার সুন্দরবন।

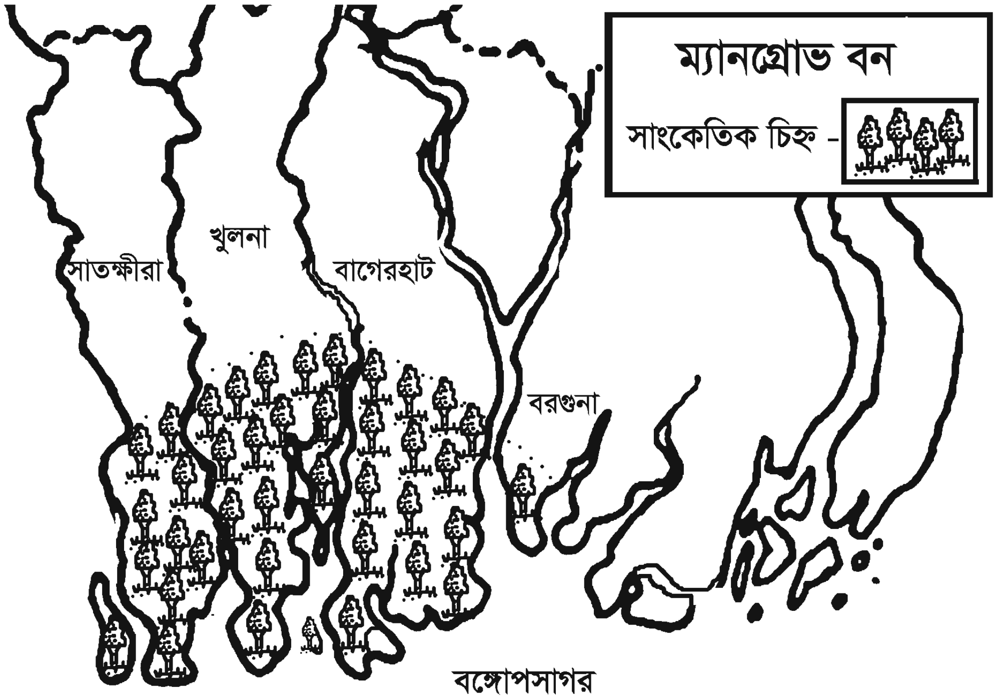

চিত্র : ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

গ্রামীণ বন: বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে গ্রামীণ বন রয়েছে, মানুষ বসতভিটা, পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে এসব বন গড়ে তোলে।

কাজ - ১ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিচের ছকের কাজটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করবে।

বনের নাম	অবস্থান	উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ	বসবাসকারী প্রাণী
১। পাহাড়ি বন			
২। সমতল ভূমির বন			
৩। ম্যানগ্রোভ বন			

কাজ - ২ শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখে বিভিন্ন বনের অবস্থান চিহ্নিত করবে।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বনে মজুদ থাকা কাঠের পরিমাণকে গ্রোয়িং স্টক বলা হয়। এই গ্রোয়িং স্টক এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

বন ভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

বনের ধরন	মজুদ কাঠের পরিমাণ মিলিয়ন* ঘন মিটার
পাহাড়ি বন	২০.৭১
ম্যানগ্রোভ বন	১২.৩২
সমতল ভূমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মোট	৮৮.৯১

* মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় চরাঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

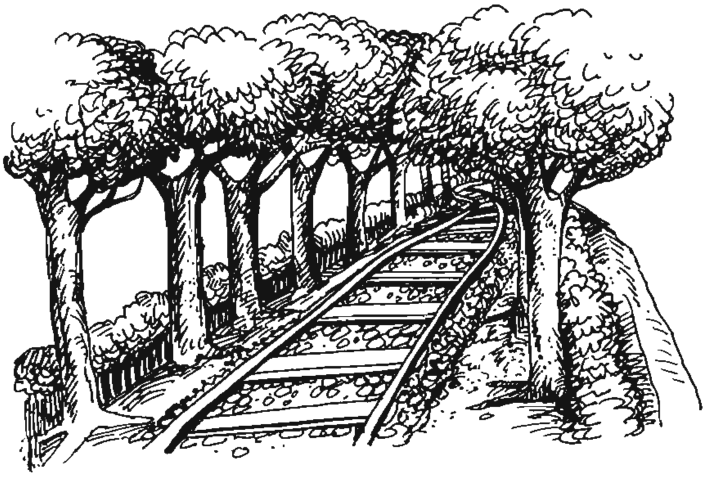

চিত্র : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

১। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণ।

২। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র বিমোচন।

৪। পশুখাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজন।

৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও মরুবিস্তার রোধ করা। ভূমিক্ষয় রোধ করা।

৭। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

কাজ- দলগত কাজ

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার ম্যাপ পোস্টার কাগজে তৈরি কর।

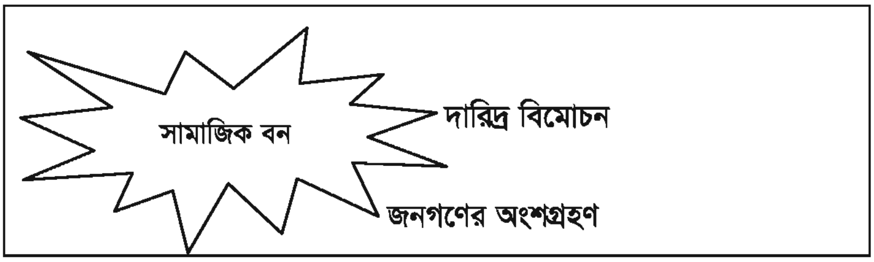

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য : কৃষি বন

পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। কৃষি বনায়ন হলো কোনো জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক ধরনের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

১। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

২। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটায় উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়।

৩। খামারের উৎপাদন স্থায়িত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।

৪। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

৫। প্রান্তিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার হয়।

৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।

৭। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।

৮। কৃষি বনে উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যায়।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

১। ফসলবন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।

২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।

৩। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ। মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।

৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু জমি সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২। খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

৩। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

৪। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র হটানো।

৫। এলাকাভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।

৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

৭। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

৮। মাটির-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।

৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।

১০। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে দুইটি করে বনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত। এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলোও আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা “বন আইন, ১৯২৭” নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন

করে যা “বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০” নামে পরিচিত। এ আইনের পর অবৈধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বটে কিন্তু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তাহলো-

১। সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোনো বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

২। এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে ন্যূনতম তিনমাস এবং অনধিক চার মাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন।

৩। সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নেই। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা-

১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।

২। অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোনো স্থানে প্রেরণ।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা।

৪। বনাঞ্চলে গবাদিপশু চরানো।

৫। প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।

৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।

৭। বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিদ্র করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।

৮। বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।

৯। বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।

১০। বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

১১। যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে গর্ত খোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।

১২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করা।

বন আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান

বন আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য ন্যূনতম ছয় মাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘনকারীকে আদালত ছয় মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

কাজ : বন বিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি নিয়ে দলীয় আলোচনা কর। এ সম্পর্কীয় পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশে বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজসম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারির কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজসম্পদ চুরি ও পাচার করে এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সৃজিত সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বংসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বন সংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন নার্সারি

বন নার্সারি

আভিধানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয়। নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব। নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয়।

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

এমন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। তা না হলে অঙ্কুরোদগমের হার কমতে থাকে। এসব প্রজাতির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন- গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। ভালোমানের বাগান করতে প্রয়োজন উন্নতমানের সুস্থ, সবল চারা। এ ধরনের চারা নার্সারিতে তৈরি করা যায়। আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য তাহলো-

- সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন বয়সের চারা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।
- অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
- কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।
- স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প খরচে অনেক চারা পাওয়া যায়।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

- নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায়।
- নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
- নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয়।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপণ করা হয়।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারির ধরন : নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন– ১. মাধ্যম ভিত্তিক ২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক ৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক ৪. ব্যবহার ভিত্তিক

১। মাধ্যম ভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয়। পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা খরা, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছ থেকে গাছে রোগ সংক্রমণ কম হয়। এ পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বেডের মাটি উর্বর হতে হয়।

২। স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের যেমন–

ক. স্থায়ী নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে। স্থায়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায়। গ্রিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অস্থায়ী নার্সারি

এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণে বেগ পেতে হয়।

৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরনের যেমন–

ক. গার্হস্থ্য নার্সারি

পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল, ফল ও কাঠের চারা উত্তোলন করা হয়।

খ. ব্যবসায়িক নার্সারি

এ নার্সারিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফল, সবজি, ফুল, কাঠ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উত্তোলন করে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৪। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে বন নার্সারি পরিদর্শন করে বৃক্ষের তালিকা তৈরি করবে।

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুণ সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে

যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন : মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারি গাছকে নির্বাচন করা। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে এক বা একাধিক উৎস হতে মাতৃগাছ শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি
২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা বনাঞ্চল
৩) রাস্তার পাশের বৃক্ষ

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

১। **ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ :** বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুন, গর্জন, শাল, কদম, পিতরাজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।

২। **গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ :** এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ব হবে তখন দা বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ফলে মাটি হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড জাতীয় - বাবলা, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল- মেহগনি, চম্পা, গ) কোণ-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে শুকাতে হবে। এরপর পড, ক্যাপসুল বা কোণ ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।

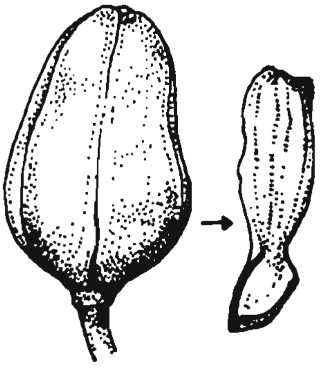

চিত্র : মেহগনির ক্যাপসুল

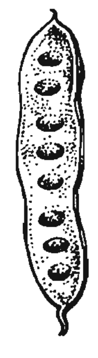

চিত্র : কড়ই এর পড

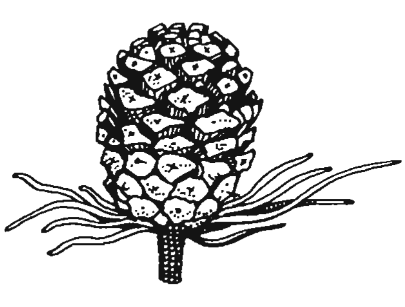

চিত্র : পাইন কোণ

বীজ নিষ্কাশন : ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাঁস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

১। **বাছাই পদ্ধতি :** যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ। সেগুন বীজ রোদে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

২। **শুকনো পদ্ধতি :** জারুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেনজিয়াম, বাবলা, মেহগনি, কড়ই গাছের বীজ শুকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে যখন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।

৩। **পচন পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়, তারপরে বাতাসে শুকাতে হয়। যেমন– আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি।

বীজ সংরক্ষণ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে বিছিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফ্রিজারেটরে এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

কাজ : বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হর্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

১। স্থান নির্বাচন

আলোবাতাসপূর্ণ খোলা মেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি উঠে না এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সম্পন্ন হবে। উন্নত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয়

এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সেমি x ১০ সেমি	৬৫ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	৪৫ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	২৬ টি
সীড বেডে চারা হতে চারার দূরত্ব	**প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা**
৫ সেমি x ৫ সেমি	৪০০ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	২০০ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	১০০ টি

৩। বেড়া নির্মাণ

অনিষ্টকারী জীবজন্তু ও পথচারীদের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার। স্থায়ী নার্সারিতে বেড়া দেওয়ার উপায়-

ক) **ইটের দেয়াল :** স্থায়ী নার্সারির চার দিকে উঁচু ইটের দেয়াল নির্মাণ করে বেড়া দেওয়া যায়।

খ) **কাঁটা তারের বেড়া :** স্থায়ী নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া সহজে দেওয়া যায়।

গ) **লোহার জালের বেড়া :** লোহার জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবন্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। কাঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াতেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।

ঘ) **জীবন্ত গাছের বেড়া :** দূরন্ত বা কাঁটা মেহেদী, মেন্দী, ঢোল কলমী প্রভৃতি জীবন্ত গাছ দিয়ে নার্সারির চার দিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪। ভূমি উন্নয়ন

নার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। নার্সারি বেড তৈরির স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। মাটি তৈরির সময় বৃষ্টির বা সেচের পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালু ও ড্রেন করতে হবে। ভূমির মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫। অফিস ও আবাসিক এলাকা

নার্সারির অফিস ঘরটি প্রধান রাস্তার পার্শ্বে মূল গেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। নার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬। বিদ্যুতায়ন

স্থায়ী নার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭। রাস্তা ও পথ

নার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান রাস্তা থাকা আবশ্যক। প্রধান রাস্তাটি পরিকল্পিতভাবে নার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮। সেচ ব্যবস্থা

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের শুরুতেই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। নর্দমা ও নালা

নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থায়ী নার্সারিতে এগুলো পাকা করতে হবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০। নার্সারি ব্লক

নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লককে আবার কয়েকটি সীড বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। গ্রিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদিও সুবিধামতো বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১। নার্সারি বেড

বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

ক) সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেড : এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির মাটি কোদাল বা লাঙল দিয়ে আগলা করতে হবে। সব রকম আগাছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার × ৩ মিটার × ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।

খ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি : এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সেমি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থী মাদরাসার নিকটবর্তী যে কোনো একটি বনজ নার্সারি পরিদর্শন করবে। নার্সারিতে যে সব বৃক্ষের চারা আছে তার তালিকা তৈরি করে দলগতভাবে শিক্ষককের কাছে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ আমাদের অতিমূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হয় তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে। সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়। তবে যেসব গাছ সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার। গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে।

এরপর কাঠের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীত্বকাল বেশ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ পরিচ্ছেদে আমরা বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, তক্তা পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করব।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

বৃক্ষের চারা রোপণ থেকে শুরু করে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপক্বতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে। পরিপক্ব হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না। বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

১। **স্বল্প আবর্তন কাল** : যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য ও মণ্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয়। সাধারণত ১০-২০ বছর আবর্তনকালে এসব বৃক্ষ কর্তন করা হয়। যেমন-আকাশমনি, কদম, শিমুল, তেলিকদম, কেওড়া, বাইন, বাবলা, ঝাউ, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।

২। **মাঝারি আবর্তনকাল** : আংশিক শক্ত কাঠ প্রদায়ি প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন-গামার, শিশু, আম, কড়ই, খয়ের, বকুল, হরিতকী, ছাতিয়ান, চন্দন, রেন্ডি কড়ই বা রেইনট্রি ইত্যাদি।

৩। **দীর্ঘ আবর্তনকাল** : শক্ত জাতীয় কাঠ ও ধীর বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ শুধুমাত্র কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন- সেগুন, গর্জন, শাল, জারুল, শীলকড়ই, মেহগনি, তেলসুর, চাপালিশ, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি

- গাছ যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে। সাধারণত মাটির ১০ সেমি উপরে গাছ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়।

- গাছ কাটার পূর্বে ডালপালা ছেটে নিলে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয় ।
- গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে । এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব । প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেলতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে । পরবর্তীতে আগের মতই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে এবং কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিতে হবে । এতে গাছ কাঙ্খিত দিকে পড়বে ।
- কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খণ্ডিত করতে হবে । তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে । খণ্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ । এ লগকে করাত কলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার উপযোগী চেরাই কাঠে পরিণত করা হয় । চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে । চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমি এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সেমি হলে তাকে বলা হয় তক্তা ।
- গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সেমি উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সেমি উপরে । এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয় । এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয় । কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক ।

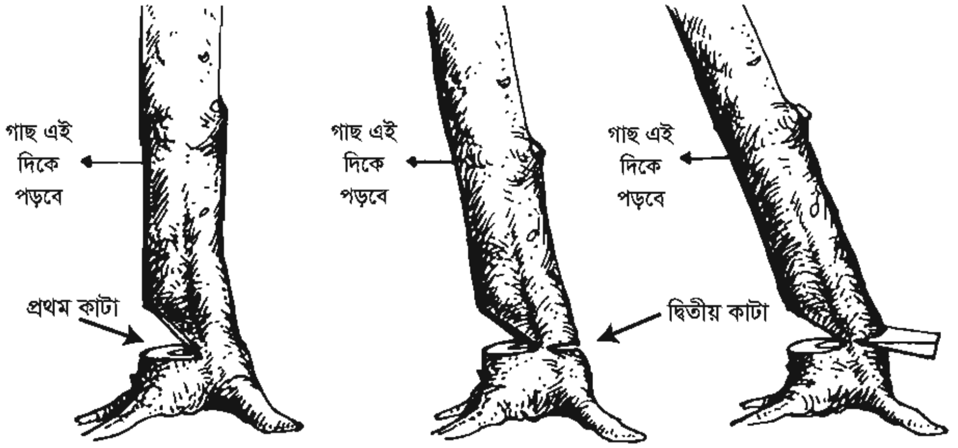

চিত্র : গাছ কাটার পদ্ধতি

গোলকাঠ ও চেরাই কাঠের পরিমাপ পদ্ধতি

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্যে বের করতে হয় ।

সূত্র :

$$\text{ভলিউম} = \text{০.০৮} \times \frac{(\text{বেড় ১})^{\text{২}} + \text{৪} \times (\text{বেড় ২})^{\text{২}} + (\text{বেড় ৩})^{\text{২}}}{\text{৬}} \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

দৈর্ঘ্য ও বেড় মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটার ।

উদাহরণ : একটি গর্জন গাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ । এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার । লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত ?

$$\text{সমাধান : ভলিউম} = ০.০৮ \text{ x } \frac{(\text{বেড় ১})^২ + ৪ \text{ x } (\text{বেড় ২})^২ + (\text{বেড় ৩})^২}{৬} \text{ x দৈর্ঘ্য}$$

$$= \left\{০.০৮ \text{ x } \frac{(১.৫)^২ + ৪\ (২)^২ + (২.৫)^২}{৬} \text{ x } ৬\right\} \text{ঘনমিটার}$$

$$= \left\{০.০৮ \text{ x } \frac{২.২৫ + ৪ \text{ x } ৪ + ৬.২৫}{৬} \text{ x } ৬\right\} \text{ঘনমিটার}$$

$$= \left\{০.০৮ \text{ x } \frac{২৪.৫}{৬} \text{ x } ৬\right\} \text{ঘনমিটার}$$

$$= \left\{০.০৮ \text{ x } ২৪.৫\right\} \text{ঘনমিটার}$$

$$\text{ভলিউম} = ১.৯৬ \text{ ঘনমিটার}$$

ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাপ

গোলকাঠ চেরাইকালে কিছুটা অপচয় হয়। সবটুকু কাঠই ব্যবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ ব্যবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হপ্পাস এর সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়।

$$\text{সূত্রঃ ভলিউম} = \left\{\frac{\text{লগের মাঝের বেড়}}{৪}\right\}^২ \text{ x দৈর্ঘ্য}$$

তক্তা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাপ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খণ্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

ভলিউম = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x পুরুত্ব

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটারে।

কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট

জীবন্ত অবস্থায় বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের গুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সহজে ঘুনপোকা, পোকা-মাকড় বা ছত্রাক আক্রমণ করতে পারবে না। বেশি দিন টিকবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়ার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে। সিজনিং দুইভাবে করা যায়-

১। এয়ার ড্রাইং

গাছ কেটে চেরাই করার পর বাতাসে কাঠ শুকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রখর রোদে শুকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় স্তরে স্তরে শুকাতে হয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ফালি এলোমেলোভাবে বা বাঁকা করে সাজানো যাবে না। এতে করে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং হতে কমপক্ষে এক মৌসুম লাগে এবং আর্দ্রতার পরিমাণ ২০% এর কাছাকাছি থাকে।

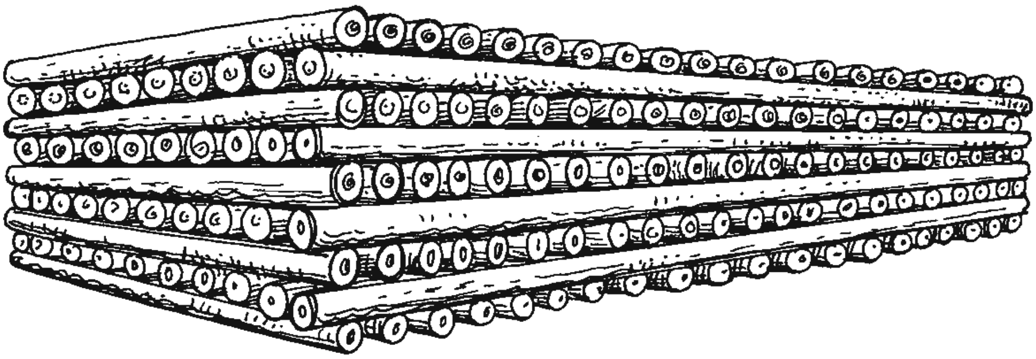

চিত্র : এয়ার ড্রাইং

২। কিলন পদ্ধতি

সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজন করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থানে ৩-৪ সেমি পুরু দুইটি কাঠের টুকরা দুইপাশে বসাতে হবে যাতে দুটি তক্তার মধ্যখান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতঃপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

কাঠ ট্রিটমেন্টের মূলনীতি হলো দ্রবণাকারে রাসায়নিক দ্রব্য কাঠ ও বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। সিসিএ (CCA) নামের রাসায়নিক দ্রব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি ৩টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪%, সিসিএ এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্যে থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপক্বতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে ?

২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন ?

৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন ?

৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা ?

৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় ছেয়ে যেতে পারে কিনা ?

৬। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপড়ে পড়ে স্থাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা ?

৭। গাছ কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা ?

৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা ?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খণ্ডিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গোলকাঠ বা তক্তা পরিমাপ করে সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখে জমা দেব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রাকৃতিক বন রক্ষা ও সৃষ্টি হুমকীর মুখে পতিত হয়েছে। এসব উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য সারা দেশের পরিবেশের উপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য বিস্তৃর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা রোধী, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ এবং লবণাক্ততা সহ্যকারী ফসলের চাষ করে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা ছাড়াও উপকূলবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য (ঝাউ গাছ ও দেবদারু গাছ)

উপকূলীয় বনাঞ্চলকে লোনামাটির অঞ্চলও বলা হয়। লোনা মাটির অঞ্চল বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশালের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও তৎসংলগ্ন জেগে উঠা চরাঞ্চলসমূহ। এসব অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ - নারিকেল, আমড়া, খেজুর, বাবলা, কাজুবাদাম, শিরিষ, রেইনট্রি, তাল, তেঁতুল, সুপারি, জলপাই ইত্যাদি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ হিসাবে ঝাউ ও দেবদারু গাছও উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্ভিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকায় লবণাক্ততা সহ্য করে উপকূলীয় আবহাওয়ার সাথে সহজে খাপখাইয়ে নিতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক লোনাযুক্ত মাটিতে সুন্দরি, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি ভালো জন্মে। লবণাক্ততার সাথে খাপখাওয়াতে এসব উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- উপকূলীয় বনায়নের জন্য বেশি এলাকা জুড়ে শিকড় বিস্তৃত থাকে এরকম গাছ নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য উপকূলীয় বনে নারিকেল, সুপারি বা অন্যান্য একবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিমাণ বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়। এদের শিকড় অনেক এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটির ক্ষয় রোধ করা সহজ হয়। তবে উপকূলীয় বাঁধের বনায়নের ক্ষেত্রে সড়কের পাশের মতো একাধিক স্তরে গাছ লাগাতে হবে। এতে মাটি ক্ষয় কম হবে।
- অন্যান্য বাঁধের মতো উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে যেখানে গাছ লাগানো হয় সে স্থান বেশ ঢালু হয়। তাই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হবে। প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু করা হয়। দূরে দূরে গাছ লাগানো হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ২ মিটার × ১ মিটার। এর ফলে মাটির ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়বে।
- উপকূলীয় উদ্ভিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন পাতার কিউটিকল স্তর খুব পুরু হয়। এ কারণে এসব উদ্ভিদ খরা প্রতিরোধক হয়।
- ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোনের মতো দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে। কারণ এসব উদ্ভিদের কাণ্ড বেশ লম্বা ও শক্ত হয় এবং শাখা-প্রশাখা কম হয়। যেমন- নারিকেল, গজারি, খেজুর, তাল, ঝাউ,

আকাশমনি, বাবলা, দেবদারু প্রভৃতি ।

- উপকূলীয় বাঁধসমূহ দুর্যোগের সময় গরু-ছাগলের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কাজেই গাছ লাগানোর সময় গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এরকম গাছও লাগাতে হয় । যেমন- ইপিল ইপিল, আকাশমনি, ধৈঞ্চা প্রভৃতি ।
- যে সব উদ্ভিদ জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে উপকূলীয় বনায়নের জন্য সে সব উদ্ভিদ লাগাতে হবে ।
- উপকূলীয় বনায়নে শক্ত ও লম্বা কাণ্ড এবং ছোট পাতা ও ডালপালা কর্তন সহনীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে । যেমন - শিশু, বাবলা, কড়ই, খেজুর, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদ ।

ঝাউ গাছ

বর্ণনা : ঝাউ বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ । উচ্চতা ১৫-১৮ মিটারের মতো হয়ে থাকে । বাকল বাদামি ও অমসৃণ । কাঠ খুব শক্ত তবে ফেটে যায় । মে মাসে ফুল হয় । ফল পাকতে এক বছর সময় লাগে । ঝাউ গাছ বনায়নের জন্য বেলেমাটি খুবই কার্যকরী ।

প্রাপ্তিস্থান : প্রধানত উপকূলীয় এলাকা তবে দেশের বিভিন্ন স্থানেও ঝাউ গাছ জন্মে থাকে ।

বীজ : মে-জুন মাসে-বীজ সংগ্রহ করা হয় ।

চারা উত্তোলন : ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাউয়ের চারা উত্তোলন করা হয় ।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : ফল সরাসরি গাছ থেকে পাড়তে হয় । ডালের গোড়ার ফল ভালো পরিপক্ব হয় তাই এ ফল সংগ্রহ করা উত্তম । ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে মাড়াই করে বীজ থেকে খোসা আলাদা করা হয় ।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধক পাত্রে ৫-৭ মাস সংরক্ষণ করা যায় ।

বীজ বপন পদ্ধতি

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে বীজতলায় অথবা পলিব্যাগে বীজ বপন করা হয় । বীজতলা ও পলিব্যাগে পরিশোধিত বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বপন করা সুবিধাজনক । বীজ গজাতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে । চারা গজানোর আগেই ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে । ৪০-৫০ দিন পর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে ।

চারা বাছাই ও রোপণ পদ্ধতি

বীজতলায় অতিরিক্ত চারা গজালে কিছু চারা তুলে ফেলতে হয় । আগাছা বাছাই করতে হয় । পলিব্যাগে চারার শিকড় পলিব্যাগের বাইরে এলে কেটে দিতে হয় । ঝাউ গাছ দ্রুত বর্ধনশীল গাছ । ৬ মাস বয়সী বড় চারা রোপণ করা উত্তম । বালিয়াড়ি ও লোনা মাটিতে ঝাউ গাছ ভালো হয় । এ জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের বনায়নের ঝাউ গাছ লাগানো হয় ।

ব্যবহার

কোনাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সৌন্দর্যের জন্য সড়ক, মহাসড়কের পাশে রোপণ করা হয় । মাটিতে নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় এ গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি লাগানো হয় । জ্বালানি হিসাবে এ কাঠ উৎকৃষ্ট । কাঠ খুব শক্ত তাই খুঁটি ও খড়িকাঠ হিসাবেও ব্যবহার হয় ।

দেবদারু

বর্ণনা : চির হরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড মোটা, সোজা ও অতি উঁচু হয়। সাধারণত শোভাবর্ধন হিসাবে রোপণ করা হয়ে থাকে। গাছ ৫০-৬০ মিটার লম্বা হয় এবং ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, যৌগিক, দেখতে অনেকটা বর্শার মতো কিন্তু কিনারা ঢেউ খেলানো। সাধারণত অক্টোবর মাসে ফুল হয়, ফল পাকে দেরিতে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এ গাছ পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : পাকা ফল কালো রঙের হয়। ফল পাকলে গাছ থেকে বা গাছ তলা থেকে সংগ্রহ করে বস্তায় রেখে পচিয়ে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। দেবদারু বীজ সংরক্ষণ করা যায় না বলে সংগ্রহ করার সাথে সাথে তা বীজ তলায় বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৯০ ভাগ। ৭-১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।

রোপণের সময় চারার বয়স : দেড় থেকে দুই বছর বয়সের চারা সড়কের পাশে, বাগানের ও উপকূলীয় অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসে রোপণ করা উত্তম।

ব্যবহার : দেবদারু কাঠ হালকা ও নরম। টিনের ধারের ফ্রেম, পাটাতন, দেশলাই ও প্যাকিং বক্স তৈরিতে দেবদারু কাঠ ব্যবহার হয়। কাগজের মণ্ড তৈরিতেও দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করা। জ্বালানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনে উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

- এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-নিম্নস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি করে।
- ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীবকুলের বাস উপযোগী করতে সাহায্য করে।
- পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উত্তাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষ ও জীব জন্তুকে রক্ষা করে।
- ভূমিধ্বস, বালিয়াড়ি ও ঝড়রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

- এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে অত্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।
- উপকূলীয় বনায়ন আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাভানা বেষ্টনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ বিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

- উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিসীম। এ বনাঞ্চলে ভ্রমণকারী দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- ফলজ উদ্ভিদ যেমন– নারিকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
- বনাঞ্চলে উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফুল, ফল ও পল্লবগুচ্ছ থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পশুখাদ্য পাওয়া যায়।
- উদ্ভিদরাজির কাণ্ড ও শাখা থেকে জ্বালানি কাঠ, খুঁটি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, যানবাহন, কৃষি উপকরণ, রেলওয়ে স্লিপার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ-

ক. ১২.১৬ লক্ষ হেক্টর
খ. ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর
গ. ১৪.১৬ লক্ষ হেক্টর
ঘ. ১৫.১৬ লক্ষ হেক্টর

২. নিচের কোন বৃক্ষগুচ্ছ পাহাড়ি বনের?

ক. গর্জন, গরান, গামার।
খ. গজারি, গেওয়া, সেগুন।
গ. তেলসুর, চম্পা, চাপালিশ।
ঘ. জারুল, রেইনট্রি, পশুর।

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি অবস্থিত-

i. দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে।
ii. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে।
iii. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তিয়া টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে বনের উপর প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। এক পর্যায়ে সে দেখতে পেল ঐ বনের অধিকাংশ গাছের ফল গাছে থাকা অবস্থায়ই অঙ্কুরোদগম হচ্ছে এবং চারা গাছ গজানোর পর তা মাটিতে পড়ে কাদায় গেঁথে যাচ্ছে।

৫. তিয়ার দেখা অঙ্কুরোদগম নিচের কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

ক. গরান
খ. গামার
গ. গর্জন
ঘ. গজারি

৬. তিয়ার দেখা বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো -

i. মাটি কর্দমাক্ত থাকে।
ii. বায়ুবীয়মূল বিদ্যমান।
iii. শাখামূল দীর্ঘ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতো তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ৪ শতক জমিতে মেনজিয়াম বীজ রোপণ করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সেমি × ১০ সেমি আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে জামান সাহেব ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।

ক. নার্সারি কাকে বলে?

খ. নার্সারি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. জামান সাহেবের নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় কর।

ঘ. জামান সাহেবের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. সুফিয়া বেগম বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লাগানো দুইটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুইটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিল ৩ মিটার।

ক. কাঠ সিজনিং কী?

খ. আবর্তন কালের ভিত্তিতে গামার, শিশু কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা কর?

গ. সুফিয়া বেগমের একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় কর।

ঘ. সুফিয়া বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি সমবায়

একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করাই সমবায়। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি কৃষি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এইরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে। এইরূপ সমবায় দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত হলে সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা কৃষি সমবায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

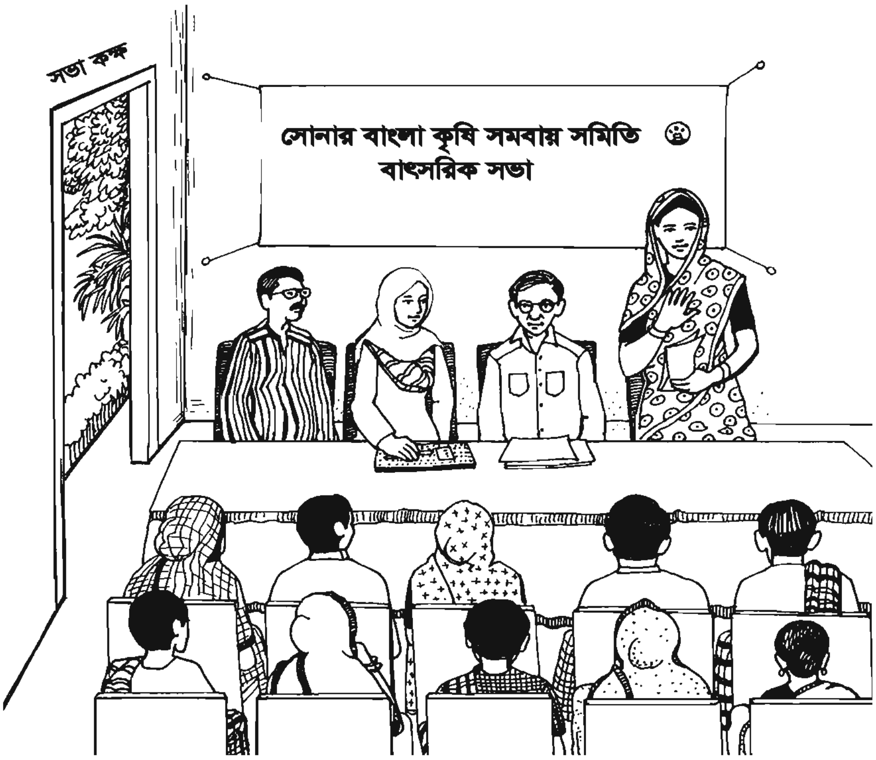
সভা কক্ষ
সোনার বাংলা কৃষি সমবায় সমিতি
বাৎসরিক সভা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- কৃষি সমবায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যাখ্যা করতে পারব
- কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

বিষয়টি বুঝতে খেলা দিয়েই শুরু করা যাক। পাড়ায় বা মহল্লায় কিশোর কিশোরীরা কোনো খেলা, ধরা যাক ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন বা টেবিল টেনিস খেলতে চাও। কী করা যেতে পারে? প্রথম কাজ খেলার সাথি সংগ্রহ করা। খেলার স্থান নির্বাচন করে রেফারি ঠিক করা ও মুরুব্বিদের অনুমতি নেওয়া। এরপর খেলার সামগ্রী, ক্রিকেট হলে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, ব্যাডমিন্টন হলে নেট, নেটের খুঁটি, কর্ক, ব্যাট, টেবিল টেনিস হলে টেবিল, ব্যাট, বল এগুলো কেনা। সাথিরা সবাই মিলে টাকা একত্র করে এগুলো কেনা। আবার তহবিলে কিছু অর্থ যেন থাকে যা থেকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফুরিয়ে যাওয়া সামগ্রী কেনা যায়। আরেকটি অতি দরকারি কাজ হলো, তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করা। একে মোটামুটি বলা যায় যে, সমবায় পদ্ধতিতে খেলা।

কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেও সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একে আমরা বলব কৃষি সমবায়। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক হয়। আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কৃষক উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারেনা। বাম্পার ফলন হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতোটাই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি এলাকায় তাঁদের নিজস্ব ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম থাকতো তাহলে এই আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত। কোনো একজন কৃষকের পক্ষে (খুব বড় ও ধনী কৃষক না হলে) এই সুবিধাগুলো অর্জন সম্ভব না হলেও প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, সাধারণত এটাই সমবায়ের ভিত্তি।

গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: **'দশের লাঠি একের বোঝা'**। অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা বরং সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে।

কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে এবং এভাবে উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। তদুপরি কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়। ফলে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এবার আমরা কৃষি সমবায়ের কিছু উপযোগিতা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

সমবায়ের প্রকার

উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষকগণ নানা ধরনের সমবায় গড়ে তুলতে পারেন।

১। **কৃষি মূলধন সমবায় (সঞ্চয় সমবায়) :** সমবায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ

২। **কৃষি উপকরণ সমবায় :** বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার

৩। **কৃষি উৎপদান সমবায় :** কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

৪। **কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় :** পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষার জন্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে উপস্থাপন করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

কৃষি উপকরণগুলোকে মোটা দাগে আমরা কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা দেখব যে সমবায়ের মাধ্যমে এই সকল উপকরণ যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় তেমনি এ সকল উপকরণের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি জমি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এই উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর চাইতে ক্ষুদ্রতর কৃষি জমির মালিক। এমন কী যাদের আড়াই একর বা তার কিছু বেশি পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে তাঁরাও তাঁদের কৃষিকাজের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে দামি যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নন। যদি কোনোভাবে কিনেও ফেলেন ঐ যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন না। নিজের কাজ শেষে হয় যন্ত্রটি বসিয়ে রাখতে বা ভাড়ায় দিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীগণ সম্মত হলে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক নিচু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন হবে।

পানি : কৃষিকাজের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া কোনো ধরনের কৃষিকাজই চালানো সম্ভব নয়। কয়েক দশক আগে আমাদের দেশে কৃষিকাজের জন্য গভীর নলকূপের সুপারিশ করা হতো। অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে গভীর নলকূপের অতি ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব নয়। সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। জলাধার করা, সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচ নালা বা পাইপে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে, স্বল্প অপচয়ে, সেচের পানি ব্যবহার করা যায়। ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেচ দেওয়ার খরচ তুলনামূলক অনেক কম। তা ছাড়া সেচ ছাড়াও এই জলাধারের পানি অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে লাগে যা লাভজনক।

কৃষি যন্ত্রপাতি : কৃষির আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশুপাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ যত সহজে সমবায়ের মাধ্যমে করা সম্ভব তা ব্যক্তি মালিকানায় সম্ভব নয়। সমবায় পদ্ধতিতে যে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা যে কোনো উন্নত দেশের মানকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

কৃষির জন্য সার, ঔষধ, বীজ, খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও ব্যবহার

বীজ, সার, পালিত পশুপাখি মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিবারক ঔষধেরও একটা বড় অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়। সরকারের কৃষি সেবা সংস্থাগুলোও বীজ,সার,ঔষধ সরবরাহ করে। সমবায় তার বাৎসরিক প্রয়োজন আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারে এবং সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে সেই তথ্য আগেভাগেই সরবরাহ করতে পারে। এতে জাতীয় কৃষি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো সরবরাহযোগ্য উপকরণের মোট চাহিদা সম্পর্কে জেনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

কৃষি ঋণ : কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক। রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করবে। প্রথমত ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় রয়েছে, দ্বিতীয়ত ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তৃতীয়ত যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমবায় দিতে সক্ষম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

কৃষি পণ্য উৎপাদন : পণ্য শব্দটির ব্যবহার বলে দেয় যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনের জন্যই সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। তা সে উৎপাদিত দ্রব্য শস্য, ফুল, ফল, তন্তু, বীজ, বাঁশ, কাঠ, ডিম, দুধ, মাংস, চামড়া, মাছ যাই হোক না কেন। মূল উদ্দেশ্য লাভ বা মুনাফা অর্জন। কৃষি পণ্য উৎপাদন উৎপাদক এবং ভোক্তা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যহানিকর না হয় এবং সেই সঙ্গে যেন পরিবেশবান্ধব হয়, সেই দিকেও লক্ষ রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন জরুরি।

সমবায়টি কোন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত, কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জমি শ্রেণি, মাটির গুণাগুণ, সমবায়ী পরিবারগুলোর বাজারের চাহিদা ইত্যাদি ও পরিবেশবান্ধবতা বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষিপণ্য এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত। কৃষি ক্ষেত্রে এবং খামারে যাতে কোনো রোগবালাইয়ের উপদ্রব না হয়, হলেও যাতে তা কার্যকরভাবে নিরাপদ রাখা যায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি থাকা দরকার। উৎপাদিত দ্রব্য নিরাপদে সংগ্রহ করার বিষয়টিও জরুরি। সংগ্রহের পর সংরক্ষণ পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন বাছাই-ছাটাই, শ্রেণি বিভাজন, প্যাকেটজাতকরণ বা যথাযথ পাত্রে স্থাপন ইত্যাদি কাজও পণ্যের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক হয়। উপযুক্ত সময়ে বিপণনের জন্য কম বেশি সময়ের জন্য পণ্য গুদামজাত করে রাখার প্রয়োজন। কৃষি পণ্য গুদামজাত করতে উপযুক্ত এবং কার্যকর পাত্র যেমন প্রয়োজন, তেমনি গুদামের পরিবেশও সৃষ্টি করতে হয়। ধান, গম, ভুট্টা বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদি পণ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকানোর প্রয়োজন হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রে রেখে পাকা গুদামে রাখতে হয়। খুব ধনী কৃষক না হলে একজনের পক্ষে এই সকল সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সমবায় এই আয়োজন সহজেই করতে পারে। কৃষি পণ্য বিপণনে আরেকটি কার্যক্রম হলো নিরাপদ পরিবহন। পরিবহনের পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর। শস্য পরিবহনে চটের বস্তা উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল-ফলের জন্য কোনোক্রমেই উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্যের কোনোটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার। আবার মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি ব্যবহার করা নিরাপদ হলেও মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনে পানি ভরা বড় পাত্র প্রয়োজন। পোনা এমনভাবে পরিবহন করতে হবে যাতে অক্সিজেনের অভাবে মারা না যায়। ডিম পরিবহনের জন্য বিশেষ পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে ভাঁজ করে হাজার হাজার ডিম এক সাথে পরিবহন করা যায়। আবার দুধ পরিবহনে প্রয়োজন বিশেষ পাত্র। বিপণনের সুবিধার জন্য কৃষি সমবায়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার আগে থেকে চুক্তি সম্পন্ন থাকলে সবচাইতে ভালো হয়। এই আয়োজনও সমবায় ভালোভাবে করতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে বিপণনের হিসাব নিকাশ/রেজিস্ট্রার্ড খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সমবায় সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হলো সেগুলো বিবেচনায় নিলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এই মহৎ কর্মযজ্ঞের সূচনা হয় মাত্র। দ্বিতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো জমি ও অর্থ সমবায়ে যুক্ত করা। তারও আগে দরকার সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধিগুলো আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের নিকটবর্তী দপ্তরের সহযোগিতাও চাওয়া যেতে পারে। পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে উপজেলা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য কর্মকর্তাদের। সমবায় অধিদপ্তর প্রণীত কৃষি সমবায়ের গঠন প্রণালি অনুসরণ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তা যথানিয়মে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু এক সাথে কৃষিকাজ করার জন্য একমত হয়ে, কোনো সংগঠন না গড়ে নিলে এইরূপ সমবায় বেশি দূর এগোতে পারে না। বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এর অকাল মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। মোদ্দা কথা হলো, সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য একটি দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটিই সমবায় সংগঠন। কৃষি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সকল হিসাব পাই পাই রক্ষা করবে এই সংগঠন। মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টনের দায়িত্বও এই সমবায় সংগঠন পালন করে। সরকারের বা সরকারি বে-সরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভর্তুকি, সেবা গ্রহণ করবে এবং হিসাব রাখবে। কৃষি পণ্য ক্রেতা সংস্থা, কোম্পানি বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবে এবং তদানুযায়ী ব্যবসা করবে। সমবায়ীদের সাধারণ সভার কাছে সমবায়ের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে এবং সমূহ হিসাব উপস্থাপন করবে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের হৃৎপিণ্ড। এই সংগঠন যত দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই লাভবান হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি কোনটি ?

ক. বালাইনাশক ব্যবহার
খ. রাসায়নিক সার ব্যবহার
গ. শস্যপর্যায় অবলম্বন
ঘ. গুদামজাত করণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার

২. কৃষি পণ্যের মানোন্নয়নে প্রয়োজন –

i. ফসলের মান অনুযায়ী সজ্জিতকরণ ।
ii. যথাযথভাবে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ ।
ii. সঠিক ভাবে ফসলের পরিচর্যা ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না । তাদের এ সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তা আলম সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন নব জাগরণ কৃষি সমবায় সমিতি । লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শ স্বরূপ ।

৩. ঐ সমিতির মাধ্যমে এলাকার কৃষকগণ লাভ করেন–

i. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা
ii. উচ্চ মুনাফা অর্জনের নিশ্চয়তা
iii. রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুফল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. ঐ গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশ বান্ধব কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন?

ক. অগভীর নলকূপ খনন
খ. গভীর নলকূপ খনন
গ. ভূ-উপরিস্থ জলাধার নির্মাণ
ঘ. পাম্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পরিমল বাবু, গোমেজ বাবু যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে ‘ফুল নার্সারি’ স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়েই তারা আয়ের মুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে?

খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায় ব্যাখ্যা কর।

গ. পরিমল বাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এদেশের কৃষক প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালনা করে আসছে। এদেশের কৃষক তার খামারে শস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে। এ অধ্যায়ে পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

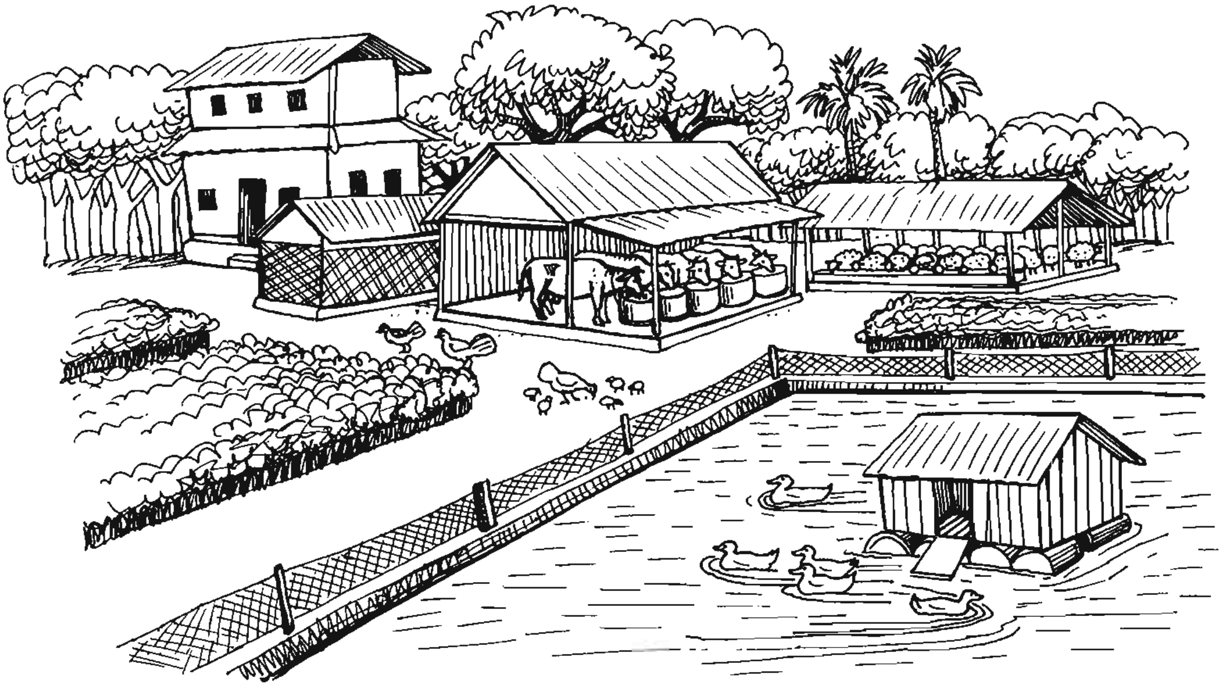

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক কৃষি খামার তৈরির কলাকৌশল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষুদ্র আয়ের উৎস হিসাবে পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবরিক দুগ্ধ খামার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করতে পারব।
- দুগ্ধ দোহন ও সংরক্ষণের সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশের কৃষক পরিবার কৃষি খামারের মাধ্যমেই শস্য, শাকসবজি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। আকার অনুযায়ী খামার বাণিজ্যিক ও পারিবারিক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কৃষি খামার আবার বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খামারের জন্য বেশি পরিমাণ মূলধন ও লোকবল প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক খামারের জন্য কম মূলধন প্রয়োজন। পারিবারিক কৃষি খামার পরিবারের ভরণপোষণ মিটিয়ে কখনো কখনো কিছু অতিরিক্ত আয় করে থাকে। বর্তমানে কৃষক পারিবারিক কৃষি খামার থেকে আয় করার চিন্তা মাথায় রেখে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মূলত পরিবারের সদস্য দ্বারাই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালিত হয়।

পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব

১। পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটায়।

২। অতিথি আপ্যায়নে ভূমিকা রাখে।

৩। পরিবারের বেকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।

৪। পরিবারের সদস্যদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

৫। পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়।

৭। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আগাছা, ফসলের বর্জ্য ও উপজাতসমূহের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

৮। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মলমূত্র ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৯। পরিকল্পিত পারিবারিক কৃষি খামার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১০। কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে।

পারিবারিক শাকসবজি ও পোল্ট্রি খামার

পারিবারিক শাকসবজি খামার

প্রধানত পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য এই খামার তৈরি হলেও পারিবারিক ক্ষুদ্র আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই খামারের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই খামার বাড়ির

আশে পাশে খালি জায়গা, উঁচু ভিটা, মাঝারি নিচু জমিতেও করা যায়। অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শ নিয়ে ঋতুভিত্তিক সারা বছরের চাষ পরিকল্পনা করলে প্রায় সারা বছরেই এই খামার থেকে ফসল পাওয়া যেতে পারে। যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পরেও কিছু আয়ও করতে পারে। পারিবারিক নিবিড় পরিচর্যায় আগাম ফসল উৎপাদন করতে পারলে উচ্চ বাজার মূল্য পাওয়া যেতে পারে। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। যা সবার চাহিদা মেটাতে পারে। রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক সার ব্যবহার না করেও ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে শাকসবজি নিরাপদ ও সুস্বাদু হয়।

পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

পোল্ট্রি বলতে গৃহপালিত পাখি যেমন, হাঁস, মুরগি, কবুতর, তিতির, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। তিতির ও কোয়েল আমাদের দেশের নিজস্ব পোল্ট্রি না হওয়ায় তেমন জনপ্রিয় নয়। এদেশের কৃষক পারিবারিক পোল্ট্রি খামারে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। গৃহপালিত পাখি পালন এ দেশের কৃষকের কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীতকাল থেকে কৃষক তার খামারে দেশি জাতের হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। সাধারণত কৃষক তার খামারে ৫-১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এই প্রচলিত খামারে কোনো উন্নত বাসস্থান বা খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে না। হাঁস-মুরগি নিজেরা বাড়ির আশেপাশে চরে খাদ্য শস্য ও পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এতে পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে এবং উদ্বৃত্ত ডিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ও হয়ে থাকে। এখানে বাণিজ্যিক বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশি জাতের হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা পারিবারিক খামারে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগি পালন করে আসছে যারা বছরে ২৫০টির মতো ডিম দেয়। এই পারিবারিক খামারে তারা অধিক মাংস উৎপাদনশীল ব্রয়লার মুরগিও পালন করে আসছে।

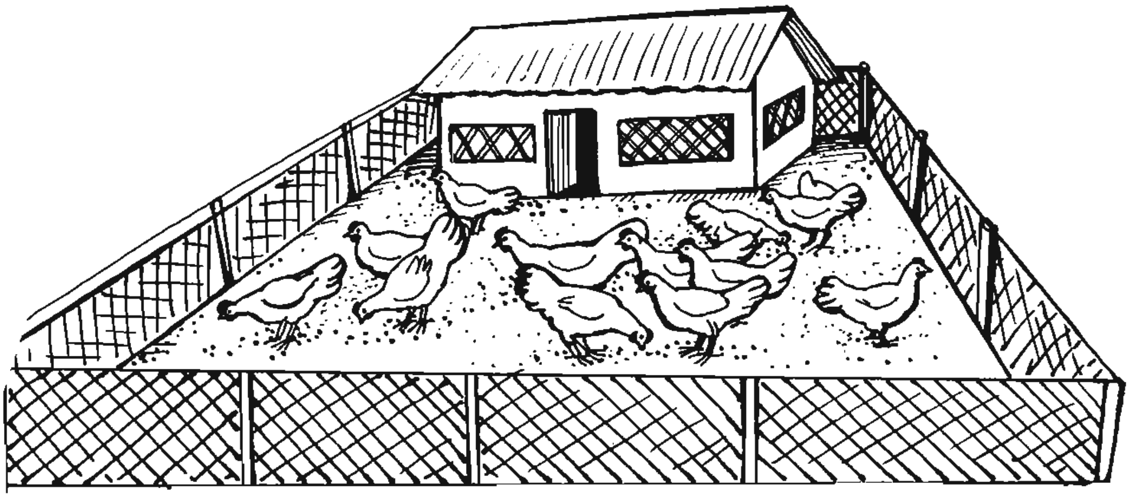

চিত্র : একটি পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

এসব পারিবারিক খামারে ৫০- ৩০০টি পর্যন্ত উন্নত জাতের ব্রয়লার বা লেয়ার মুরগি বা হাঁস পালন করতে দেখা যায়। যেসব কৃষক জমির অভাবে শস্য, গরু, ছাগল ও মাছ চাষ করতে পারে না তারা সহজে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করতে পারে ।

সফলভাবে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। বিশেষ করে পোল্ট্রির জাত, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পোল্ট্রিকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পাখির চিকিৎসাকে বোঝায়। পোল্ট্রির ক্ষেত্রে চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেয়- কথাটি অধিক প্রযোজ্য। কারণ কোনো পোল্ট্রি খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা না করে কখনো ব্যবসা লাভজনক করা যায় না। তাই পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার সময় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করা।
- বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের আশপাশে পরিষ্কার রাখা।
- খামারের চারদিকে মাঝে মধ্যে জীবাণুনাশক স্প্রে করা।
- খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা।
- সম্ভব হলে খামারের চারদিকে বেড়া দেওয়া।
- ঘরের মেঝে ও মুরগির লিটার শুকনা রাখা।
- পোল্ট্রির ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করা।
- ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।
- সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
- হাঁস, লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা।
- খামার কর্মীর শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকা।

মহামারী আকারে রোগ দেখা দিলে সকল পাখিকে ধ্বংস করে মাটি চাপা দিতে হবে। রোগ নিরাময়ে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক গবাদিপশুর খামার

হাঁস-মুরগির মতো গবাদিপশু পালনও এদেশের পারিবারিক কৃষি খামারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গৃহপালিত গবাদিপশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্রই পারিবারিক খামারে গরু ও ছাগল দেখা যায়। কিন্তু মহিষ ও ভেড়া সর্বত্র দেখা যায় না। ধনী খামারির পক্ষে গরু ও মহিষ পালন করা সম্ভব। কিন্তু দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জন্য ছাগল পালন করা সহজ। বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে ছাগল পালন খুবই লাভজনক। কারণ ছাগলের মাংসের চাহিদা ব্যাপক থাকায় এর বাজার মূল্য অনেক বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দ্রুত প্রজননের উপযুক্ততা লাভ করে। এরা একসাথে ২-৩টি বাচ্চা প্রসব করে। পুরুষ ছাগল ৮ মাস বয়সে বাজারজাত করা যায়।

আমাদের দেশি গাভী দৈনিক ১.০-১.৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। তাই পারিবারিক দুগ্ধ খামারে দেশি গরু দ্বারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায় কিন্তু কোনো বাড়তি আয় করা যায় না। আমাদের চাহিদার তুলনায় দুধের সরবরাহ খুব কম হওয়ায় পারিবারিক গরুর খামারে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। হলস্টেইন, ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের সংকর গাভী দৈনিক ১৫-২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের পারিবারিক খামারগুলোতে এ ধরনের উন্নত জাতের সংকর গাভী পালন করা দরকার। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক উন্নত জাতের গাভীর পারিবারিক খামার করে সফলতা পেয়েছে। পারিবারিক খামারে গাভীর সংখ্যা ২-৫টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাভীর সংখ্যা এর অধিক হলে তা বাণিজ্যিক খামারের রূপ নেয় এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয়।

সফলভাবে পারিবারিক পশু খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। বিশেষ করে পশুর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পশু খামারের রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা প্রদান করাকে বোঝায়। পশুর চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করে পশুকে উৎপাদনে আনতে অনেক সময় লাগে। তাই গবাদিপশুর খামার পরিচালনার সময় রোগ না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের চারিদিক পরিষ্কার রাখা
- খামারে সাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা
- খামারের আঙ্গিনায় নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা
- খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা
- গোয়াল ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে তৈরি করা
- খামারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা
- বন্য পশুপাখি খামারে ঢুকতে না দেওয়া
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা
- সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা
- পশুকে নিয়মিত গোসল করানো
- গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা
- মৃত পশুকে মাটি চাপা দেওয়া
- পশুর রোগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

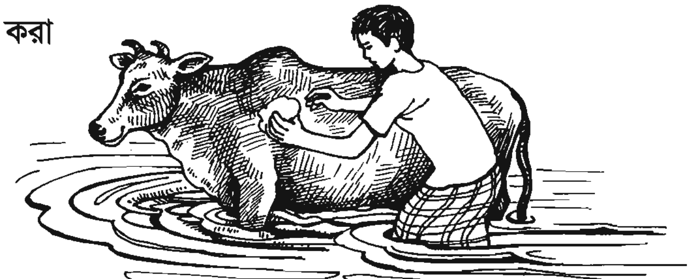

চিত্র : গরুকে গোসল করানো হচ্ছে

কাজ : শিক্ষার্থীরা যেকোনো একটি খামার পরিদর্শন করবে এবং খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে ।

পারিবারিক মৎস্য খামার

পারিবারিক মৎস্য খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

আমদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে অনেকের বাড়িতেই পুকুর আছে। এই পুকুরগুলো গৃহস্থালির কাজে পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এসব পুকুরে সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে কিছু মাছ চাষও করা হয় । যেমন- পোনা মাছের খাবার হিসাবে বাড়ির যে উদ্বৃত্ত ভাত ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য থাকে তা দেওয়া হয় । ফলে এসব পুকুরে উৎপাদন অনেক কম । অথচ এসব পুকুরে পরিকল্পনামাফিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব । এই উৎপাদিত মাছ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করা যায় । আবার বাড়ির আঙ্গিনায় বা পিছনে কিছুটা জায়গা থাকলে সহজেই একটি মিনি পুকুর খনন করা যায়। এবং এই মিনি পুকুরকেও পারিবারিক মৎস্য খামার হিসাবে গণ্য করে মাছ চাষ করা যায় । এসব পারিবারিক মৎস্য খামারগুলো বাড়ির মহিলাদের দ্বারাও পরিচালনা করা সম্ভব । মহিলারা এসব কাজ করার ফাঁকে কিছুটা সময় পুকুরে মাছ চাষের জন্য ব্যয় করলে একদিকে যেমন সহজেই পারিবারিক আমিষের চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে সংসারে বাড়তি আয়ও সম্ভব হবে । আবার পারিবারিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে ।

পারিবারিক খামারে চাষ উপযোগী মাছ

নিচে পারিবারিক খামারে চাষ করা যায় এরকম অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন কয়েকটি মাছের বর্ণনা দেওয়া হলো:-

ক) দেশি মাছ

চাষযোগ্য দেশি মাছের প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ চাষের জন্য খুব উপযোগী । দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছগুলো পাওয়া যায় । তবে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘিসহ বদ্ধ পানিতে এরা ডিম পাড়ে না । বর্ষাকালে (মে-জুলাই) এ সকল মাছ স্রোতযুক্ত নদীর কম গভীর অংশে ডিম ছাড়ে । প্রণোদিত বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের পোনা উৎপাদন করা যায় । চাষকালীন সময়ে এ সব মাছ সম্পূরক খাদ্য হিসাবে ফিশমিল, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি গ্রহণ করে । পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা মাছ বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত হয় । রুই ও মৃগেল মাছ বছরে ১কেজি ওজনের হতে পারে । দুই বছর বয়সে এসকল মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয় ।

খ) বিদেশি মাছ

আমাদের দেশের পরিবেশে সহজে খাপ খায়, দ্রুত বাড়ে ও হ্যাচারিতে সহজে পোনা তৈরি করা যায় এমন কিছু বিদেশি মাছ চাষের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আনা হয়েছে । এধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাছ হচ্ছে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও, থাইসরপুঁটি, তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা ও থাইপাঙ্গাশ । এসব মাছ দেশি কার্প জাতীয় মাছের সাথে সহজেই মিশ্র চাষ করা যায় ।

সিলভার কার্প গ্রাসকার্প

কার্পিও নাইলোটিকা সরপুঁটি

চিত্র : চাষযোগ্য কয়েকটি বিদেশি মাছ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ

অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো হচ্ছে-

ক) খামারে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতি) : পুকুরের আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ, পাড় মেরামত, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

খ) পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা : পোনার প্রজাতি নির্বাচন, ভালো পোনা বাছাইকরণ, পোনা শোধন, পোনার পরিমাণ নির্ধারণ, পোনা পরিবহন এবং পোনা অভ্যস্তকরণ ও ছাড়া

গ) পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা : নিয়মিত সার প্রয়োগ, সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ, মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরা ও বিক্রয়

খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় ভিত্তিক উপকরণ সমূহের চাহিদা নিচে দেওয়া হলো :

ব্যবস্থাপনার পর্যায়	উপকরণের চাহিদা
মজুদ পূর্ব বা পুকুর প্রস্তুতি	দা, কোদাল, মাছ মারার বিষ (যেমন-রোটেনন), চুন, সার (জৈব ও অজৈব), বালতি, ড্রাম, মাটির চাড়ি, মগ, সেক্কিডিক্স
মজুদকালীন	মাছের রেণু, হাড়ি বা পলিথিন ব্যাগ, খাবার লবণ, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, P^H কাগজ, থার্মোমিটার
মজুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, মাটির চাড়ি, বাঁশের টুকরা, সেক্কিডিক্স, সম্পূরক খাদ্য, বালতি, মগ/বাটি, খাদ্যদানি, চুন/জিপসাম, দা/কাঁচি, ব্যালেন্স, পাহারা দেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (ধর্ম জাল, ঝাঁকি জাল, বেড় জাল)

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষকালীন সময়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাছের রোগের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে মাছের স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়, ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম খায়, মাছের দেহ অতিরিক্ত খসখসে অনুভূত হয়। চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পচা রোগ এবং মাছের উকুন। খামারের পুকুরে মাছ রোগাক্রান্ত হলে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক ভাবে পুকুরের অবস্থা ভেদে শতক প্রতি ০.৫-১.০ কেজি চুন প্রয়োগ করা যায়।

পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

১। মাছ ভেসে উঠা ও খাবি খাওয়া (পানিতে অক্সিজেনের অভাব)

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ব, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। অক্সিজেনের অভাবে মৃত মাছের মুখ “হা’ করা থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থাঃ পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুর পরিষ্কার করে নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা পাম্প দিয়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

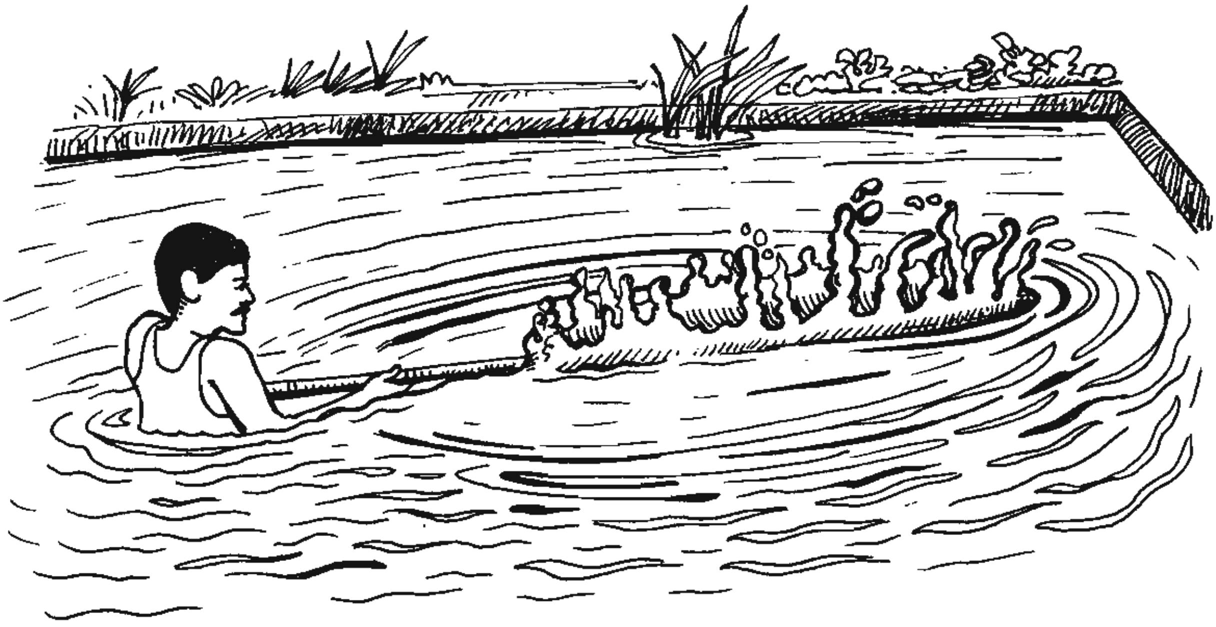

চিত্র : বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন মেশানো

২। পানির উপর সবুজ স্তর

অতিরিক্ত সবুজ শেওলা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছের শ্বাস কষ্ট হয় ও মাছ পানির উপর খাবি খেতে থাকে। শেওলা পচে পরিবেশ নষ্ট হয়। মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থাঃ পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়। সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে। কিছু বড় সিলভার কার্প ছেড়ে জৈবিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩। পানির উপর লাল স্তর

লাল শেওলা অথবা অতিরিক্ত আয়রনের জন্য এ সমস্যা দেখা যায়। এর প্রভাবে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। আবার পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতিও হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থাঃ শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সেমি নিচে বাঁশের খুটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে ও পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে শেওলা দমন করে। খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে পানির উপর টেনে বা পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

৪। ঘোলা পানি

বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশের ফলে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। পাড়ে ঘাস না থাকলেও এমনটি দেখা যায়। এর ফলে পানিতে সূর্যের আলো ঢুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থাঃ পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ফিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায় ।

৫ । পুকুরের তলদেশের কাদায় গ্যাস জমা হওয়া

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ লতাপাতা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় । এতে করে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ মারা যায় ।

প্রতিকার ব্যবস্থাঃ পুকুর শুকনো হলে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে । হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

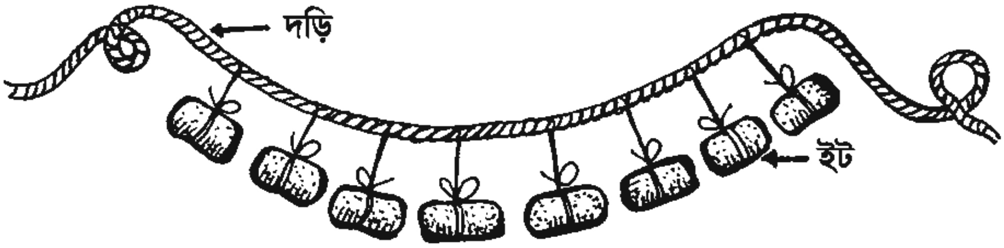

চিত্র : হররা

পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মাছের চাহিদা মেটানো এবং সে সাথে সম্ভব হলে বাড়তি কিছু মাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা । এছাড়াও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে ।

নতুন শব্দঃ ক্ষুদ্র আয়, হররা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার

গাভী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। একজন মানুষের বছরে প্রায় ৯০ লিটার দুধ পান করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করে থাকে। তাই দেশে দুধের উৎপাদন ও চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানি করে এই ঘাটতি আংশিক পূরণ করা হয়। দেশে দুধের ঘাটতি থাকায় বিগত দুই দশকে মানুষের মধ্যে গাভী পালন ও দুগ্ধখামার স্থাপনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহর ও উপশহরে অনেকেই পারিবারিকভাবে গাভী পালন করছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালনে গাভীর বাসস্থান ও খাদ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গাভী পালন করে স্বকর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের আয় বাড়ানো যায় এবং পরিবারের পুষ্টি ও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং আমরা নিজের বাড়িতে পারিবারিক খামার করে ২-৫টি গাভী পালনের মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করে দুধের চাহিদা মেটাতে পারি। উন্নত জাতের গাভীর খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি গাভী সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপন করা যায়। সাধারণত ৫টি বা তদূর্দ্ধ গাভী সমন্বয়ে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যায়। ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ক্ষতিয়ান বিবেচনা করে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। খামারের জন্য গাভী নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধসম্পন্ন হয়। পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য বসতবাড়ির উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচনে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে, সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শুষ্ক ভূমি
- খামারের ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ
- খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ
- বসতঘর হতে একটু দূরে
- ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা
- পানি ও পশু খাদ্যের প্রাপ্যতা
- পণ্যের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা বিবেচনা

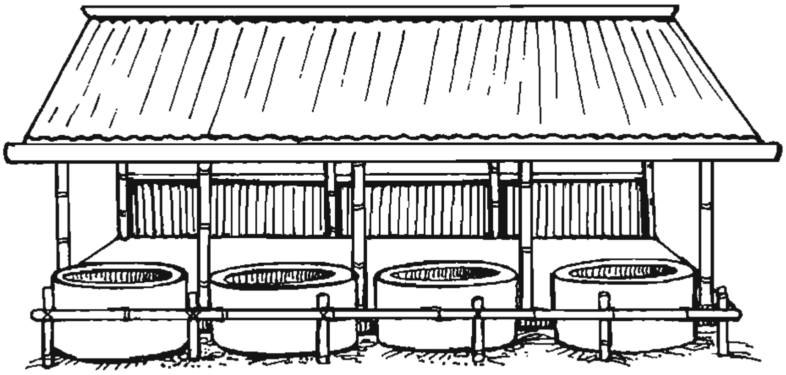

চিত্র : একটি পারিবারিক গোশালা

পারিবারিক দুগ্ধ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করতে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। খামার নির্মাণের জন্য মূলধন থেকে শুরু করে গাভীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় গুণগতমান সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে উপকরণসমূহের পরিচিতি দেওয়া হলো :

মূলধন, খামারের ভূমি বা জমি, ভালো জাতের গাভী, আদর্শ গোশালা, গোশালা নির্মাণ সামগ্রী, উন্নত খাদ্যের ও পানির পাত্র, ঘাসের জমি, পানির লাইন, পরিবহনের জন্য পিক আপ/ মটরভ্যান বা রিকসা ভ্যান, ঘাস কাটার চপিং মেশিন, ফিড ট্রলি ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, দুগ্ধ দোহন ও বিতরণ সামগ্রী, পশুর প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, পশুর জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য, টিকার সরবরাহ এবং পশুকে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা

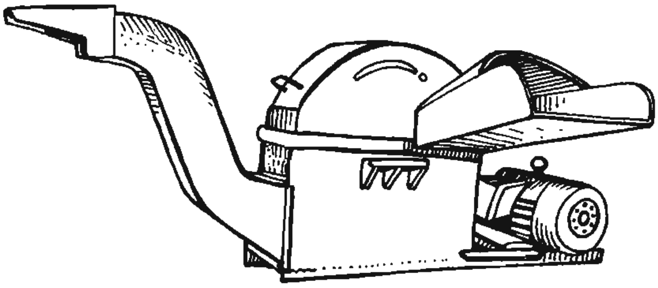

চিত্র : ঘাস চপিং মেশিন

কাজ : পারিবারিক দুগ্ধ খামারের উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

দুগ্ধ দোহন

গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে দুধ দোহন বলে। নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে একই গোয়ালা দ্বারা গাভী থেকে দুধ দোহন করতে হয়। এতে করে গাভী স্থিরতাবোধ করে এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

দুধ দোহনের ধাপ-

১। **দুধ দোহনের সময় :** প্রতিদিন দুইবার অথবা তিনবার দুধ দোহন করা যায়। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে দোহন করলে দুধ উৎপাদন বাড়ে।

২। **গাভী প্রস্তুত করা :** দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই গাভীকে মারধর করা যাবে না। দুধ দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান ও বাঁট কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে ওলান ও বাট মুছে নিতে হবে।

৩। **গোয়ালার প্রস্তুতি :** দোহনের পূর্বে গোয়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। গামছা বা কোনো কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে। দোহনকারীর নখ কেটে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর বদভ্যাস যেমন- থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি কথা বলা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে।

৪। **দোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করা :** ওলান থেকে দুধ দোহনের সময় বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা বালতি ব্যবহার করা উচিত। দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরবর্তি দোহনের পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাত্রগুলো উপুড় করে রাখতে হবে।

৫। গাভীকে মশামাছি মুক্তরাখা : দুধ দোহনের সময় মশা মাছি যেন গাভীকে বিরক্ত না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬। দুধ দোহনের জন্য গাভীকে উদ্দীপিত করা : বাছুরের দ্বারা গাভীর বাঁট চুষিয়ে অথবা গোয়ালা কর্তৃক ওলান ম্যাসাজ করে গাভীকে দুধ দোহনের জন্য উদ্দীপিত করতে হবে।

৭। দোহনের সময় গাভীকে খাওয়ানো : দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার জন্য অল্প পরিমাণ দানাদার খাদ্য বা সবুজ ঘাস গাভীর সামনে দেওয়া উচিত। এতে গাভী খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে এবং দুধ দোহন সহজ হয়।

দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি : দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি দুই প্রকার -

১। সনাতন পদ্ধতি : হাত দ্বারা দোহন

২। আধুনিক পদ্ধতি : যন্ত্রের সাহায্যে দোহন

দুধ দোহনের সময় যে কোনো একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১। হাত দিয়ে দুগ্ধ দোহন

দোহনের সময় ওলানের বাঁটের গোড়া বন্ধ রেখে বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে বাঁটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে। আবার চাপ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ওলান থেকে বাঁটে দুধ এসে জমা হয়। এভাবেই প্রক্রিয়াটি বারবার চলতে থাকে। হাত দিয়ে দোহনের সময় গাভীর বামপাশ থেকে দোহন করতে হয়। দুধ দোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাঁট একসাথে ও পরে পিছনের দুই বাঁট একসাথে দোহন করা হয়। আবার অনেকে গুণ (X) চিহ্নের মতো সামনের একটি ও পিছনের একটি বাঁট একসাথে অথবা যে বাঁটে দুধ বেশি আছে বলে মনে হয় সেগুলো আগে দোহন করে থাকে।

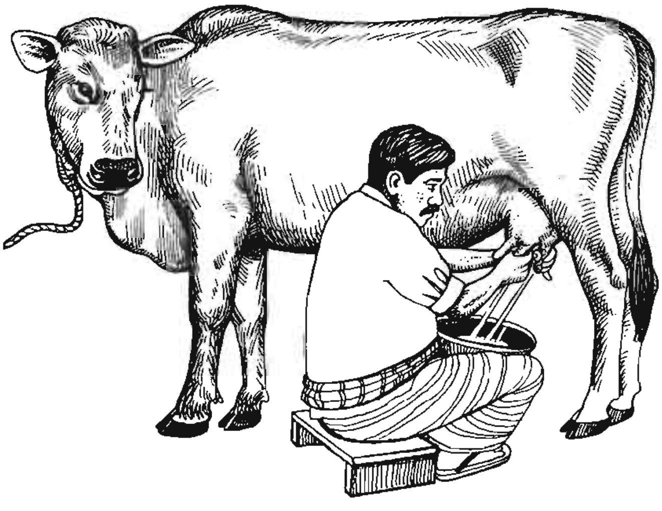

চিত্র : সনাতন পদ্ধতি

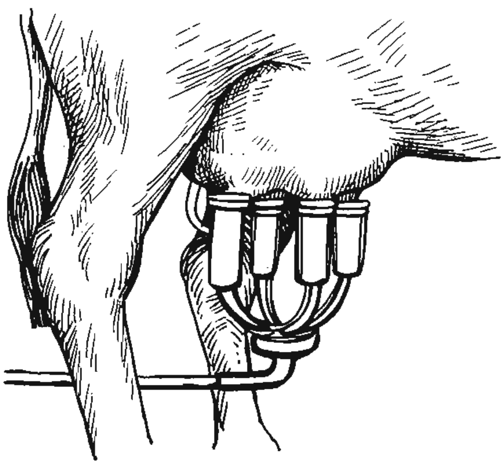

চিত্র : আধুনিক পদ্ধতি

২। যন্ত্রের সাহায্যে দোহন

বড় বড় বাণিজ্যিক খামারে যেখানে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিট কাপ লাগিয়ে দুগ্ধ দোহন যন্ত্র চালু করা হয়। এতে সহজে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুগ্ধ দোহনের আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবে।

দুগ্ধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত দুধকে খাদ্য হিসাবে উপযোগী রাখতে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দোহনের পর পরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠাণ্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সাধারণত কাঁচা দুধ বিক্রি করা হয়। দুধ অধিক সময় কাঁচা অবস্থায় থাকলে গুণগত মান ক্ষুণ্ন হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) নামক জীবাণু প্রধানত দুধে এসিড তৈরি করে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। নিম্নে দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ক) দুধ সংরক্ষণের সনাতন পদ্ধতি

দুধ তাপ দ্বারা ফুটিয়ে সংরক্ষণ করা : পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে ৪ ঘণ্টা ভালো থাকে। তাই ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে ফুটালে প্রায় সবরকম রোগ উৎপদানকারী জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবে, এতেও দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কেননা উচ্চ তাপ প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ভিটামিন ও অ্যামাইনো এসিড নষ্ট হয়ে যায়।

খ) দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

১। রিফ্রিজারেটরে অল্প সময়ের জন্য ৪° সে. রেখে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

২। ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। এখানে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিক, তবে দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

৩। দুধ পাস্তুরিকরণ

পৃথিবীতে দুধকে অন্যতম আদর্শ খাদ্য বলা হয়। এই দুধ বাছুর বা মানুষের জন্য আদর্শ খাবার, সাথে সাথে এটি অণুজীবের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দুধ দোহনের পর সময়ের সাথে সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে এবং দীর্ঘক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় সম্পূর্ণরূপে এটি নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে প্রধানত অণুজীবকে দায়ি করা হয়। এই অণুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্ন তাপমাত্রায় জন্মাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হলো পাস্তুরিকরণ। দুধ পাস্তুরিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ উৎপাদনকারী

জীবাণু ধ্বংস করা। দুধ বেশি সময় সংরক্ষণের জন্য অবাঞ্ছিত জীবাণু ধ্বংস করা, দুধে উপস্থিত এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণ।

লুই পাস্তুর (১৮৬০-১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) একজন ফরাসি রসায়নবিদ প্রথম অনুধাবন করেন যে, পচন প্রণালি এক প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘঠিত হয়। যদিও লুই পাস্তুরই পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, কিন্তু দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে ড. সথসলেট নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম এর ব্যবহার করেন। দুধে উপস্থিত রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও এনজাইম ধ্বংস কল্পে দুধের প্রত্যেক কণাতে ১৪৫° ফা. (৬২.৮° সে.) তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট সময়কাল অথবা ১৬২° ফা. (৭২.২° সে.) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড সময়কাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করাকে পাস্তুরিকরণ বলে। পাস্তুরিকৃত দুধ সঙ্গে সঙ্গে ৪° সে. তাপমাত্রার নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

পাস্তুরিকরণ এর সুবিধা

১। পাস্তুরিকৃত দুধ নিরাপদ, কেননা এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।

২। পাস্তুরিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে, কেননা ইহা ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর সংখ্যা কমায়।

৩। পাস্তুরিকরণ এর ফলে দুধের এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে দুধ দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকে।

৪। পাস্তুরিকরণের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়।

৫। এই প্রক্রিয়ায় দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে, কোনো বিস্বাদের সৃষ্টি হয় না।

পাস্তুরিকরণের অসুবিধা

১। পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়া আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোচ্ছলে দুধের চর্বিকণা পৃথক হতে পারে।

২। তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩। উচ্চ তাপ জনিত কিছুটা বিস্বাদের সৃষ্টি করতে পারে।

পাস্তুরিকরণের প্রকারভেদ

১। নিম্ন তাপ দীর্ঘ সময় পাস্তুরিকরণ ৬২.৮° সে. তাপ ৩০ মিনিট সময়ের জন্য।

২। উচ্চ তাপ কম সময় পাস্তুরিকরণ ৭২.২° সে. তাপ ১৫ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

৩। অতি উচ্চ তাপে পাস্তুরিকরণ ১৩৭.৮° সে. তাপে ২ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

নতুন শব্দ : দুগ্ধ দোহন, পাস্তুরিকরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির বিবরণ, ব্যয় বা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মুনাফার তথ্য লিপিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

পারিবারিক খামার : আলিফ পারিবারিক খামার
মালিকের নাম : আলিফ মিঞা
ঠিকানা : গ্রাম- বয়রা
মৌজা -বয়রা-ভালুকা
উপজেলা/থানা- ময়মনসিংহ সদর
ডাকঘর- ময়মনসিংহ ২২০২

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ : ১ বিঘা (৩৩ শতক)।

উঁচু জমি	:	৩ শতক
মাঝারি নিচু জমি	:	১০ শতক
পুকুর	:	২০ শতক
খামার	:	৩ টি
মৎস্য খামার	:	২০ শতক
সবজি খামার	:	১০ শতক
ব্রয়লার মুরগির খামার	:	৩ শতক

নিম্নে ব্রয়লার মুরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণনা করা হলো।

খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন করলে নিজেদের খাবার মাংস ও ডিমের চাহিদা মেটে। তাছাড়া ব্রয়লার ও খাবার ডিম বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি- ক। স্থায়ী খরচ, খ। চলমান খরচ

ক। স্থায়ী খরচ (Capital or Fixed Expenditure) : খামারে বাচ্চা তোলার আগে জমি, মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র, ড্রাম ও বালতি ইত্যাদি খাতসমূহে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে মূলধন বা স্থায়ী খরচ বলে। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

জমি	মুরগির ঘর তৈরি	ব্রুডার যন্ত্র (হোভার, চিক গার্ড, বাল্ব)	খাদ্যের ও পানির পাত্র	পানির বালতি ও ড্রাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১০০০/-	১২,০০০/-

খ. চলমান খরচ (Recurring Expenditure) : খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে ২-৫ টির মৃত্যু হয়। চলমান খরচের মধ্যে বাচ্চার দাম, খাদ্য ক্রয়, চলতি বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মুরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ব্রয়লার মুরগি মোট ১ মাস খামারে থাকে। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের চলমান খরচ হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৫০/-)	খাদ্য ক্রয় (প্রতিটির জন্য ৩ কেজি করে মোট ৩০০ কেজি খাদ্য, প্রতি কেজি ৩৩/-)	বিদ্যুৎ খরচ	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৫,০০০/-	৯,৯০০/-	৩০০/-	১৫০০/-	২০০/-	নিজ	৫০০/-	১৭,৪০০/-

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১৬০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে ক্লাসে জমা দিবে।

প্রকৃত ব্যয় হিসাবের জন্য মোট চলমান খরচের সাথে মুরগির ঘর, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও চলমান খরচের উপর অপচয় খরচ (Depreciation Cost) হিসাব করতে হবে।

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ (Depreciation Cost)

১। মুরগির ঘরের উপর (৮০০০/- টাকার উপর ৫%) = ৪০০/-

২। যন্ত্রপাতির উপর (৪,০০০/-টাকার উপর ১০%) = ৪০০/-

৩। মোট স্থায়ী মূলধন ও মোট চলমান খরচ = (১২,০০০+ ১৭,৪০০/-) উপর ১৫% = ৪,৪১০/-

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ = ৫,২১০/- টাকা

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাচ পালন করা যায় তবে একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ হবে = টাঃ ৫২১/- টাকা

অতএব মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = টাঃ ১৭,৪০০/- +টাঃ ৫২১/- টাকা
= টাঃ ১৭,৯২১/-

আয় (Income) : ব্রয়লার মুরগি, লিটার ও খাদ্যের বস্তা বিক্রি করে আয় করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি থেকে আয় হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

ব্রয়লার মুরগি বিক্রি ৯৫টি (৫% মৃত্যু) ১৫০/ - কেজি (গড় ওজন ১.৪ কেজি)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ৬টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
১৯,৯৫০/ -	১০০/-	৬০/-	২০,১১০/ -

নিট লাভ = (মোট আয় - মোট ব্যয়)=টাঃ ২০,১১০/- - টাঃ ১৭,৯২১/- = টাঃ ২,১৮৯/- টাকা

কাজ : শিক্ষার্থীরা খামারের আয় ব্যয়ের ও লাভ ক্ষতির হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখবে।

নতুন শব্দঃ স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারিবারিক মিনি পুকুরে চাষ করা হয় কোন মাছ ?

ক. মৃগেল খ. গ্রাস কার্প

গ. সরপুঁটি ঘ. পাঙ্গাশ

২. দুধ পাস্তুরিকরণের উদ্দেশ্য-

i. জীবাণু ধ্বংস করা।

ii. গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখা।

iii. রাসায়নিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিলন মিয়া তার বাড়ির সামনের ৬০ শতকের ১.৫ মিটার গভীরতার পুকুরে মাছের চাষ করেন। বর্ষার শেষে তিনি পুকুরে গিয়ে লক্ষ করেন তার পুকুরের মাছগুলো ঘাটে পুতে রাখা বাঁশের সাথে গা ঘষছে। তিনি এ বিষয়ে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলে মৎস্য কর্মকর্তা তাকে কিছু পরামর্শ দেন।

৩. মিলন মিয়ার পুকুরের মাছগুলো কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল?

ক. ক্ষত রোগ খ. লেজ পচা রোগ

গ. মাছের উকুন রোগ ঘ. লাল ফুটকি রোগ

৪. মিলন মিয়ার পুকুরের জন্য কমপক্ষে কত কেজি ডিপটারেক্স প্রয়োজন?

ক. ১.৫ কেজি খ. ১.৮ কেজি

গ. ২.৫ কেজি ঘ. ২.৮ কেজি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ- হাসিফ দীর্ঘ দিন ধরে নিজ আঙ্গিনায় দেশি জাতের মুরগি পালন করে আসছেন। এতে তেমন লাভবান না হওয়ায় তাঁরা পোল্ট্রি খামারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলতা লাভ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ করলেন তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশকে দূষিত করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পচিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে?

খ. বাণিজ্যিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. আরিফ-হাসিফের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফ-হাসিফের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৯ম-১০ম কৃষিশিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য